
সেবা
মাসুদ রানা
কালো নকশা
কাজী আনোয়ার হোসেন

মাসুদ রানা

কালো নকশা

কাজী আনোয়ার হোসেন

এক

গণচিন।

ঘণ্টাখানেক নির্বিঘ্নে উড়ল প্লেন। তারপর, মাসুদ রানার মত আরও হয়তো দু'একজন খেয়াল করল ব্যাপারটা—বড়সড় বৃত্ত তৈরি করে ফিরতি পথ ধরছে ওরা।

চারশো প্যাসেঞ্জার নিয়ে সাংহাই শহর থেকে টেক-অফ করেছে সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স-এর প্রকাণ্ড বোয়িং সেভেন-সেভেন-সেভেন। জিলান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে রিফুয়েলিং শেষে আবার রওনা হয়েছে, গন্তব্য মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলান বাতোর। মাঝপথে কী ঘটল যে...

একটু পরে সবিনয়ে জানালেন পাইলট, যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে বাধ্য হয়ে বোয়িংকে ঘুরিয়ে নিয়েছেন তিনি, আর কিছুক্ষণের মধ্যে রাজধানী শহর বেজিঙের লান্তিয়ানচাঙ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করতে যাচ্ছেন। তারপর যথাবিহিত অভয়দান আর দুঃখপ্রকাশ করলেন।

নিরাপদেই ল্যান্ড করল প্লেন। এর মধ্যে আর কিছু নেই, ব্যাপারটা স্রেফ যান্ত্রিক ত্রুটিই বটে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, মঙ্গোলিয়ায় যাবে এরকম কোন কানেকটিং ফ্লাইট আপাতত পাওয়া সম্ভব নয়।

সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের তরফ থেকে বলা হলো, বারো ঘণ্টার মধ্যে আরেকটা বোয়িং নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছে তারা, ততক্ষণ প্যাসেঞ্জাররা ফাইভ স্টার কুবলাই খান হোটেলে উঠে সময়টা উপভোগ করুন।

অর্থাৎ অন্তত বারো ঘণ্টার জন্য বেজিঙে আটকা পড়তে হলো বিসিআই এজেন্ট এমআরনাইনকে।

কাজের মধ্যেই রয়েছে রানা, তবে লম্বা একটা ট্যুরে; বিশেষ করে পুব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ঘুরে ঘুরে ওর এজেন্সির শাখাগুলোর কী অবস্থা দেখছে, কমপিউটার খুলে হিসাব নিচ্ছে আয়-ব্যয়ের, কোথাও কোনও সমস্যা থাকলে সমাধান খুঁজে বের করছে।

ব্যাংকক, ভিয়েনতিয়েন, হ্যানয়, তাইপে আর হংকং হয়ে চিনে ঢুকেছিল রানা। বেইজিং বাদে তিনটে বড় শহরে কাজ ছিল, সে-সব সেরে সাংহাই থেকে প্লেন ধরে যাচ্ছিল মঙ্গোলিয়া।

মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলান বাতোরে রানা এজেন্সির নতুন একটা শাখা অফিস খোলা হবে কাল সকালে, কিন্তু বেইজিঙে আটকা পড়ে যাওয়ায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়ল রানার জন্য।

এই মুহূর্তে ফাইভ স্টার কুবলাই খান-এর একটা বার-এ রয়েছে রানা, বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে আর হঠাৎ পেয়ে বসা নিঃসঙ্গতায় বিচ্ছিরিভাবে নাজেহাল হচ্ছে।

কবজি একটু উঁচু করে রোলেক্স দেখল রানা। সাড়ে সাতটা বাজে। মাত্র সন্ধে, রাত এখনও শুরুই হয়নি। সময়টা কীভাবে

কাটাবে ভাবছে ও। নিজের ভিতর টুপ করে একটা ডুব দিয়ে দেখে নিতে চেষ্টা করল, আসলে চাইছেটা কী ও।

কী চাইছে সেটা পরিষ্কার হলো না, তবে জানা গেল কী চাইছে না।

রানা এজেন্সির অফিসে সারপ্রাইজ ভিজিট বাদ। বাদ হোটেলের গ্যাম্বলিং রুমে ভাগ্যপরীক্ষাও। পুরানো কোন বন্ধুর সঙ্গ? নাহ্, ভাল্লোগছে না। তা হলে আর বাকি রইল কী?

বাকি থাকল পুরুষকে ঈশ্বরের তরফ থেকে দেওয়া সবচেয়ে বড় পুরস্কারটি: সুন্দরী নারীর মধুর সান্নিধ্য।

বার-এর এদিক ওদিক তাকালেই ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে রানা, রূপ আর যৌবনের চোখ-ধাঁধানো ডালি। এদের মধ্যে কেউ কেউ তো প্রকাশ্যেই মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখছে ওকে।

ও জানে, এদের বেশিরভাগই অভিজাত পারিবারিক পরিবেশ আর সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক আবহের ভিতর বড় হয়েছে। পশ্চিমা বিশ্বের মত কমিউনিস্ট চিনে হোটেল বা পাবে বারবণিতাকে আশ্রয় বা প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। এদের কারও সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে সময় কাটানো যেতে পারে, হোটেল-কামরায় নিয়ে যাওয়ার বাধ্যবাধকতা নেই।

নিজের উপর আস্থা আছে রানার, তা ছাড়া অভিজ্ঞতা থেকে জানে যে সহজেই ওর প্রতি আকৃষ্ট হয় মেয়েরা, কাজেই চেষ্টা করে দেখা যেতে পারত, কিন্তু না, এতেও মনের তরফ থেকে সায় পাওয়া গেল না।

আচ্ছা, হোটেল রুমে ফেরার সময় শিভাস রিগাল-এর একটা বোতল নিয়ে গেলে কেমন হয়? সেটা খালি করতে পারলে কাল অনেক বেলা পর্যন্ত অঘোরে ঘুমানো যাবে।

ভিতর থেকে মানা করে দেওয়া হলো, নিজেকে সুস্থ আর সচেতন রাখা প্রয়োজন, কখন কী ইমার্জেন্সি দেখা দেয় ঠিক নেই। দূর ছাই, বিরক্ত হয়ে ভাবল রানা, আমি কি কোন অ্যাসাইনমেন্টে আছি নাকি যে...

তারপর, একেবারে ভোজবাজির মত, আশ্চর্য একটা কাণ্ড ঘটল।

যেন কারও অশ্রুত নির্দেশে ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে বারে ঢোকার সুইং ডোরটার দিকে তাকাল রানা। ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে ওটা।

আর তারপরই অবাক হয়ে দেখল রানা, শান্ত পায়ে ভিতরে ঢুকছে জিজিয়ানা দালিয়ান।

ভুলটা অবশ্য পরমুহূর্তেই ভাঙল–কোথায় দালিয়ান? এ তো অন্য এক অচেনা মেয়ে! এমনকী জিজিয়ানা দালিয়ানের সঙ্গে এর কোন মিলও নেই। তা হলে এমন হলো কেন?

হলপ করে বলতে পারবে রানা, এই অচেনা মেয়েটির মুখের জায়গায় হুবহু দালিয়ার মুখ দেখেছে ও। পরিষ্কার,স্পষ্ট; সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ ছিল না।

শুধু যে দেখেছে, তা নয়, যাতে দেখতে পায় সেজন্য কে যেন ঝট করে সুইং ডোরের দিকে ঘাড় ফেরাতে বাধ্যও করেছে ওকে।

ব্যাপারটা কী?

মাঝে মধ্যে এমন হতে দেখা যায়; নিয়তির অদৃশ্য অঙ্গুলি হেলনে দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক ছন্দে হয়তো একটা ব্যাঘাত সৃষ্টি হলো। এই ছন্দপতনের পরিণতি কখনও শুভ হয়, কখনও অশুভ, আবার স্রেফ অর্থহীন বিড়ম্বনা ছাড়া অন্য কিছু না-ও হতে পারে।

নিয়তির সেরকম একটা ইঙ্গিতেই কি বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর অন্যতম দুর্ধর্ষ এজেন্ট মাসুদ রানা মাঝ আকাশে ছন্দ হারিয়ে ফেলে এই মুহূর্তে হোটেল কুবলাই খানের বারে বসে আছে?

তারপর এখন আবার সেই রহস্যময় নিয়তিই অবচেতন মনকে প্ররোচিত করছে বা দিক-নির্দেশনা দিচ্ছে?

এরপর স্বভাবতই রানা ভাবল, একটা ফোন করে দেখা উচিত না কেমন আছে মেয়েটা? বেশ অনেকদিন হয়ে গেল দালিয়ার কোন খবর-টবর নেওয়া হয় না।

বার কাউন্টার ছেড়ে পে বুদের দিকে এগোল রানা। মনে পড়ে গেল সব—কে দালিয়া, কী দালিয়া।

জুন, ১৯৮৯। বেইজিঙ।

সে-সব দুঃস্বপ্ন ভরা দিনগুলোর কথা মনে পড়লে আজও শিউরে উঠতে হয়।

চাই গণতন্ত্র, চাই মত প্রকাশের স্বাধীনতা—এই শ্লোগান তুলে ছাত্রদের নেতৃত্বে তখন গোটা চিন জুড়ে চলছে তুমুল আন্দোলন। বলা হয়, ছাত্রদের এই আন্দোলনে গোপনে ইন্ধন যোগাচ্ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো, যারা চায় না শতকোটি মানুষের দেশ চিন তার অর্জনগুলো ধরে রাখতে পারুক।

আন্দোলন থামাবার জন্য গতমাসের বিশ তারিখে মার্শাল ল জারি করেছে সরকার। বিদেশীদের চিন ছাড়তে বলা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু গ্রাউন্ড ক্রুরা কাজ না করায় বিমানবন্দর অচল হয়ে পড়ে আছে।

ছাত্ররা মার্শাল ল মানছে না, বড় বড় শহরে প্রতিদিন বিক্ষোভ

মিছিল হচ্ছেই।

দুনিয়ার সবচেয়ে বড় পাবলিক প্লাজা তিয়ানানমেন স্কয়্যারে গণতন্ত্রের প্রতীক হিসাবে তেত্রিশ ফুট উঁচু একটা দুধসাদা মূর্তি তৈরি করেছে ছাত্ররা, নাম দিয়েছে ‘গণতন্ত্রের দেবী’।

সবারই জানা আছে যে ১৯৪৯ সালের পয়লা অক্টোবরে ঠিক এখানে দাঁড়িয়ে লালচিনের মহান নেতা মাও সে-তুং ‘পিপল’স্ রিপাবলিক অব চায়না’ ঘোষণা করেছিলেন। দুনিয়ার মানুষ এ-ও জানে যে আধুনিক চিনের যা কিছু অর্জন তার সবই কমরেড মাও সে-তুংয়ের যোগ্য নেতৃত্বের গুণে সম্ভব হয়েছে।

বিশেষ জরুরি একটা কাজে এসে বেইজিঙে আটকা পড়ে গেছে রানা। অলস বসে থাকতে কারই বা ভালো লাগে, সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজধানীতে যা যা দেখার আছে এই সুযোগে সব দেখে নেবে।

ওর ফাইভ স্টার হোটেল দা মোঙ্গল বিখ্যাত তিয়ান তান পার্কের একধারে, টেমপল অভ হেভেন থেকে বেশি দূরে নয়।

টেমপল অভ হেভেনকে আর্কিটেকচারাল বিস্ময় বলা হয়—কাঠের তৈরি, অথচ কোন পেরেক ব্যবহার করা হয়নি। মিং আর কিং আমলের সম্রাটরা এখানে প্রার্থনা করতে আসতেন।

ওখান থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে রয়েছে নিষিদ্ধ নগরী। ওটার আরেক নাম, ইমপেরিয়াল প্যালেস—আটশো ভবনের একটা গুচ্ছ, মিং আর কিং সম্রাটরা বসবাস করতেন। নিষিদ্ধ নগরী তৈরি করা হয় পনেরো শতকে।

৩ জুন বিকেল চারটের সময় ওর গাইড লুসান হুমা ওকে নিতে আসবে। হুমা আসলে রানা এজেন্সির বেইজিং শাখার প্রধানও বটে।

বেইজিঙেই জন্ম আর বেড়ে ওঠা হুমার, তবে কাজ শুরু করে সাংহাইয়ে। এজেন্সির সাংহাই শাখা থেকে প্রমোশন দিয়ে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে তাকে। মাত্র দু'দিন হলো অফিসে বসছে, ফলে বেইজিং শাখার অনেক গোপন রহস্য সম্পর্কে এখনও অবহিত নয় সে।

আজ হুমা যেমন তার প্রাণপ্রিয় মাসুদ ভাইকে ঐতিহাসিক কয়েকটা জায়গা দেখাতে নিয়ে যাবে, তেমনি রানাও ওর বিশ্বস্ত একজন শাখাপ্রধানকে গোপন কিছু ফ্যাসিলিটির কথা জানাবে।

কিন্তু তিন তারিখ ভোরবেলা থেকেই রাজধানীতে কারফিউ জারি করা হলো। সরকারের হুকুম পেয়ে আন্দোলন থামাতে ব্যারাক থেকে বেরিয়ে এল পিপল'স্ লিবারেশন আর্মি।

অবরুদ্ধ শহরে ছড়িয়ে পড়ল অসম্ভব আর অবিশ্বাস্য সব গুজব। তারপর জানা গেল, সামরিক বাহিনী আসলেও নির্বিচারে পাখি মারার মত করে মানুষ মারছে।

সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, চিনকে সবার জন্য প্রাচুর্যময় একটা দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে হলে কঠোর নিয়ম-শৃংখলা আর বিধি-নিষেধের বেড়া তুলে নেওয়া যাবে না। সংখ্যাগুরুর স্বার্থ রক্ষা করার জন্য তাই সংখ্যালঘুকে নিশ্চিহ্ন করা হচ্ছে। এটা অঙ্ক, এর মধ্যে আবেগের কোন ভূমিকা রাখা হয়নি।

তিয়ানানমেন স্কয়্যার আক্ষরিক অর্থেই রক্তে ভেসে গেল। প্রথম দফাতেই লাশ পড়েছে কয়েকশো। শুরু হওয়ার পর আর থামছে না, থেমে থেমে হামলা চলছেই।

মারাত্মক সমস্যা দেখা দিয়েছে আহতদের নিয়ে। সংখ্যায় তারা কয়েক হাজার; শহরের সবগুলো হাসপাতালে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও জায়গা দেওয়া সম্ভব হয়েছে মাত্র এক চতুর্থাংশ

রোগীকে।

বাকি সবাই এখনও তিয়ানানমেন স্কয়্যারে পড়ে কাতরাচ্ছে, তাদের মধ্যে অনেকেই মারা যাচ্ছে রক্তক্ষরণে।

তারপর আরও খারাপ খবর এল। সেনাবাহিনীর ছোঁড়া বুলেটের সামনে বুক পেতে দেওয়ার জন্য সকাল দশটা থেকে নতুন করে আবারও শুরু হয়েছে প্রতিবাদ মিছিল, নেতৃত্ব দিচ্ছে পিকিং ইউনিভার্সিটির কয়েকজন অকুতোভয় ছাত্র-ছাত্রী।

এরকম একটা অবস্থায়, বিকেল চারটের দিকে মোঙ্গলের রুফ-টপ বার-এ বসে খুদে ট্র্যানজিসটার খুলে বিবিসি ধরার চেষ্টা করছে রানা, হঠাৎ ওর মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। নম্বরটা দেখেই বুঝতে পারল ও, লুসান হুমা ফোন করেছে।

'মাসুদ ভাই,' ভারী, থমথমে গলায় বলল হুমা, 'আমি ভুলিনি আপনাকে নিয়ে বেরুবার কথা ছিল আমার। কথাটা রাখতে পারলাম না বলে আপনি আমাকে মাফ করে দেবেন, প্লিজ!'

একজন চিনা হিসাবে যথেষ্ট বিনয়ী হুমা, জানে রানা, কিন্তু এই মুহূর্তে তার কথাগুলো প্রলাপের মত লাগল কানে–শহরের এরকম বিপজ্জনক অবস্থায় দেখা করতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ বা ক্ষমা চাওয়াটা মোটেও স্বাভাবিক নয়। 'কী ব্যাপার, লুসান, কিছু ঘটেছে? তুমি কোত্থেকে বলছ?'

'আমরা এখন, মাসুদ ভাই, আপনার হোটেলের পিছনে–তিয়ান তান পার্কে। ছাদে উঠে তাকালেই দেখতে পাবেন।'

'কেন?' আঁতকে উঠল রানা। 'এই পরিস্থিতিতে কোন বুদ্ধিতে তুমি বাইরে বেরিয়েছ...' হঠাৎ চুপ করে গেল রানা, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আমরা মানে?'

'আমরা মানে কয়েকশো মানুষ, মাসুদ ভাই...'

‘কয়েকশো মানুষ…কিন্তু তাদের সঙ্গে তুমি কী করছ পার্কে? শোনো, হুমা, এখনই আমার হোটেলে চলে এসো…’

‘কী করে যাব, মাসুদ ভাই? আমার কাঁধে যে ভারী একটা বোঝা !’ এটুকু বলেই হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল হুমা।

পরবর্তী দশ মিনিট চেষ্টা করে উদভ্রান্ত আর কাতর হুমার কাছে বেশি কিছু জানতে পারল না রানা। তবে ঠিক কী ঘটেছে বুঝে নিতে তেমন অসুবিধেও হলো না ওর।

ছোট এক ভাই ও এক বোন ছাড়া আর কেউ নেই হুমার। বোন জিজিয়ানা দালিয়ান হোস্টেলে থাকে, বেইজিং ভার্সিটি থেকে কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা শেষ করেছে–আগামী মাসে রেজাল্ট। ভাই থাকে দেশের বাড়িতে, লেখাপড়ায় তেমন ভালো না হওয়ায় চাষবাস করে। এ-সব আগে থেকেই জানা আছে রানার।

ছাত্রদের বিক্ষোভ দমন করার জন্য রাস্তায় আর্মি নামানো হয়েছে, এই খবর পেয়ে সকাল ন'টার দিকে বোনের হোস্টেলে ছুটে যায় হুমা, জানে ভয় পেয়ে চারদেয়ালের ভিতর বসে থাকার পাত্রী নয় সে।

কিন্তু সেখানে পৌঁছে শুনল, গোলাগুলি শুরু হয়েছে জানার পরই ছোট একটা মিছিল নিয়ে তিয়ানানমেন স্কয়্যারের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে দালিয়ান।

বোনের নিরাপত্তার কথা ভেবে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল হুমা। তারপর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সে-ও ছুটল ওদিকে। ওই বোনই তো তার সব, কাজেই যেভাবে হোক তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

যাবার পথে সে দেখল, শহরের চারদিক থেকে প্রতিবাদে মুখর ছোট ছোট অসংখ্য মিছিল বেরুচ্ছে।

কিন্তু তিয়ানানমেন স্কয়্যারে পৌঁছাতে একটু দেরি করে ফেলল হুমা।

মিছিল নিয়ে স্কয়্যারে পৌঁছাতে পারেনি দালিয়ান, তাদেরকে লক্ষ্য করে কয়েকটা হেলিকপ্টার থেকে মেশিন গানের ব্রাশ ফায়ার হলো। হুমার চোখের সামনে দালিয়ান সহ প্রায় সবাই লুটিয়ে পড়ল রাস্তার উপর।

লোকজন যে-যেদিকে পারে ছুটে পালাচ্ছে। গুলি করে এক ঝাঁক হেলিকপ্টার চলে গেল, পরক্ষণে দেখা গেল আরেক ঝাঁক ছুটে আসছে অন্যদিক থেকে। এরকম গোলাগুলির মধ্যেই ক্রল করে বোনের কাছে পৌঁছাল হুমা।

পাঁজরে আর হাঁটুর উপর গুলি খেয়েছে দালিয়ান। নিজের শার্ট ছিঁড়ে ক্ষতস্থান বাঁধলেও, তাতে রক্তক্ষরণ পুরোপুরি বন্ধ করা গেল না।

অজ্ঞান বোনকে কাঁধে নিয়ে সেই সকাল সাড়ে দশটা থেকে রাজধানীর অন্তত এক ডজন হাসপাতাল আর ক্লিনিকে ছুটোছুটি করল হুমা, কিন্তু কোথাও থেকে সামান্য প্রাথমিক চিকিৎসাও পেল না।

তারপর জানা গেল বেইজিং মেডিকেল কলেজের ছাত্র সংসদ আহতদের চিকিৎসা দেওয়ার জন্য তিয়ান তান পার্কে একটা ক্লিনিক খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বলা হয়েছে আহত লোকজনকে যেন ওখানে পৌঁছে দেওয়া হয়।

খবরটা পেয়ে কাঁধের ভারী বোঝা নিয়ে আরও কয়েকশো লোকের মত হুমাও পৌঁছেছে ওখানে। কিন্তু ইতিমধ্যে ঘণ্টাখানেক পার হয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত ক্লিনিক খোলার কোন লক্ষণ তার চোখে পড়েনি। বরং অন্যরকম একটা বিপদের আশঙ্কা করছে সে।

কোথাও থেকে পাঁচ-সাতজন ছাত্র-ছাত্রী এসে জড়ো হয়েছিল পার্কের একধারে, তাদের শ্লোগান শুনে চারদিক থেকে তরুণ-তরুণীরা এসে ভিড় করছে।

ইতিমধ্যে একবার কেউ একজন 'আর্মি আসছে' বলে চেঁচিয়ে ওঠায় ছুটোছুটি শুরু হয়ে গিয়েছিল। পরে জানা গেল পাশের রাস্তা দিয়ে মার্চ করে চলে গেছে তারা।

তবে এখানে যদি ছাত্ররা সমাবেশ করে, এক সময় না এক সময় আর্মি আসবেই; ব্যাপারটা এরইমধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেছে, আন্দোলনের নাম-নিশানা মুছে ফেলার জন্য মাঠে নেমেছে তারা। মিছিল করা তো দূরের কথা, কারফিউ-এর মধ্যে রাস্তায় যাকে দেখবে তাকেই খুন করার জন্য গুলি করবে। ইতিমধ্যে লাউডস্পিকারে সেরকমই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

মোবাইল ফোনে ফোঁপাচ্ছে লুসান হুমা, রানার প্রশ্নের কোন উত্তরই দিতে পারছে না সে। রানা তাকে জরুরি একটা মেসেজ দিতে চাইছে, কিন্তু মাথাটা ঠিকমত কাজ না করায় ওর কোন কথা ভালো করে শুনছেই না সে।

'শোনো, আমি একটা ঠিকানা দিচ্ছি!' মোবাইল সেটে চেঁচাচ্ছে রানা। 'জায়গাটা কাছেই, একটা কোড বললেই ওরা তোমার বোনকে...'

এই সময় পরপর কয়েকটা আওয়াজ শুনে শিউরে উঠল রানা। প্রথমে কপ্টার ইঞ্জিনের কর্কশ যান্ত্রিক গর্জন, পরমুহূর্তে সাবমেশিন গান থেকে ব্রাশ ফায়ারের একঘেয়ে শব্দ। তারপর একের পর এক গ্রেনেডের বিস্ফোরণ।

এক কি দু'সেকেন্ড পর একটা আর্তনাদও শুনতে পেল ও, এটা বেরিয়ে এল মোবাইল সেটের ভিতর থেকে।

পার্কের ভিতর আর্মি ঢুকেছে বুঝতে পেরে বার থেকে খোলা ছাদে বেরিয়ে যাচ্ছে বিদেশী কিছু রিপোর্টার, কারণ বিশতলা দালানটার পিছন থেকে টাইয়ান তান পার্কের অনেকটাই দেখা যায়।

'হুমা? হুমা?' মোবাইল ফোনে চিৎকার করছে রানা।

ওদিকে ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে হুমা। 'মাসুদ...ভাই...' থেমে থেমে কিছু বলতে চেষ্টা করল সে, '...বুক ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, আমি বাঁচব না...কিন্তু চিকিৎসা পেলে দালিয়ান বাঁচত...' তারপর হঠাৎই থেমে গেল সে। এমনকী নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলছে না।

অনেক ডাকাডাকি করেও হুমার আর সাড়া পাওয়া গেল না। অগত্যা বাধ্য হয়ে যোগাযোগ কেটে দিল রানা। টেবিল থেকে তুলে ক্যামেরাটা কাঁধে ঝোলাল ও, তারপর বার থেকে বেরিয়ে এল খোলা ছাদে।

মোঙ্গল বিল্ডিঙের ছাদের পিছনে ইতিমধ্যে অনেক লোকের ভিড় জমে গেছে। পার্কের পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছে তারা। নিজেদের কাজ সেরে ফিরে গেছে কপ্টারগুলো। গাছের নীচে আর ঝোপের ভিতর পড়ে আছে আহত মানুষ। সংখ্যায় তারা এত বেশি যে গুণে শেষ করা যাবে না।

পার্কের ভিতর মানুষে টানা তিন চাকার ভ্যান দেখা গেল বেশ কিছু। আহত লোকজনকে সম্ভবত ওই ভ্যানে তুলেই তিয়ানানমেন স্কয়্যার থেকে পার্কে নিয়ে আসা হয়েছে।

কয়েকজন সাংবাদিক সিদ্ধান্ত নিল, দুনিয়ার মানুষকে এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের কথা জানানো তাদের কর্তব্য, কাজেই প্রাণের উপর ঝুঁকি নিয়ে হলেও আহতদের ছবি তুলতে পার্কের ভিতর ঢুকবে তারা।

রানাও বেজিঙে এসেছে একজন রিপোর্টার-এর কাভার নিয়ে, ফলে তাদের সঙ্গে ভিড়ে যেতে ওর কোন অসুবিধে হলো না।

গ্রাউন্ড ফ্লোরে নেমে হোটেলের পিছনের বাগান দিয়ে পথ করে নিল ওরা, চুপিসারে পাঁচিল টপকে পৌঁছে গেল তিয়ান তান পার্কে।

মিনিট তিনেক হাঁটার পর ফটো তোলার প্রথম সাবজেক্ট পেয়ে গেল জার্নালিস্টরা—একসঙ্গে তিনটে লাশ।

একটু পর রানার মনে হলো জেগে নেই ও, ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখছে। এরপর যাদেরই লাশ দেখল, তাদেরকে ভাগ্যবান বলে মনে হলো ওর—কারণ মরে গিয়ে বেঁচে গেছে তারা।

যারা বেঁচে আছে তাদের অনেকেরই হাত বা পা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে কাছাকাছি, কারও হয়তো অর্ধেক শরীরই নেই। কেউ পেট ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা নিজের নাড়িভুঁড়ির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে, কেউ নিজের রক্তস্রোতে সাঁতরাচ্ছে।

বিদেশী লোকজন দেখে সাহায্যের আশায় হাত বাড়াচ্ছে তারা। চারপাশ থেকে ভেসে আসা কাতর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে রানা। কেউ বলছে, 'একটু পানি!' আবার কেউ মিনতি করছে, 'মেরে ফেলো, প্লিজ!'

আধ ঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর লুসান হুমাকে দেখতে পেল রানা। নিজের শরীর দিয়ে বোনকে আড়াল করে রেখেছে সে, বোধহয় সেজন্যই মেয়েটির গায়ে নতুন করে কোন আঘাত লাগেনি—না বুলেটের, না গ্রেনেডের। দু'জনেরই পালস দেখল রানা।

হুমা মারা গেছে।

কিছু লোক লাশ বা আহত তরুণ-তরুণীদের ভ্যানে তুলে পার্ক থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছে। পরিত্যক্ত একটা ভ্যান ঠেলে পার্ক থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল রানাকেও।

বেজিঙে রানা এজেন্সির কয়েকটাই সেফহাউস আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে নিরাপদ বলে মনে করা হয় শহরের উপকণ্ঠে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের একটা মঠকে। মোবাইল ফোনে এই মঠের ঠিকানাই হুমাকে দিতে চেয়েছিল রানা।

সরু অলিগলি ধরে মঠে পৌঁছাতে এক ঘণ্টার উপর লেগে গেল রানার। তবে একবার পৌঁছানোর পর আর কোন সমস্যা হলো না।

মঠটা বিরাট, পাঁচশো ভিক্ষু বসবাস করেন। ভিতরে ছোট একটা ক্লিনিক আছে, বাইরের রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয়। ভিক্ষুদের মধ্যেও সবাই জানেন না যে ক্লিনিকের সমস্ত খরচ বহন করছে রানা এজেন্সি।

একদল ভিক্ষু হুমার লাশ নিয়ে চলে গেল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করা হবে তার।

খানিক পর দালিয়ানকে পরীক্ষা করে ক্লিনিকের ডাক্তাররা রানাকে ডেকে পাঠালেন। রক্তের গ্রুপ জানিয়ে ওকে বলা হলো, রোগিণীকে বাঁচাতে হলে অন্তত দুই ব্যাগ রক্ত এই মুহূর্তেই দরকার।

ডাক্তারদের আন্তরিক চেষ্টা, নার্সদের সযত্ন সেবা আর ভাগ্যগুণে তিনদিন পর জ্ঞান ফিরে পেল দালিয়ান। ডাক্তররা জানালেন, সংকট কেটে গেছে; তবে পুরোপুরি সুস্থ হতে অন্তত দু'মাস সময় লাগবে তার।

এক হপ্তা পর চিন থেকে দেশে ফিরে আসে রানা।

কিন্তু দালিয়ানের বিপদ তখনও কাটেনি। আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল, আহত হয়ে গোপনে চিকিৎসা নিচ্ছে, এরকম ছাত্র-ছাত্রীদের খোঁজে হসপিটাল আর ক্লিনিকগুলোয় হানা দিচ্ছে

মিলিটারি।

ধরতে পারলে সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালতে পাঠিয়ে দিচ্ছে, সেখানে বিচারের নামে চলছে নিষ্ঠুরতা—মৃত্যুদণ্ড ছাড়া অন্য কোন সাজা নেই, কারণ কারফিউ অমান্য করে যারাই বাইরে বেরিয়ে ছিল সামরিক বাহিনীর দৃষ্টিতে তারা সবাই দেশদ্রোহী।

মঠের কাছাকাছি খ্রিস্টানদের একটা মিশনারি আছে। আমেরিকান দূতাবাস থেকে ফাদারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আহত ছাত্র-ছাত্রীরা আশ্রয় চাইলে তাদেরকে যেন ফিরিয়ে দেওয়া না হয়। খুব কম মানুষই জানে যে মিশনারিটা আসলে সিআইএ-র একটা আস্তানা।

ডাক্তার আর ভিক্ষুরা আর কোন উপায় না দেখে ওই মিশনারিতে পাঠিয়ে দিলেন দালিয়ানকে, কারণ জানেন মিলিটারি ওখানে হানা দেবে না। তবে দালিয়ান কেমন আছে না আছে নিয়মিত খোঁজ নেন তাঁরা।

শ্বেতাঙ্গ ডাক্তারদের চিকিৎসায় ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল দালিয়ান। রেজাল্ট বেরুতে দেখা গেল ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে সে।

ইতিমধ্যে ভিক্ষুরা জানিয়েছেন, পার্ক থেকে মিস্টার রায়হান চৌধুরী তাকে ভ্যানগাড়িতে তুলে মঠে নিয়ে আসেন, গ্রুপ মিলে যাওয়ায় তিনিই তাকে রক্ত দিয়েছেন, আর তার ভাই লুসান হুমা কীভাবে মারা গেছেন। বলাই বাহুল্য যে মঠের ভিক্ষুরা রানাকে ওই নামেই চেনে।

প্রায় এক বছর পর ঢাকায় বসে দালিয়ানের একটা চিঠি পেল রানা।

তার চিঠির একটা অংশ ছিল এরকম—'বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মুখে সব কথা শোনার পর যে-কারও মনে এরকম ধারণা জন্মানোটা

স্বাভাবিক যে মর্ত্যলোকে নেমে আসা কোন দেবতার পবিত্র স্পর্শে জীবনটাকে নতুন করে ফিরে পেয়েছি আমি। কিন্তু কাউকে দেবতার আসনে বসালে ঋণ পরিশোধ করার কোন উপায় থাকে না, তাই আপনাকে মহৎপ্রাণ একজন মানুষ হিসাবেই ভাবতে চাই। আমি কখনও ভুলব না যে আমাদের সম্পর্কটা এখন রক্তের...'

ওই চিঠিতেই কয়েকটা খবর দেয় দালিয়ান। মার্কিন দূতাবাসের কমপিউটার সেকশনে খুব ভালো একটা চাকরি পেয়েছে সে। আগামী মাসে তার বিয়েও হয়ে যাচ্ছে। চৌচেন ঝাও বেইজিং ভার্সিটিরই তরুণ ইংলিশ লেকচারার। পরস্পরকে অনেকদিন ধরে ভালোবাসে তারা।

এরপর বেশ কয়েকবারই চিনে এসেছে রানা, তবে ব্যস্ততার কারণে প্রথমবার দালিয়ার সঙ্গে দেখা করতে চার বছর লেগে যায় ওর। আনুষ্ঠানিক পরিচয়, কুশলাদি বিনিময় ইত্যাদির পর লুসান হুমার স্মৃতি রোমন্থন করেই সময়টা পার করে ওরা।

রানার সস্নেহ আচরণ দালিয়ানকে বুঝিয়ে দেয়, তাকে নিয়ে ওর কোন 'মতলব' নেই। বুঝতে পারে, এ সম্পূর্ণ অন্য ধাতুতে গড়া মানুষ, এর সামনে এমনকী ঠাট্টা করেও ঋণ পরিশোধের কথাটা তোলা উচিত হবে না।

তারপর এক সময় দালিয়ার স্বামী চৌচেন ঝাওয়ের সঙ্গেও পরিচয় হয় রানার। বুদ্ধিমান আর বিনয়ী তরুণ, দালিয়ার মত তারও খুব ভক্তি আছে রানার প্রতি।

সেই থেকে ওদের মধ্যে শ্রদ্ধা আর স্নেহের একটা সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেছে। দেখা-সাক্ষাৎ খুব কম হয়, তবে পরস্পরের খবর রাখার চেষ্টা করে।

দুই

আটটা বাজতে দশ মিনিট বাকি, এ-সময় অফিসে দালিয়াকে পাওয়া যাবে না। পে বুদ থেকে দালিয়াদের ফ্ল্যাটের নম্বরে ডায়াল করল রানা।

'হ্যালো?' সর্তক কণ্ঠস্বর, যেন খুব ভয়ে ভয়ে আছে।

আওয়াজটা চৌচেন ঝাওয়ের বলে চিনতে পারল রানা। 'আমি রায়হান চৌধুরী...' শুরু করতে না করতে বাধা পেল ও।

'কী বললেন? রায়হান ভাই?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল চৌচেন। এক কি দু'সেকেন্ডের বিরতি, তারপরই রানাকে হতভম্ব করে দিয়ে আবার বলল, 'সরি, রঙ নাম্বার!' সঙ্গে সঙ্গে কেটে দিল লাইন।

তারপরও ক্লিক করে একটা আওয়াজ শুনল রানা। তারমানে কি আরেকটা রিসিভারে ওদের কথা শুনল দালিয়া? নাকি দালিয়াদের টেলিফোন লাইনে আড়িপাতা যন্ত্র ফিট করা হয়েছে? অন্তত ওর মনে কোন সন্দেহ নেই যে চৌচেন রিসিভার রেখে দেওয়ার পর আরও একজন কেউ তার রিসিভার নামিয়েছে।

তাড়াতাড়ি যোগাযোগ কেটে দিয়ে বুদের ভিতরই দাঁড়িয়ে থাকল রানা, দ্রুত চিন্তা করছে। চৌচেন ঝাও ওকে চিনতে

পেরেছে ঠিকই, তা না হলে 'ভাই' বলত না। তা হলে 'সরি, রঙ নাম্বার' বলার কারণ কী?

নিশ্চয়ই ওরা কোন কঠিন বিপদে পড়েছে। কিংবা পড়তে যাচ্ছে। একটা আশঙ্কার কথা মনে জাগতে বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল রানার।

দালিয়া বেঁচে আছে তো ?

রঙ নাম্বার বলার কারণটা পরিষ্কার—চৌচেনের মনে পড়ে গেছে বা সন্দেহ হয়েছে যে ওদের ফোনে কান পেতে আছে কেউ, তাই রানাকে আর কিছু বলতে না দিয়ে যোগাযোগ কেটে দিয়েছে।

যোগাযোগ কেটে দিয়েছে নিশ্চয়ই আবার যোগাযোগ করবে বলে। বিপদ বা রহস্য যাই হোক, সেটা কী জানতে হলে অপেক্ষা করতে হবে রানাকে।

তবে কুবলাই খান হোটেলে নয়।

বুদ থেকে বেরিয়ে এসে এলিভেটরে চড়ল রানা। নিজের রুম থেকে সুটকেস নিয়ে হোটেল ছাড়তে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগল না ওর।

আধ মাইলটাক হেঁটে উল্টো দিক থেকে আসা একটা ট্যাক্সি থামাল রানা, মধ্যবয়স্কা ড্রাইভার হোটেল গ্রেটওয়াল-এ পৌঁছে দিল ওকে ।

নতুন হোটেলে উঠে নিজের স্যুইট থেকে ওর এজেন্সির বেইজিং শাখার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করল রানা, জরুরি কয়েকটা নির্দেশ দেবে ওদেরকে। ওর কল সরাসরি বুন লি রিসিভ করল। সে-ই বেইজিং শাখার বর্তমান প্রধান।

'মাসুদ ভাই!' কে ফোন করেছে বুঝতে পেরে আবেগে আর উত্তেজনায় কেঁপে গেল বুন লির কণ্ঠস্বর। 'আপনিও বেইজিঙে?'

সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল রানার। 'আমিও বেইজিঙে মানে?'

'ওহ্, গড! মাসুদ ভাই, আপনি সত্যি কিছু জানেন না?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে দ্রুত কথা বলে যাচ্ছে বুন। 'বেইজিংকে এখন আপনি স্পাই নগরী বলতে পারেন। এ তল্লাটের এমন কোন ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ নেই যারা গত এক হপ্তার মধ্যে নিজেদের লোক পাঠায়নি এখানে। আর ইঙ্গ-মার্কিন এজেন্টদের কথা কী বলব! সিআইএ আর ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ গিজগিজ করছে...'

'কেন?' শান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে জানতে চাইল রানা, 'কী ব্যাপার বলো তো?'

'এটাই তো সবার মাথা খারাপ করে দিচ্ছে, মাসুদ ভাই! কেউ বলতে পারছে না কী ঘটেছে বা ঘটতে যাচ্ছে। অথচ এদিকে আমরা খবর পাচ্ছি বিগ ব্রাদাররা পর্যন্ত মাঠে নেমে পড়েছে...'

মনে মনে একটা ধাক্কা খেল রানা। লিজ-এর মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় ১ জুলাই, ১৯৯৭ সালে হংকং ছেড়ে চলে গেছে ইংরেজরা। তবে অনেক আগেই হংকঙের মাটিতে বিভিন্ন খাতে নৈতিক অধঃপতনের মারাত্মক বীজ বপন করেছিল তারা, সে-সব এখন বিশাল একেকটি মহীরুহ। মূল ভূখন্ডের সঙ্গে নতুন করে এক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হংকঙের সেই বিষাক্ত বীজের ফলশ্রুতি, অর্থাৎ পশ্চিমা ধাঁচের গ্যাঙস্টাররা নিজেদের পেশিশক্তি নিয়ে ঢুকে পড়েছে সাংহাই আর বেইজিং সহ চিনের সবগুলো বড় শহরে। এই সব মহা প্রতাপশালী গ্যাঙস্টার বা গডফাদারদের বলা হয় 'বিগ ব্রাদার'।

বিগ ব্রাদারদের দমন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে

পুলিশ, তবে এখনও ঠিকমত পেরে উঠছে না–নানান ধরনের ছলচাতুরীর মাধ্যমে টিকে আছে তারা মূল ভূখণ্ডে।

বিগ ব্রাদাররা সাধারণত মোটা টাকার গন্ধ না পেলে কোন অপারেশনে আগ্রহ দেখায় না। তবে একবার যদি দেখায়, ওই ব্যাপারটায় আর কারও কিছু করার থাকে না।

বিগ ব্রাদারদের কাজের ধারাই হলো প্রথমে একের পর এক লাশ ফেলে আতঙ্ক সৃষ্টি করা, মাঠে যাতে তারা ছাড়া আর কেউ না থাকে।

'আমাদের সোর্স?' বুনকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে তারাও কিছু জানাতে পারেনি?'

'আন্ডারগ্রাউন্ডে শুধু একটা গুজব শোনা যাচ্ছে, যাই ঘটে থাকুক, তার সঙ্গে নাকি মার্কিন দূতাবাস জড়িত।'

বুনকে আরও দু'একটা প্রশ্ন করে নিশ্চিত হলো রানা, এ-ব্যাপারে তার কাছ থেকে আর কিছু জানার নেই। তাকে জরুরি কয়েকটা নির্দেশ দিল ও, তারপর বলল, 'শোনো, বুন, আমার একটা পিস্তল দরকার, কাউকে দিয়ে হোটেলে পাঠিয়ে দাও। আর একটা ফোন নম্বর দিচ্ছি, মুখস্থ করে নাও।'

যোগাযোগ কেটে দিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল রানা। দালিয়া মার্কিন দূতাবাসে চাকরি করে। আর আন্ডারগ্রাউন্ডে গুজব ছড়িয়েছে–যাই ঘটে থাকুক, তার সঙ্গে মার্কিন দূতাবাস জড়িত।

এই দুটো তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে টেলিফোনে চৌচেন ঝাওয়ের অদ্ভুত আচরণের একটা তাৎপর্য আছে বলে মনে হয় না?

রানার ধারণা, দালিয়া বা চৌচেন ওর সঙ্গে অবশ্যই যোগাযোগ করবে। তবে সেটা আজ রাতে না হয়ে কাল সকালে হবারই সম্ভাবনা বেশি।

কাজেই, সিদ্ধান্ত নিল ও, বেজিঙের অন্যতম বিগ ব্রাদার হুন চেননি-র একটা আস্তানায় ঢুঁ মারা যেতে পারে। ভাগ্য ভালো হলে রানা এজেন্সির সোর্স তুন পানচু-র সঙ্গে ওর দেখাও হয়ে যেতে পারে ওখানে।

চেহারা একটু পাল্টে নিতে আধ ঘণ্টা সময় নিল রানা। সুতি ক্যাপের বাইরে বেরিয়ে থাকা জুলফিতে সামান্য পাক ধরেছে, গোঁফ জোড়া পাকানো, নাকের ডগায় ঝুলে আছে ঢাউস গ্লাস লাগানো চশমা।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে বেইজিঙের দক্ষিণ উপকণ্ঠে চলে এল রানা। শহর আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার মাঝখানে জায়গাটার নাম তাইমাই।

হঙকঙ থেকে আসা বিগ ব্রাদাররা তাইমাইকে বেইজিঙের ক্রাইম জোন হিসাবে কুখ্যাত করে তুলেছে। বিশাল এলাকা, ত্রিশ লাখ লোকের বসবাস। পুলিশকে আমরা সাহায্য করতে চাই, এ-কথা বলে এলাকাটাকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে এখানকার আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে কুখ্যাত পাঁচজন বিগ ব্রাদার।

গুরুতর অপরাধ সারাক্ষণই ঘটছে এখানে, তবে সে-সব ধামাচাপা দিয়ে পুলিশের ভাবমূর্তি অম্লান রাখতে সম্ভাব্য সব কিছু করছে পাঁচ বিগ ব্রাদার।

গোটা এলাকায় শুধু বৈধ মদের দোকানই আছে হাজার দুয়েক। বলা হয় প্রতিদিন কম করেও দশ হাজার ছদ্মবেশী বেশ্যা আসা-যাওয়া করে এখানে–এরা আসলে কল-কারখানার শ্রমিক, বিশেষ করে গার্মেন্টস-এর, ছুটি পেলেই উপরি রোজগারের আশায় চলে আসে এদিকে।

আইনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে প্রতিদিন আলাদা জায়গায়

চোরাই মালের পাইকারী বাজারও বসে, অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রের ছড়াছড়ি সেখানে।

আর বসে জুয়ার আসর।

বিশেষ করে ট্যুরিস্টদের কথা মনে রেখে সম্প্রতি ক্যাসিনো খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, ফলে তাইমাই এলাকার প্রতিটি হোটেলে জমজমাট জুয়ার আসর বসছে।

এলাকায় ঢোকার আধ ঘণ্টার মধ্যেই রানা এজেন্সির সোর্স বা ইনফর্মার তুন পানচুকে খুঁজে নিল রানা। ছদ্মবেশ থাকায় ওকে প্রথমে চিনতে পারেনি সে, ও-ই কাছে ডেকে পরিচয় দিল।

'আপনিও চলে এসেছেন, সার?' ছুঁচোর মত চেহারা, রানাকে চিনতে পেরে নিজের টাকে একটা টোকা মারল পানচু। এটা তার একটা মুদ্রাদোষ।

একটা বার-এ বসে মিনিট দশেক কথা বলল ওরা।

না, বিভিন্ন দেশের স্পাইরা কী কারণে রাজধানীতে ভিড় করেছে পানচু তা জানে না। তবে শুনতে পাচ্ছে মার্কিনিদের কিছু একটা নাকি হারিয়ে গেছে।

'কী হারিয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

চকচকে মাথাটা নাড়ল পানচু। 'তা কেউ বলতে পারছে না,' বলল সে। একটু পর আবার বলল, 'তবে তিনশো ডলার দামের একটা ইনফরমেশন আছে আমার কাছে।'

'কী ইনফরমেশন?' জানতে চাইল রানা।

কথা না বলে টাকে আরেকটা টোকা মারল পানচু।

মানিব্যাগ বের করে তার হাতে দুটো একশো ডলারের নোট গুঁজে দিল রানা। 'বলো এবার।'

প্রথমে টাকাটা পকেটে ভরল পানচু। তারপর বলল, 'হংকঙের

মিন ভাইরাও এখন বেইজিঙে।'

'আচ্ছা?' শিরদাঁড়া একটু খাড়া হলো রানার। 'চৌ আর থৌ দু'জনই?'

টাক চুলকাল অপরাধ জগতের বাসিন্দা পানচু। 'আমি তো সেরকমই শুনেছি। তবে একা শুধু বড়টাকে দেখেছি, চৌ মিনকে।'

উত্তেজনা বোধ করছে রানা, কারণ জানে মায়ানমার আর হংকঙের গোপন আস্তানা ছেড়ে মিন ভাইরা সাধারণত বেরোয় না। তাদের মাথায় যত চুল, শত্রুর সংখ্যা তার চেয়ে বেশি হবে তো কম নয়।

তথ্য সওদাগর বলা হয় মিন ভাইদের। তাদের পণ্য হলো এওপিওনাজ জগতের চুরি করা টপ সিক্রেট ইনফরমেশন। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-প্রমাণ যেমন চড়া দামে কেনে, তেমনি অবিশ্বাস্য দামে বিক্রিও করে। ওদের বেশিরভাগ তথ্যই মিলিয়ন ডলারের কমে বিকোয় না। সব তথ্য যে কেনে তারা, তা নয়, অনেক সময় চুরিও করে।

ক্রেতার সংখ্যা বেশি দেখলে নিজেদের পণ্য নিলামে তুলে দেয় মিনরা। তাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগটা সবচেয়ে বেশি শোনা যায়—একই তথ্য একাধিক ক্রেতার কাছে বিক্রি করে। তবে রানাকে কখনও ঠকাবার চেষ্টা করেনি তারা। রানা ওদের নাড়ি-নক্ষত্রের সমস্ত খবর জানে, আর তারাও ওর ক্ষমতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল—সেটাই বোধহয় কারণ।

'কোথায় সে?' পানচুর হাতে আরও একটা একশো ডলারের একটা নোট গুঁজে দিয়ে জানতে চাইল রানা।

'আধ ঘণ্টা আগের খবর জানি, বিগ ব্রাদার হুন চেননির নতুন ক্যাসিনোয় বসে তাস খেলছে চৌ মিন,' বলে কাঁধ ঝাঁকাল পানচু,

টোকাও মারল টাকে। 'তার চারপাশে হুন চেননির স্পেশাল গার্ডরা যেভাবে দেয়াল তুলে রেখেছে, কাছে ঘেঁষতে পারবেন বলে মনে হয় না। দেখেন!'

তাকে টেবিলে বসিয়ে রেখে বার থেকে বেরিয়ে এল রানা। দশ মিনিট এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে নিশ্চিত হয়ে নিল কেউ ওর পিছু নেয়নি, তারপর কাজ শুরু করল।

হুন চেননির ক্যাসিনোয় ঢুকে চৌ মিনকে খুঁজলই না রানা। মেইন কাউন্টারে এসে একটা কাগজে কিছু লিখল, তারপর সেটা বাড়িয়ে ধরল একজন অ্যাটেনড্যান্টের দিকে, মেয়েটিকে দেখিয়ে কাগজের ভাঁজে একশো ডলারের একটা নোট ঢুকিয়ে দিতে ভোলেনি। 'এটা এই মুহূর্তে মিস্টার চৌ মিনের কাছে পৌঁছে দিতে হবে, প্লিজ।'

রানা লিখেছে, 'কোন্ স্পর্ধায় গর্ত থেকে বেরিয়েছ, তোমাদের কি মরার ভয় নেই? জিনিসটা কী জানাও আমাকে। আর ক্রেতার তালিকায় আমাকেও যেন রাখা হয়। মাসুদ রানা। মোবাইল নম্বর...'

নাকি সুরে চিঁ-চিঁ করে চৈনিক সুন্দরী বলল, 'ইউ আর ওয়েলকাম, সার।' তারপর ইউনিফর্ম পরা একজন ওয়েটারকে ডেকে কী করতে হবে বুঝিয়ে দিল। কাগজটা নিয়ে এলিভেটরের দিকে ছুটল ওয়েটার।

আট মিনিটের মাথায় ফিরে এল সে, হাতে সেই একই কাগজ, তবে এবার তাতে চৌ মিনের লেখা কয়েকটা লাইন রয়েছে।

রানার প্রশ্নের উত্তরে চোরাই তথ্যের সওদাগর চৌ মিন লিখেছে, 'আমাদেরকে দাওয়াত দিয়ে আনা হয়েছে, বস্, এখানে আমরা বিগ ব্রাদার হুন চেননির মেহমান। জিনিসটা কী এখনও জানার সুযোগ হয়নি। তবে বলা হচ্ছে কালো একটা নকশা।

তালিকায় নাম আছে একুশজনের, আপনার নামটা তিন নম্বরে রাখতে চেষ্টা করব। চৌ মিন।'

তিন

জিজিয়ানা দালিয়ান আর তার স্বামী চৌচেন ঝাওয়ের ফ্ল্যাটটা এয়ারপোর্ট রোডের উপর অভিজাত এলাকায়।

এলাকায় কোন হোটেল-রেস্তোরাঁ, বাজার-হাট বা দোকান-পাট নেই, নেই কোন পাবলিক পার্কিং ফ্যাসিলিটিও, তার উপর সারাক্ষণ সশস্ত্র পুলিশ টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, ফলে কাছাকাছি কোথাও থেকে ফ্ল্যাটটার উপর নজর রাখা অত্যন্ত কঠিন।

অগত্যা তাইমাই ক্রাইম জোনের পাঁচ বিগ ব্রাদারদের মধ্যে চারজনই ওদের আশপাশে একটা করে ফ্ল্যাট ভাড়া করতে বাধ্য হয়েছে।

একা শুধু বিগ ব্রাদার হুন চেননি এ-সব ঝামেলার মধ্যে যায়নি। তার কাজের ধারাই আলাদা। সরকারী টেলিফোনের দু'জন ইঞ্জিনিয়ারকে ঘুষ দিয়েছে, ফলে নিজের আস্তানায় বসে ঝাও পরিবারের ফোন লাইনে কান পাতার সুবিধে ভোগ করছে সে।

তারচেয়েও বড় কাজ হলো, ওই ফ্ল্যাটের এক বাসিন্দাকে জলজ্যান্ত দুটো প্রাণ আর নগদ এক লাখ মার্কিন ডলারের

বিনিময়ে বিক্রি হয়ে যাবার প্রস্তাব দিয়ে রেখেছে সে। ওই বাসিন্দাও একজন ঝাও।

রাত আটটায় দালিয়াদের নম্বরে করা রানার ফোনটা নিজ ক্যাসিনোর অফিসে বসে শুনল হুন চেননি। রিসিভিং মেশিনের ভলিউম বাড়িয়ে দেওয়ায় রানা আর চৌচেন ঝাওয়ের কথা উপস্থিত সবাই শুনতে পেল।

তার দু'পাশে নিজস্ব বাহিনীর কয়েকজন লিডার ছাড়াও সামনে বসে রয়েছে চৌ মিন আর তার ভাই থৌ মিন। কুখ্যাত এই দুই ভাইকে হংকং থেকে সে আনিয়েছে কালো নকশা নামে একটা ফাইল বিক্রি করার জন্য।

ব্যাপারটা অদ্ভুত বলে মনে হতে পারে। কারণ যে জিনিস সম্পর্কে কারও কোন ধারণা নেই, এমনকী কোথায় আছে তাও কেউ জানে না, সেটা সে বিক্রি করতে চাইছে কীভাবে?

কেউ কিছু না জানলেও, হুন চেননি ব্যাপারটা সম্পর্কে কিছুটা অন্তত জানে। যেমন–সিআইএ-র একজন এজেন্ট তার সঙ্গে দেখা করে ওটার বিনিময়ে পাঁচ মিলিয়ন ডলার সেধেছে।

মার্কিন দূতাবাসের এক বুড়ো কর্মকর্তা টাকার অঙ্কটা আরও বাড়িয়ে দিয়ে গেছে–সাত মিলিয়ন ডলার।

এদের কাছ থেকেই প্রথম জানা যায়, মার্কিন দূতাবাস থেকে সাত রাজার ধনটা হারিয়ে গেছে। সাত রাজার ধন মানে একটা টপ সিক্রেট ফাইল। এই ফাইলটাকেই বলা হচ্ছে কালো নকশা।

প্রতিবেশী দেশ রাশিয়া আর ভারতের ইন্টেলিজেন্সও কম আগ্রহ দেখাচ্ছে না, বলছে পনের কি বিশ লাখ ডলার দিয়ে তারা ওই কালো ফাইলটায় একবার শুধু চোখ বুলাতে চায়।

এরকম আরও বেশ কয়েকটা দেশের ইন্টেলিজেন্স হুন চেননির

সঙ্গে এ-ব্যাপারে আলাপ করতে আগ্রহী বলে জানিয়েছে।

শুধু কী তাই! একাধিক সরকারী, অর্থাৎ চিনা ইন্টেলিজেন্সও যোগাযোগ করেছে তার সঙ্গে। তারা টাকার অঙ্কটা বাড়ায়নি ঠিকই, তবে উপরি পাওনা হিসাবে ভবিষ্যতে তার অনেক কেস হালকা করে দেখা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

হংকং থেকে আসা হুন চেননি সাত ঘাটের পানি খাওয়া বিগ ব্রাদার, ঠাণ্ডা মাথায় অনেক চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে কী করবে। তার যে প্ল্যান, তাতে কোন সন্দেহ নেই যে কালো নকশাটা সে-ই পেতে যাচ্ছে। প্রশ্ন হলো, পাবার পর দেবে কাকে।

হুন চেননি খুব ভালো করেই জানে যে তাইমাই এলাকার যত প্রতাপশালী ব্রাদারই হোক সে, সম্ভাব্য ক্রেতারা প্রত্যেকে তার সর্বনাশ করার ক্ষমতা রাখে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হলো দুনিয়ার একমাত্র সুপারপাওয়ার আর তার নিজের দেশ হলো হিকমতে চিন। ফাইলটা সে যার কাছেই বিক্রি করুক, সে ছাড়া বাকি সবাই তার শত্রু হয়ে যাবে, এবং হয়তো আক্রোশের বশে প্রতিশোধও নিতে চাইবে।

কাজেই এত সব ঝামেলা আর বিপদের মধ্যে না গিয়ে আঙুল তুলে একজন লোককে দেখিয়ে দেবে সে, বলবে–ফাইলটা ওই লোকের কাছে আছে, তোমরা যে পারো কিনে নাও।

সবাই তা বিশ্বাসও করবে। কারণ লোকটাকে তারা চেনে। তার নাম, বলাই বাহুল্য, চৌ মিন।

চৌ মিনের কাছে সত্যি থাকবেও ফাইলটা। কারণ হুন চেননি ওটা হাতে পাওয়া মাত্র একটু দেরি না করে তার কাছেই বিক্রি করে দেবে। এই হলো তার প্ল্যান। মিন ভাইদের হংকং থেকে

বেইজিংয়ে দাওয়াত দিয়ে আনার পিছনে এটাই কারণ।

দুই ভাইয়ের সঙ্গে চূড়ান্ত আলাপটাও সেরে ফেলেছে হুন চেননি। কালো নকশার বিনিময়ে মাত্র চার মিলিয়ন ডলার পাবে সে। এর বেশিতে কিনতে রাজি করানো গেল না মিন ভাইদের। সন্দেহ নেই এর দ্বিগুণ বা তারচেয়েও বেশি দামে বেচবে তারা। তা বেচুক, ঝক্কি-ঝামেলাও তো কম পোহাতে হবে না তাদের।

দুই ভাইয়ের উদ্দেশ্য বা মতলব সম্পর্কে আসলে হুন চেননির কোন ধারণা নেই। তারা পরিষ্কার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে, মাত্র এক লাখ ডলারে জিনিসটা সংগ্রহ করতে যাচ্ছে চেননি। এক লাখে কিনে চল্লিশ লাখের কমে বেচবে না, এটা কি মেনে নেওয়া যায়?

মিন ভাইরা চিন্তা করছে, বিকল্প অন্য কী উপায়ে মাইক্রোফিল্মটা পাওয়া যায়। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার সুযোগ পেলে সেটা তারা হাতছাড়া করবে কেন।

রাত আটটায় দালিয়াদের নম্বরে করা রানার ফোনটা শুনে দু'পাশে দাঁড়ানো কর্মীবাহিনীর লিডারদের উপর চোখ বুলাল বিগ ব্রাদার হুন চেননি। 'এই রায়হান লোকটা কে?'

লিডাররা কেউ কথা বলছে না।

'জানো না।' অসন্তুষ্ট দেখাল হুন চেননিকে। 'ঠিক আছে, যাও, ধরে এনে লোকটার চামড়া খুলে নিয়ে গায়ে লবণ মাখাও।'

লিডাররা কেউ নড়াচড়া করার আগে মাঝখান থেকে চৌ মিন বলল, 'আমার ভুলও হতে পারে, তবে যেন মনে হলো ভদ্রলোকের গলার আওয়াজটা খুব পরিচিত। আমি যদি ঠিক চিনে থাকি, তাঁকে না ঘাঁটানোই ভালো।'

'পরিচিত?' হুন চেননি নড়েচড়ে বসল। 'না ঘাঁটানো ভালো?

মানে?'

'একটা ইনভেস্টিগেটিং ফার্মের মালিক ভদ্রলোক, সারা দুনিয়ায় কোথায় না শাখা অফিস খুলেছেন। চিনা সিক্রেট সার্ভিসের এখন যিনি চিফ, তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুও বটেন। আসল নাম রায়হান চৌধুরী নয়, মা...'

'চিনেছি এবার,' চৌ মিনকে থামিয়ে দিয়ে গম্ভীর গলায় বলল হুন চেননি। 'মূর্তিমান অভিশাপ।' চিন্তিত হয়ে পড়ল সে। 'আমরা তাকে না ঘাঁটালেই যে পার পাব, তার কোন নিশ্চয়তা নেই।' লিডারদের দিকে ফিরে চোখ রাঙাল। 'মাথা খাটিয়ে বের করো কীভাবে এড়ানো যায় মাসুদ রানাকে।'

পরিবেশটা হালকা করতে চাইল চৌ মিন, বলল, 'আপনার ক্যাসিনোয় আছি, অথচ ভাগ্য পরীক্ষা করব না, তা কি হয়? কাজ সেরে আমাকে ছুটি দিন, মিস্টার হুন চেননি।'

'ঠিক, কাজটা সেরে ফেলা দরকার।' পকেট থেকে একটা খুদে মোবাইল সেট বের করে বোতামে চাপ দিচ্ছে হুন চেননি। তারপর কানে তুলল সেটা। শুনতে পেল অপরপ্রান্তে রিঙ হচ্ছে। 'মিস্টার পাওচেন ঝাও নাকি?'

অপরপ্রান্ত থেকে একটা চাপা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'হ্যাঁ, মিস্টার হুন চেননি।'

'আমি আপনাকে একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম, মিস্টার...'

'আপনার প্রস্তাবে আমি রাজি।'

'ওয়ান্ডারফুল! মার্ভেলস!' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল হুন চেননি। তারপর হঠাৎ বিগ ব্রাদার সুলভ গাম্ভীর্যের সঙ্গে জানতে চাইল, 'মিস্টার পাওচেন ঝাও, আপনি এখন কোথায়?'

'আমি এখন আমার ভাই-ভাবীর এয়ারপোর্ট রোডের ফ্ল্যাট

থেকে বেরুচ্ছি।'

'গুড। মিস্টার পাওচেন, আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে আপনি সত্যি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন। বলুন তো, গত বিশ মিনিটের মধ্যে আপনার ভাই-ভাবীর ফ্ল্যাটে গুরুত্বপূর্ণ কী ঘটেছে?'

চৌচেন ঝাওয়ের ভাই, অর্থাৎ দালিয়ার একমাত্র দেওর পাওচেন ঝাও জবাব দিল, 'রায়হান চৌধুরী নামে এক ভদ্রলোক ফোন করেছিলেন ভাইকে।'

'চমৎকার! এবার বলুন, ওই ভদ্রলোকের আসল নাম কি?'

'মাসুদ রানা। ভাইয়ের ধারণা, একমাত্র এই ভদ্রলোকই নাকি আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন।'

'কিন্তু বাইরের কারও সাহায্য না নিয়ে, সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আপনিই নিজেদের জন্যে যা করার করবেন, তাই তো?'

'হ্যাঁ। কারণ, তা না হলে, আপনি আমাদের দুই ভাইকে মেরে ফেলবেন–ঠিক যেভাবে আমার ভাবীর ভাইকে মেরে ফেলেছেন।'

'বিষয়টাকে এভাবেও দেখা যায়–ছোট্ট একটা তথ্যের বিনিময়ে আপনাদের দু'জনের প্রাণ তো রক্ষা পাবেই, ফাও হিসেবে এক লাখ মার্কিন ডলার পুরস্কারও জুটবে কপালে। আপনার ভাইয়ের শ্যালক আমাদের প্রস্তাবে রাজি হয়নি।'

'আমি রাজি হয়েছি ঠিকই,' বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল পাওচেন ঝাও। 'তবে সারাজীবন একটা অপরাধ বোধ বয়ে বেড়াতে হবে, এই আর কী!'

'এ নিয়ে আগেও আলাপ করেছি আমরা। আপনার মধ্যে কী কারণে অপরাধ বোধ আসবে, এটা আমি এখনও বুঝতে অক্ষম। আপনার ভাবী মার্কিনিদের একটা জিনিস চুরি করে একা শুধু

নিজের নয়, আপনার ভাই আর আপনাকেও মারাত্মক বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। শুধু চুরি করলে কথা ছিল, জিনিসটা সে বেচতেও রাজি নয়। এটা কি মিথ্যে?'

'না, মিথ্যে কেন হবে...'

'মারাত্মক বিপদ মানে, আমরা আপনাকে হুমকি দিয়েছি, যেভাবেই হোক ভাবীর কাছ থেকে আদায় করে ফাইলটা আমাদের হাতে তুলে দেবেন আপনি, সেই সঙ্গে ভাবীর হদিশও জানাবেন, তা না হলে আপনারা দু'ভাই আমাদের হাতে খুন হয়ে যাবেন। আপনি আমাদের হুমকিটাকে গুরুত্ব দিয়ে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। অর্থাৎ প্রাণে বাঁচার বিনিময়ে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছেন। ঠিক তো?'

'এ-সব তো ঠিকই আছে...'

'তা হলে এরমধ্যে অপরাধ কোথায়?'

'না, মানে...ভাবীকে...মানে...'

'আপনি কি তার মৃত্যু চাইছেন না?' কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করল বিগ ব্রাদার হুন চেননি। 'যুক্তিটা তা হলে আরেকটু ব্যাখ্যা করতে হয়, মিস্টার পাওচেন ঝাও।'

অপরপ্রান্তে চুপ করে আছে পাওচেন।

'আপনার ভাবী দালিয়ানকে বাঁচিয়ে রাখলে এক সময় সে ঠিকই বুঝতে পারবে যে আপনি তার সঙ্গে বেঈমানী করে ফাইলটা আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। দালিয়ান তখন পুলিশের কাছেও যেতে পারে। কি, পারে না?'

'দৃঢ়চেতা, নীতিবান মানুষ...হ্যাঁ, তা তো পারেনই।'

'পুলিশ আপনাকে তুলে দেবে সিক্রেট এজেন্টদের হাতে। টরচার সহ্য করতে না পেরে আপনি তাদেরকে আমার নাম

বলবেন। বুঝতে পারছেন, কি বলছি আমি? কিন্তু এটা তো আমরা হতে দিতে পারি না, মিস্টার পাওচেন।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে, বুঝতে পারছি।'

'ধন্যবাদ, বুঝতে পারলেই ভালো। তো যাই হোক, আপনি একশোয় একশোই পাচ্ছেন, মিস্টার পাওচেন। এবার বলুন,' নরম সুরে প্রশ্ন করল হুন চেননি, 'ফোনটা পাবার পর মিস্টার চৌচেন আপনার সঙ্গে কী আলাপ করলেন?'

'ভাই বলল, তোর ভাবীকে জানানো দরকার মাসুদ ভাই ফোন করেছিলেন। ভাইয়ের পক্ষে বাইরে বেরুনো সম্ভব নয়, পিছনে লোক লেগে যায়। তাই আমাকে ভাবীর কাছে যেতে বলল। সেখানেই এখন যাচ্ছি আমি।'

'ওয়ান্ডারফুল! ওয়ান্ডারফুল!' হুন চেননির উল্লাস দেখে কে। 'মিস্টার পাওচেন, কালই আপনার অ্যাকাউন্টে এক লাখ ডলার জমা হয়ে যাবে–প্রমিজ! এবার বলুন, জায়গাটা কোথায়? ফাইলটা ওখানেই আছে তো, মানে, আপনার ভাবীর কাছে?'

'হ্যাঁ, আমি তো তাই জানি। তবে ওই ঠিকানায় নয়, ভাবী মিস্টার রানার সঙ্গে দেখা করবেন অন্য জায়গায়। সাবধানের মার নেই, তাই ভাই চাইছেন শহরের বাইরে দূরে কোথাও দেখা হওয়া উচিত। দুটো ঠিকানাই লিখে নিন...'

'হ্যাঁ, এক মিনিট। তার আগে একটা কথা। ভাবীর সঙ্গে কী কথা হলো, ফাইলটা ঠিক কোথায় আছে, এ-সব ভালো করে জেনে নিয়ে আমাদেরকে ফোন করবেন আপনি, ঠিক আছে?'

'বেশ।' একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল পাওচেন ঝাও।

রাত তিনটের সময় গ্রেটওয়াল হোটেলের স্যুইটে পিপ-পিপ শুরু

করল রানার মোবাইল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল ওর। নিশ্চয়ই জরুরি কোন কল, চোখ না খুলেই বেডসাইড টেবিলটার দিকে হাত বাড়িয়ে ভাবল, ভাগ্যিস সেটটা অন করে শুয়েছিল।

মোবাইল সেটের ডিসপ্লেতে চোখ বুলাতেই ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠল রানার। ভেবেছিল ওর এজেন্সির শাখা অফিস থেকে বুন লি ফোন করেছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে তা নয়—নম্বরটা অচেনা।

'হ্যালো?'

'বস্, আমি চৌ মিন। এত রাতে ঘুম ভাঙানোর জন্যে সত্যি দুঃখিত, বস্।'

'কেন ফোন করেছ সেটা বলো।'

'কথাটা আমাকে বলতে বলা হয়েছে, বস্, তাই বলছি।'

'কী কথা?' রানা সাবধানে জানতে চাইল। 'কে বলতে বলেছে?'

'তার পরিচয়টা না হয় নাই জানলেন, বস্...'

'কী কথা?' আবার জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওদের সঙ্গে আপনি জড়াবেন না, বস্।'

'ওদের সঙ্গে জড়াব না...ওদের সঙ্গে মানে কাদের সঙ্গে? তা ছাড়া, কারও নিষেধ আমি শুনবই বা কেন?'

'মাফ করবেন, বস্। আমাকে শুধু এটুকুই বলতে বলা হয়েছে। আর ব্যক্তিগতভাবে আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন, আমি চাই না আপনার মত সম্ভাব্য একজন ক্রেতাকে হারাই।'

কঠিন সুরে কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, ওকে থামিয়ে দিয়ে আবার বলল চৌ মিন, 'আজ থেকে বিশদিন পর আপনার সঙ্গে আমার হংকঙে দেখা হতে পারে, মানে তখনও যদি ফাইলটার ব্যাপারে আপনার আগ্রহ থাকে আর কী। কী নামে দেখা করবেন

এখনই আমাকে জানিয়ে দিন। তারপর হংকঙের কোথায় বলছি…'

রানা কী নামে দেখা করবে শোনার পর তিন মিনিট একনাগাড়ে কথা বলে গেল চৌ মিন, তারপর রানাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে যোগাযোগ কেটে দিল।

চৌ মিনকে দিয়ে কে কথাটা বলাল সেটা না বোঝার কিছু নেই। বিশেষ করে রানা যখন জানেই যে মিন ভাইরা বিগ ব্রাদার হুন চেননির অতিথি হিসাবে বেইজিঙে এসেছে। হেঁয়ালির মাধ্যমে ঠিক কী বলতে চাওয়া হয়েছে তাও পরিষ্কার।

বাথরুম থেকে চোখে-মুখে পানি ছিটিয়ে এসে দুয়ে দুয়ে চার মেলাবার চেষ্টা করছে রানা।

ধরে নিতে হয় হুন চেননির দলই দালিয়ানদের টেলিফোনে আড়ি পেতেছে। কাজেই তারা ওর আর চৌচেন ঝাওয়ের কথাবার্তা শুনেছে। 'সরি, রঙ নাম্বার' বললেও চৌচেন যে রায়হানকে চিনতে পেরেছে, এটা হুন চেননির কাছে গোপন নেই।

আর রায়হানের কণ্ঠস্বর শুনে থাকলে চৌ মিন বলে দিতে পারবে ওটা মাসুদ রানার। ও যখন চৌচেন ঝাওকে ফোন করেছিল, আড়িপাতা যন্ত্রের অপরপ্রান্তে হুন চেননির সঙ্গে হয়তো চৌ মিনও ছিল।

হুন চেননি এরপর স্বভাবতই ধরে নেবে চৌচেন বা দালিয়া গোপনে যোগাযোগ করবে ওর সঙ্গে। অর্থাৎ ওদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে ও।

হুন চেননি তা চাইছে না।

অকস্মাৎ রানার মনে আশঙ্কা জাগল, দালিয়া আর তার স্বামীর বোধহয় খুব বড় কোন বিপদ হতে যাচ্ছে।

কার্পেট মোড়া বেডরুমে পায়চারি শুরু করল রানা, মোবাইল

সেট অন করে দালিয়াদের নাম্বার টিপছে।

উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তায় শীত শীত করছে রানার। অপরপ্রান্তে রিঙ হচ্ছে, কিন্তু কেউ ধরছে না।

আট-দশবার চেষ্টা করেও যখন সাড়া পেল না, সিদ্ধান্ত নিল দালিয়াদের ফ্ল্যাটে যাবে।

কাপড়চোপড় পরে তৈরি হচ্ছে রানা, আরেকটা ফোন এল। ডিসপ্লেতে চোখ বুলাতে বোঝা গেল বুন লির কল। প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে উঠল রানা। 'বলো।'

'মাসুদ ভাই,' বুনের গলায় চাপা উত্তেজনা, 'তিন মিনিট হলো একটা মেয়ে পাবলিক বুদ থেকে ফোন করে আপনাকে একটা মেসেজ দিয়েছে। ফোন নম্বরটা রাজধানীর বাইরের। মেয়েটি নাম বলল, জি.ডি...'

স্বস্তির ঠাণ্ডা পরশ অনুভব করল রানা। জি.ডি নিশ্চয়ই জিজিয়ানা দালিয়ান-এর সংক্ষেপ। 'মেসেজটা দাও,' বুনকে নির্দেশ দিল ও।

'বলছি, মাসুদ ভাই–"ভয়ানক বিপদের মধ্যে আমরা। এই সময় নিশ্চয় ঈশ্বর আপনাকে বেইজিঙে পাঠিয়েছেন। যদি পারেন দেখা করুন এই ঠিকানায়"। ব্যস, এটুকুই।'

'ঠিকানাটা দাও,' বলল রানা।

'লিখতে হবে, মাসুদ ভাই–পথের হদিশ ছাড়াও কিছু পরামর্শ দেয়া হয়েছে।' কয়েক সেকেন্ড পর মেসেজটা শুরু করল বুন। 'সকাল আটটায় সতেরো নম্বর গেট দিয়ে নেমে আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেন ধরবেন। প্রথমে চাংপিং-এর টিকিট কাটবেন, রাজপুর আর কিংঘে হয়ে চাংপিং যাবে ওটা। ওখানে পৌঁছে ট্রেন বদলে রওনা হবেন পশ্চিমে, নানকু হয়ে পৌঁছাবেন তাইপিনবু-র শহরতলিতে...'

চার

সকাল ন'টার মধ্যে রাজধানী বেইজিং থেকে একশো মাইল দূরে চলে এসেছে রানা। জায়গাটার নাম তাইপিনবু।

তাইপিনবু পাহাড়ী এলাকা, এখান থেকে যেন কয়লা খনির মিছিল শুরু হয়েছে।

দুই পাহাড়ের মাঝখানে ঝুলছে ছয় সারি কেবল্ কার। সবগুলোই সচল; তিনটেতে চড়ে ডিউটি সেরে ঘরে ফিরছে ক্লান্ত একদল খনি শ্রমিক, তাদেরই আরেকটা দলকে অপর তিনটে কার ডিউটি দিতে নিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি কারে বিশ-বাইশজন করে বসে আছে ওরা।

শ্রমিকদের সবার পরনে একই পরিচ্ছদ। কালো সুতি কাপড়ের প্যান্ট আর একই রঙের পাতলা কাপড়ের হাফ-হাতা ফতুয়া। প্রত্যেকের মাথায় ধাতব হেলমেট, পায়ে টায়ার-সোল জুতো।

কালিঝুলি মাখা ওরকম এক সেট কাপড়চোপড় পরে একদল শ্রমিকের মাঝখানে বসে আছে রানা, সবার মত ওর সঙ্গেও কাপড়ের একটা ব্যাগ দেখা যাচ্ছে। দালিয়ানের পরামর্শ মেনে নিয়ে এ-সব নানকু শহরের একটা দোকান থেকে কিনেছে ও।

দোকানটায় শুধু সেকেন্ড হ্যান্ড জিনিসই বিক্রি হয়।

চিনাদের সবারই যে নাক চ্যাপ্টা, এ ধারণা একদম ভুল। রানার পাশেই এক তরুণকে দেখা গেল, তার নাক টিয়া পাখির ঠোঁটের সঙ্গে বদলে নেওয়া যাবে। খনিতে কাজ করানোর জন্য বিভিন্ন প্রদেশ থেকে লোক আনা হয়, কাজেই তাদের চেহারা অনেক সময় একদমই মেলে না।

রানার চেহারাও মিলল না। তারা ওকে অন্য কোন প্রদেশের নতুন শ্রমিক বলে ধরে নিল। তাদের দু'একজনকে দালিয়ার একটা ফটো দেখাল রানা, জানতে চাইল একে তারা কোথাও দেখেছে কিনা। মাথা নাড়ল সবাই।

অল্প হলেও, কিছু নারী শ্রমিকও কাজ করে খনিগুলোয়; কেউ নার্স, খনির বাইরে হসপিটাল তাঁবুতে ডিউটি দেয়; আবার কেউ রাঁধুনি বা ঝাড়ুদারনী।

হোটেল গ্রেটওয়াল ছেড়ে প্রথমবার রানা রাস্তায় নেমেছে রাত চারটের কিছু পরে। ট্যাক্সি নিয়ে প্রথমেই এয়ারপোর্ট রোডে, দালিয়াদের ফ্ল্যাটে চলে আসে।

নক করতে হলো না, দরজার কবাট সামান্য ফাঁক দেখে নিঃশব্দ পায়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল রানা, কোমরে গোঁজা পিস্তলটা বেরিয়ে এল হাতে। লিভিং রুমের মাঝখানে, কার্পেটের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে ইংরেজি ভাষার লেকচারার চৌচেন ঝাও, দালিয়ার স্বামী।

জানত পাবে না, তারপরও পালস্ দেখল রানা। দুটো গুলি করা হয়েছে চৌচেনকে, দুটোই বুকে। সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে সে।

ফ্ল্যাটটা সার্চ করে কোন ক্লু পেল না, কাজেই রানা বলতে পারবে না কে বা কারা দায়ী। ফোন লাইন ঠিক আছে দেখে

পুলিশকে খবরটা জানিয়ে বেরিয়ে এল ফ্ল্যাট থেকে। তার আগে দেরাজ হাতড়ে পাওয়া দালিয়ার একটা পাসপোর্ট সাইজ ফটো শার্টের বুক পকেটে ভরে নিয়েছে।

ওখান থেকে আবার নিজের হোটেলে ফিরে গিয়েছিল রানা। দ্বিতীয়বার সকাল ঠিক ছ'টায় রাস্তায় বেরুবার আগে চেহারা আরেকবার একটু পাল্টে নিয়েছে। দালিয়ানের ঠিক করে দেওয়া সময়ের চেয়ে দু'ঘণ্টা আগে রওনা হয়েছে ও।

তিনবার কেবল্ কার বদলাতে হচ্ছে রানাকে। দোআনচি নামে একটা পরিত্যক্ত খনিতে যাবে ও। চিনা ভাষাটা ভালোই জানা আছে, কেবল্ কার স্টেশনের শেষ মাথায় পৌঁছে অপারেটরকে জিজ্ঞেস করতে হবে কোন্ দিকে সেটা।

দালিয়ার ফটোটা কেবল্ কার অপারেটরদেরও দেখাচ্ছে রানা, ওদের ভাষায় জানতে চাইছে ছবির এই মেয়েটিকে তারা আগে কখনও দেখেছে কিনা। ইতিমধ্যে দু'জন অপারেটর মাথা নেড়ে দেখেনি বলে জানিয়ে দিয়েছে।

তিন নম্বর কেবল্ কারের শেষ মাথায়, অর্থাৎ সর্বশেষ স্টেশনে পৌঁছাল রানা। গোটা এলাকা খাঁ-খাঁ করছে, না আছে বাড়ি-ঘর, না আছে রাস্তা-ঘাট। আরোহী বলতেও ও একা।

প্ল্যাটফর্মে নেমে অপারেটরের সামনে দাঁড়াল রানা। এই একজন ছাড়া চারদিকে আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। 'লাল সালাম, কমরেড। আপনার নাম ফুচু ওয়াঙ। বিয়ে করেছেন সাতটা। নাতির সংখ্যা একশো দুই। ঠিক?'

দাঁতবিহীন মাড়ি বের করে হেসে দিল বুড়ো। তার হাতে একটা বই দেখা যাচ্ছে, মলাটে লেখা—মহান দার্শনিক কনফুসিয়াস-এর বাণী। 'বুঝেছি, কোন কারণে আমার সহযোগিতা

দরকার আপনার। এটা এদিককার পুরানো কৌশল। আপনি নতুন মানুষ হলে কী হবে, খোঁজ-খবর রাখেন। আমার নাম শিশু, শিশু চো। বলুন, আপনার কী উপকারে লাগতে পারি আমি?'

অপারেটরের সামনে দালিয়ার ছবিটা ধরল রানা।

সেটায় একবার চোখ বুলিয়েই মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল বুড়ো শিশু, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল চার-পাঁচশো গজ দূরের একটা লেকের দিকে। হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার চেহারা। বলল, 'মাফ করবেন, কমরেড, আমি এ-সব বিপদের মধ্যে জড়াতে চাই না।'

'একটা মেয়ে কদিন হলো নিখোঁজ, লোকমুখে শুনলাম এদিকে নাকি দেখা গেছে তাকে, তাই খুঁজতে বেরিয়েছি। এর মধ্যে বিপদ দেখলেন কোথায়?'

'এই মাত্র আমি বোবা আর কালা হয়ে গেছি, কমরেড।' যাত্রী নেই, কন্ট্রোল প্যানেলের বোতাম টিপে খালি কেবল্ কারটাকে ফেরত পাঠাচ্ছে সে।

প্লাটফর্মের পিছনদিকটায় বিশ ফুট লম্বা একটা ব্যারেল দেখা যাচ্ছে, ঘ্যারঘ্যার আওয়াজ তুলে ঘুরছে সেটা, তাতে পেঁচানো ইস্পাতের কেবল্ খুলে যাচ্ছে দ্রুত।

পকেট থেকে ওর এজেন্সির একটা কার্ড বের করে দেখাল রানা। 'আমি আসলে একজন প্রাইভেট পুলিশ অফিসার,' বলল ও। 'সরকার আমাকে ক্রাইম ইনভেস্টিগেট করার অনুমতি দিয়েছে।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে হাত তুলে দূরের লেকটা দেখাল বুড়ো। তারপর রানার মুখের সামনে তিনটে আঙুল খাড়া করল। 'আগের ট্রিপে তিনজন লোক নেমেছে এখানে। ওই লেকটার

মাইল দুয়েক পুবে একটা পরিত্যক্ত খনি আছে, নাম দোআনচি, ওটার খোঁজ করছিল।'

মুখের ভিতরটা শুকনো লাগছে রানার। 'ঠিক বুঝলাম না,' বলল ও। 'তাদের সঙ্গে এই ফটোর কী সম্পর্ক?'

কঠিন চোখে রানার দিকে এক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল অপারেটর। 'ওদের কাছেও এরকম একটা ফটো আছে।'

সর্বনাশ! রানার হাতের তালু ঘামছে। ওর আগেই পৌঁছে গেছে কসাইরা। 'আমার মত আরও অনেকেই হয়তো খুঁজছে মেয়েটিকে,' বলল ও। 'সেটাকে আপনি বিপদ বলছেন কেন?'

'ওদেরকে চিনি তো, তাই জানি এরচেয়ে মারাত্মক বিপদ আর হতে পারে না।'

'ওদেরকে আপনি চেনেন?' রানার তথ্য দরকার।

'একটু ভালো করেই চিনি।' বুড়ো-শিশু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'কী রকম?'

'বিগ ব্রাদাররা খুব কৌশলী, সাধারণত গরিব মানুষের ওপর দয়া-রহম দেখায়, তাদেরকে সব সময় সাহায্য করে–তারা যাতে পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা না করে। কিন্তু বিগ ব্রাদার হুন চেননি গরিব মেরে দুর্নাম কামিয়েছে। তার অত্যাচারের প্রতিবাদ করায় আমার একমাত্র ভাইপোকে নিজের হাতে খুন করে সে।'

'আপনি বলতে চাইছেন,' স্পষ্ট করে জানতে চাইল রানা, 'ওই তিনজনের মধ্যে চেননি নিজেও আছে?'

'নিজের চোখকে অবিশ্বাস করি কীভাবে, বলুন?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। 'এই মেয়েটিকে আপনি...'

মাথা নাড়ল বুড়ো কেবল্ কার অপারেটর। 'তাকে আমি চিনি

না, কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।'

'আপনি আমার অনেক উপকার করলেন। ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'তবে যদি আরেকটু উপকার করতেন, হুন চেননির হাত থেকে নিরীহ একটা মেয়েকে বাঁচাতে চেষ্টা করতাম আমি।'

'আপনাকে তো আগেই বলেছি, আমি কোন বিপদে জড়াতে চাই না?'

'কিন্তু যদি বদলা নেয়ার সুযোগ পান?'

'কীসের বদলা?' বুড়োর চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠতে চাইছে।

'ভাইপো খুন হওয়ার?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল অপারেটর চো। 'আগে শুনি কী করতে হবে, তারপর সিদ্ধান্ত নেব।'

'আপনাকে তেমন কিছু করতে হবে না, যা করার আমিই করব,' বলল রানা। 'একটা কথা জিজ্ঞেস করি। আপনার কারে চড়ে এখানে এসেছে লোকগুলো, কারণ আপনার স্টেশন থেকে পরিত্যক্ত খনি দোআনচি সবচেয়ে কাছে, কাজেই ফিরবেও তারা আপনার কারে চড়ে, ঠিক?'

মাথা ঘুরিয়ে বাকি দুটো স্টেশনের দিকে তাকাল অপারেটর। পরস্পরের কাছ থেকে বেশ অনেক দূরে ওগুলো।

দেখাদেখি রানাও তাকাল। এদিকটায় লোকজনের আসা-যাওয়া খুবই কম। প্রায় প্রতিটি কেবল্ কার খালি আসছে, ফিরছেও খালি। এর কারণ, এদিকের খনিগুলো কয়লাশূন্য হয়ে গেছে, তাই পরিত্যক্ত।

গোপনে দেখা করার জন্য ভালো জায়গাই বেছেছে দালিয়া, কিন্তু কেউ একজন বেঈমানী করেছে তার সঙ্গে। সন্দেহ নেই খুব ঘনিষ্ঠ কেউই হবে সে, যাকে সন্দেহ করার প্রশ্নই ওঠে না।

‘হ্যাঁ, আমার কারে চড়েই ফিরবে হুন চেননি,’ রানার চিন্তায় বাধা দিল বুড়ো শিশু।

তার দিকে ফিরল রানা। ‘এবার বলছি কী করতে হবে আপনাকে। ধরুন, ঘণ্টা দুয়েক পর স্টেশনে ফিরে আসবে লোকগুলো। ওদেরকে আসতে দেখলে স্টেশন ছেড়ে আরেক দিক দিয়ে কেটে পড়বেন আপনি।’

‘ব্যস? আর কিছু করতে হবে না?’

‘হবে। আমার সঙ্গে কাপড় বদলাবেন। তারপর আমাকে একটু দেখিয়ে দেবেন কেবল্ কার কীভাবে অপারেট করতে হয়।’

‘কাছেই আমার বাড়ি, সেখানে অতিরিক্ত এক সেট ইউনিফর্ম আছে,’ বলল বুড়ো।

‘বাড়িতে কে কে আছে?’

‘কে থাকবে, কমরেড, আমি একা মানুষ।’ হঠাৎ চিন্তিত দেখাল অপারেটরকে। ‘বোঝা যাচ্ছে, আপনি ওদের একটা ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু তারপর? আমার কী হবে? বদলা নেয়ার জন্যে হুন চেননির লোকেরা এসে আপনাকে পাবে না, পাবে আমাকে।’

‘তারা এসে দেখবে ব্যারেলের পিছনে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে আপনাকে, মুখে কাপড় গোঁজা,’ বলল রানা। ‘তা ছাড়া, দু’জন শিষ্যসহ হুন চেননি দুর্ঘটনায় মারা গেলে এলাকার কমিউনিস্ট নেতা আর পুলিশ খুশিই হবে, প্রয়োজনে তারাই প্রোটেকশন দেবে আপনাকে।’

‘বলছেন হাত-পা বাঁধা থাকবে আমার? নাকটা ভাঙা? কাপড়ে শুকনো রক্ত?’

মাথা নাড়ল রানা। ‘এই বয়সে নাক ভাঙা ঠিক হবে না। তবে নাকে-মুখে মুরগীর রক্ত মাখা যেতে পারে।’

'ঝুঁকিটা মারাত্মক, তবে নিচ্ছি,' সিদ্ধান্ত নিল অপারেটর। 'যেন মনে হচ্ছে ঈশ্বরই আপনাকে পাঠিয়েছেন। আসুন, মেকানিজমটা দেখিয়ে দিই।'

রানা যেমন ধারণা করেছিল, আরও প্রায় এক ঘণ্টা পর বুড়ো শিশুর কেবল্ কারে চড়েই আসতে দেখা গেল জিজিয়ানা দালিয়ানকে। নার্স-এর ইউনিফর্ম পরে আছে সে, হাতে ঝুলছে ফার্স্ট-এইডের একটা ব্যাগ।

প্ল্যাটফর্মে, অপারেটরের পাশে, একজন খনি শ্রমিককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তীক্ষ্ণ হলো দালিয়ার দৃষ্টি। হালকা ছদ্মবেশ নিয়ে আছে রানা, তা সত্ত্বেও চিনে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে যেন নার্ভাস হয়ে পড়ল সে।

কেবল্ কার দাঁড় করাল বুড়ো শিশু।

প্ল্যাটফর্মে পা দিয়েই ইংরেজিতে জানতে চাইল দালিয়া, 'মাসুদ ভাই, আপনার তো এখানে থাকার কথা নয়...'

'জানি,' তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল রানা। 'কিন্তু আমার যখন দোআনচিতে পৌঁছানোর কথা, তার দু'আড়াই ঘণ্টা আগেই ওখানে পৌঁছে গেছে দুই সঙ্গীকে নিয়ে এক বিগ ব্রাদার।' খপ করে তার একটা হাত ধরে টান দিল ও। 'এসো, এখানে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়।' লোহার প্যাঁচানো সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল ওরা।

'বিগ ব্রাদার...কে?' ঢোক গিলে জানতে চাইল দালিয়া।

'হুন চেননি।'

'ঈশ্বর!' শিউরে উঠল দালিয়া। ধাপের উপর দাঁড়িয়ে পড়ল সে, টলছে। খালি হাত দিয়ে রানার কাঁধ খামচে ধরে তাল

সামলাল। ‘ওই লোকটাই আমার ভাইকে মেরে ফেলেছে!’ তারপর তার খেয়াল হলো। ‘মাসুদ ভাই, হুন চেননি জানল কীভাবে আপনার সঙ্গে দোআনচিতে দেখা করব আমি?’

রানা ভাবল, দালিয়া বোধহয় এখনও জানে না যে তার স্বামীও বেঁচে নেই। ‘শান্ত হও, দালিয়া। আগে চলো ফাঁকা জায়গা থেকে সরে যাই।’

‘এটা শুধু আমরা তিনজন জানি, মাসুদ ভাই! আমি, আপনি আর আমার দেওর পাওচেন।’

‘এ নিয়ে পরে কথা বললে হয় না, দালিয়া?’

লেকের উল্টোদিকে এক-দেড়শো গজ হাঁটল ওরা, তারপর একটা পাথুরে টিলাকে পাশ কাটাল। সামনে পড়ল টিনের একচালা, নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে। বুড়ো শিশুর ঠাঁই।

পকেট থেকে চাবি বের করে এক হাত দিয়েই তালা খুলল রানা। ছোট একটা ঘরে ঢুকল, এখনও দালিয়ার হাত ছাড়েনি।

‘এখানে শান্ত হয়ে বসো।’ ঘরটার ভিতর একটাই কাঠের চেয়ার, সেটায় দালিয়াকে বসিয়ে দিয়ে জানালা খুলে বাড়ির সামনের দিকটায় চোখ বুলাল রানা। ‘এদিকে কাউকে আসতে দেখলে পিছনের ঘরে চলে যাবে তুমি, কেমন? মানে, কেউ যেন তোমাকে দেখতে না পায়। খুব বেশি দেরি হবে না আমার, এই ঘণ্টাখানেক। সদর দরজায় তালা দিয়ে যাচ্ছি...’

হঠাৎ কিছু মনে পড়তে থেমে গেল রানা, তারপর দালিয়ার সামনে একটা হাত পাতল। ‘যে জিনিস নিয়ে এত কিছু, সেটা দেখি তো একবার।’

অপ্রতিভ দেখাল দালিয়াকে। ‘ওটা তো আমি আনিনি, মাসুদ ভাই! আমার দেওর পাওচেনের কাছে রেখে এসেছি।’

হাতটা ফিরিয়ে নিল রানা। 'পাওচেন এখন কোথায়, দালিয়া?' ওর চেহারা থমথম করছে।

'তার শ্বশুরবাড়ি, নানকুতে।'

'সেখানে আর কে আছে?'

'বউ সহ বাড়ির সবাইকে সরিয়ে দিয়েছে, বাড়িতে সে একা...'

'হুঁ।' রানাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। 'ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি...'

'মাসুদ ভাই, ওদের সঙ্গে না লেগে কি সমস্যার সমাধান করা যায় না?'

মাথা নাড়ল রানা। তারপর দালিয়ার কাঁধে একটা হাত রাখল। 'উত্তর দিচ্ছি, দালিয়া, তার আগে নিজেকে শক্ত করো তুমি,' ভারী গলায় বলল ও। 'তুমি তোমার স্বামীকে হারিয়েছ। আমার ধারণা দেওরকেও। এখন যদি চেননির একটা ব্যবস্থা করা না যায়, এরপর আমরা তোমাকেও হারাব।'

রানাকে দু'হাতে খামচে ধরে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল দালিয়া। 'চৌচেনকে...চৌচেনকে ওরা মেরে ফেলেছে? হায় ঈশ্বর, সেজন্যেই ফোনে পাইনি ওকে...' রানার বুকে মাথা রেখে হু-হু করে কেঁদে উঠল মেয়েটা।

দু'মিনিট পর টিনের একচালায় তালা দিয়ে কেবল্ কার স্টেশনে ফিরে এল রানা। ওর পরনে এখন কেবল অপারেটরের ইউনিফর্ম।

পাঁচ

প্রায় চল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করার পর সঙ্গীদের নিয়ে হুন চেননিকে বাঁক ঘুরে লেকের পাড়ে পৌঁছাতে দেখল রানা। ইতিমধ্যে বুড়ো শিশুকে স্টেশনের ছাদে তুলে দিয়েছে ও, সেখানে তার কাজ কোন শব্দ না করে শুয়ে থাকা।

কাছাকাছি আসতে দেখা গেল প্রচণ্ড রেগে আছে চেননি। রক্ত ভরা স্বচ্ছ বেলুনের মত লাগছে তার লাল মুখটাকে। লোহার সিঁড়ি বেয়ে প্লাটফর্মে ওঠার সময় তার নিঃশ্বাস ফেলার ফোঁস-ফোঁস আওয়াজ শুনতে পেল রানা। তিনজনের কেউই কথা বলছে না।

প্লাটফর্মে উঠেই ছদ্মবেশী রানার দিকে কটমট করে তাকাল চেননি। 'এই, ছোকরা! এদিকে আয়। তোর বুড়ো বাপ কোথায় গেল, ঘণ্টা তিনেক আগে যে ডিউটি দিচ্ছিল?'

কনফুসিয়াসের বইটা বন্ধ করে টুল ছেড়ে দাঁড়াল রানা, দু'পা এগিয়ে এসে মান্ডারিন ভাষায় বলল, 'তার শেষ, আমার শুরু।'

'তুই এখানে কখন থেকে ডিউটি দিচ্ছিস?'

'তা ঘণ্টা দুয়েক তো হবেই।'

'কেবল কার থেকে এই মেয়েটাকে নামতে দেখেছিস?'

দালিয়ার ফটোটা রানার সামনে ধরল চেননি।

মাথা নাড়ল রানা। 'কোন প্যাসেঞ্জারই তো নেই, খালি কার আসা-যাওয়া করছে।'

সঙ্গীদের দিকে ফিরল চেননি। 'এখন তা হলে আমি কী বুঝব?' রাগে হিসহিস করে উঠল সে। 'পাওচেন বলেছিল মেয়েটার কাছে মাইক্রোফিল্ম থাকবে, সেটা নিয়ে দোআনচিতে আসবে সে মাসুদ রানার সঙ্গে দেখা করতে, ঠিক?'

'জী, ঠিক!' ঘন ঘন মাথা নোয়াল তার সঙ্গীরা।

'মাসুদ রানাকে একটা নির্দিষ্ট সময়ে, একটা নির্দিষ্ট জায়গায় পাওয়া যাবে–এই তথ্যই তো বিরাট দামী একটা পণ্য। সেই পণ্য মোটা টাকায় বেচলাম, তাকে খতম করার চুক্তি করেও ভালো কামালাম। কিন্তু মেয়েটা তো এলই না, তার সঙ্গে দেখা করতে রানাও আসেনি। কেন?'

'পাওচেন আমাদেরকে ভুল তথ্য দিয়েছে, হুজুর,' সঙ্গীদের একজন বলল। 'তার মতলব মনে হয় ভালো ছিল না।'

হাত দুটো মুঠো পাকাল হুন চেননি। 'পাওচেনের শ্বশুরবাড়ি থেকে আমাদের লোককে বলছে, মেয়েটা ওখানে নেই, নেই মাইক্রোফিল্মটাও। এর মানে কী?'

'মেয়েটা তার দেওরকে বোকা বানিয়েছে, হুজুর,' সঙ্গীদের অপরজন বলল। 'এখানকার কথা বলে মাসুদ রানার সঙ্গে অন্য কোথাও দেখা করেছে সে।'

'পাওচেনকে মারতে গেল আমাদের লোক, দেখা গেল আগেই গুলি খেয়ে মরে ভূত হয়ে আছে সে। কার এত দয়া যে আমাদের কাজটা করে দিল?'

জবাব দেওয়ার আগে প্রতিবারই মাথা নুইয়ে সম্মান জানাচ্ছে

সঙ্গীরা। তারা মুখ খুলছে পালা করে। 'আমাদের কাজ করে দেয়নি, নিজের স্বার্থ হাসিল করেছে। আমাদের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী, হুজুর।'

আরেকজন বলল, 'একটু খোঁজ নিতে হবে ওই সময়টায় মিন ভাইরা কে কোথায় ছিল।'

ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল হুন চেননি। 'এই, ব্যাটা উজবুক। আমরা যতক্ষণ এখানে আছি, তুই কালা, ঠিক আছে?'

'জী, আপনি যা বলেন।' ঘন ঘন মাথা নোয়াল রানা। মাতৃভাষায় বিড়বিড় করল, 'কতক্ষণই বা আছিস!'

'কী বললি?' হঠাৎ বাঘের মত গর্জে উঠল চেননি। 'বিড়বিড় করে কী বলিস, অ্যাঁ?'

ভয় পাবার ভান করে দ্রুত মাথা নাড়ল রানা। 'না, তেমন কিছু না। বলছিলাম, কেবল্ কার আসছে।'

'কতক্ষণ হলো গেছে?' সুর একটু নরম করে জানতে চাইল চেননি।

'আধ ঘণ্টার ওপর।'

'তা হলে আর বেশি দেরি নেই।' সঙ্গীদের দিকে ফিরল চেননি, আগের প্রসঙ্গের রেশ টেনে বলল, 'ঘাঁটিতে একটা ফোন করে জিজ্ঞেস করলেই তো পারো কোথায় আছে ওরা দু'ভাই।'

এতক্ষণে কেবল কারটাকে আসতে দেখছে রানা। পাঁচ-সাতশো গজ পরপর একটা করে টাওয়ার আছে, ঝুলন্ত কেবলকে টান-টান করে রাখাই ওগুলোর আসল কাজ। এই মুহূর্তে পাঁচশো গজ দূরের সর্বশেষ টাওয়ারটা পার হচ্ছে কেবল্ কার।

সোনালি রঙের একটা মোবাইল বেরিয়ে এল চেননির এক এক শিষ্যর হাতে। বোতাম টিপে সেটটা কানে তুলল সে।

কন্ট্রোল প্যানেলের পিছনে এসে দাঁড়াল রানা। ভালো করে দেখে নিয়ে একটা বোতাম টিপল। কার-এর গতি ধীরে ধীরে কমে আসছে। বরাবরের মত খালি দেখা যাচ্ছে ওটাকে।

চারদিকে কোথাও কোন মানুষজন নেই। দূরের বাকি দুটো স্টেশন এই মুহূর্তে খালি। সময়টা আদর্শ। পরিস্থিতি অনুকূল।

'দোআনচি থেকে মুলাই বলছি,' মোবাইল ফোনে কথা বলছে লোকটা। 'মিস্টার চৌ মিনকে দে, কথা আছে...কী বললি?...দু' ভাই সেই ভোর বেলা বেরিয়ে গেছে, তারপর আর ফেরেনি? শোন, হুজুরের সঙ্গে কথা বল...' হাতের ফোন চেননির দিকে বাড়িয়ে ধরল সে।

সেটটা নিয়ে প্ল্যাটফর্মের মেঝেতে প্রচণ্ড এক আছাড় মারল চেননি। ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল সেটা। 'সবকটাকে জবাই করব আজ আমি! কুত্তার বাচ্চাগুলো বিনা পাহারায় তাদেরকে ছাড়ল কীভাবে?'

'হ্যাঁ, জবাই করাই উচিত!' একযোগে বলে উঠল সঙ্গীরা, তারপর বিগ ব্রাদারের পিছু নিয়ে উঠে পড়ল কেবল্ কারে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা লিভার টেনে রিভার্স গিয়ার দিল রানা। প্রকাণ্ড লোহার খাঁচা, অর্থাৎ কারটা হেলেদুলে আবার ফিরতি পথে রওনা হয়ে গেল।

পঞ্চাশ গজ এগোল কার। এখনই নীচের পাথুরে জমিন থেকে চল্লিশ ফুট উপরে ওটা। জমিন মানে প্রায় খাড়া একটা ঢাল। অপেক্ষায় থাকল রানা, কখন কারটা দুশো গজ দূরে পৌঁছাবে।

বুড়ো শিশুকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছে রানা, কন্ট্রোল প্যানেলে এমন কিছু সুইচ আছে যেগুলো অন করলে এদিক থেকে কেবল-এর প্যাঁচ ঠিকই খুলবে, খুলবেও অসম্ভব দ্রুতবেগে, কিন্তু

টাওয়ারের ওদিকে যাবে না, আটকে থাকবে।

কেবল্ আটকে থাকলে কী ঘটবে তা আর কাউকে বলে দিতে হয় না।

দুশো গজ দূরের কারটাকে এখন অনেক ছোট লাগছে। লোকগুলোর শুধু মাথা দেখতে পাচ্ছে রানা। কোন্টা কার মাথা স্পষ্ট করে বোঝাও যাচ্ছে না। জমিন থেকে এখন কারটা এখন কম করেও দেড়শো ফুট উপরে।

দ্রুত কয়েকটা সুইচে চাপ দিল রানা।

প্রথমে গতি হারিয়ে স্থির হয়ে গেল ঝুলন্ত কার। রানার পিছনে বিশ ফুট লম্বা ব্যারেল বিদ্যুৎবেগে ঘুরতে শুরু করেছে, প্রতি সেকেন্ডে বেরিয়ে যাচ্ছে পাঁচ ফুট করে কেবল্।

কেবল্ বেরুচ্ছে, কিন্তু টাওয়ারের ওপারে যেতে পারছে না।

তারপর দেখা গেল সরাসরি নীচে খসে পড়ছে ভারী কারটা। নির্জন পাহাড়ী এলাকা বলেই বোধহয়, অত দূর থেকেও লোকগুলোর আতঙ্কিত চিৎকার অস্পষ্টভাবে শুনতে পেল রানা।

প্রায় যেন চোখের পলকে ঘটে গেল ব্যাপারটা। নীচের পাথুরে জমিনে পড়ে একবার মাত্র একটু লাফিয়ে উঠল বিশ ফুটী কার, তারপর স্থির হয়ে গেল।

হুন চেননি আর তার শিষ্যরা ছিটকে কারের বাইরে পড়েছে। প্রচণ্ড ঝাঁকিতে প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবার কথা। তিনটে কাপড়ের তৈরি নিষ্প্রাণ পুতুলের মত শুয়ে রয়েছে তারা, এতটুকু নড়াচড়া করছে না।

আবার সুইচে চাপ দিতে টান পড়ল কেবল্-এ, কারটাকে উপরে তুলে আনছে রানা।

দালিয়াকে নিয়ে তাইপিনবু থেকে ট্রেনে চড়ে নানকুতে ফিরছে রানা। ব্যাগে ওর নিজের কাপড়চোপড় ছিল, ছদ্মবেশ খুলে আবার সে-সব পরে নিয়েছে ও। ওদের কমপার্টমেন্টটা প্রায় খালিই বলা যায়, এই সুযোগে দালিয়াকে রানা জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁ, এবার বলো, ব্যাপারটা আসলে কী নিয়ে?'

দ্রুত সবকিছু বদলে যাচ্ছে, ফলে যতই কষ্ট হোক আর কান্না পাক, পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে তাল বজায় রেখে নিজেকেও মানিয়ে নিতে হচ্ছে দালিয়ার। ভাই, স্বামী আর দেওরকে হারাবার পর তার আর আপনজন বলতে কেউ রইল না। তবে রানা তাকে সান্ত্বনা দেবার পাশাপাশি মনটাকেও শক্ত করতে পরামর্শ দিয়েছে, বলেছে তা না হলে দেশের জন্য তুমি যে ঝুঁকি নিয়েছ আর ত্যাগ স্বীকার করেছ তার সবই বৃথা হয়ে যাবে।

পাশের সিট থেকে রানার দিকে আরেকটু ঝুঁকল দালিয়া, তারপর শুরু করল।

ব্যাপারটা বছর কয়েক আগে মার্কিন দূতাবাসে শুরু হয়। সংক্ষেপে এটা হলো, চিনকে ধ্বংস করার আমেরিকান ষড়যন্ত্র।

তখনই একটু খটকা মত লেগেছিল দালিয়ার, কারণ ডাটা অ্যান্ড ইনফরমেশন সেকশনের হেড হওয়া সত্ত্বেও কমপিউটারের কিছু ফাইলে ঢুকতে পারছিল না সে অ্যাকসেস কোড জানা না থাকায়। প্রায় বছরখানেক চেষ্টা করার পর অ্যাকসেস কোড সংগ্রহ করতে পারলেও কোন লাভ হয়নি, কারণ ততদিনে গোপন সমস্ত ফাইল ওয়াশিংটনে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি দালিয়া চিনের শিরদাঁড়া ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, চিনারা যাতে কোনদিন সুপারপাওয়ার হবার স্বপ্ন দেখতে না পারে।

সিআইএ, ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড আর সিক্রেট সার্ভিসের কর্মকর্তারা প্রতি হপ্তায় গোপনে মিটিং করে প্ল্যানটা তৈরি করেছে, তাদেরকে সহায়তা করে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স।

সেই প্ল্যান একটা কমপিউটার ফাইলে বন্দি করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ওয়াশিংটনে, হোয়াইট হাউস আর পেন্টাগনের অনুমোদন পাবার জন্য। পেন্টাগনের সমর্থন পেতে সমস্যা হয়নি, কিন্তু নির্বাচনের বছর বলে হোয়াইট হাউস ব্যাপারটাকে বেশ কিছুদিন ঝুলিয়ে রেখেছিল। তারপর অবশ্য, দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হয়ে, হোয়াইট হাউসের টপ বস সবুজ সংকেত দিয়েছেন।

হোয়াইট হাউস থেকে বেইজিঙের মার্কিন দূতাবাসে ফাইলটা ফেরত পাঠাবার সময় যথারীতি সিকিউরিটি কোড ব্যবহার করা হয়েছিল। ফাইলটা দালিয়ার কমপিউটারেও চলে আসে। আর অ্যাকসেস কোড জানা থাকায় সেটা ওপেন করতে কোন সমস্যা হয়নি তার।

কেউ কিছু জানতে পারার আগেই গোটা প্ল্যানটা পড়ে ফেলল দালিয়া। পড়ার সময়, কী পড়ছে বুঝতে পেরে, মাথাটা তার ঘুরতে শুরু করল। মার্কিনিদের চাকরি করে ঠিকই, কিন্তু তাই বলে মাতৃভূমির এত বড় সর্বনাশ তো হতে দিতে পারে না। সিদ্ধান্ত নিল, প্রমাণ সহ সরকারকে ব্যাপারটা জানাবে।

বুদ্ধি করে প্ল্যানটার প্রিন্ট আউট বের করল দালিয়া, তারপর এক সুযোগে ওই প্রিন্ট আউট থেকে তৈরি করল মাইক্রোফিল্ম। প্রিন্ট আউট বা সিডির চেয়ে মাইক্রোফিল্ম সরানো অনেক সহজ।

মাইক্রোফিল্মটা দালিয়া কারও মনে এতটুকু সন্দেহ না জাগিয়ে মার্কিন দূতাবাস থেকে সরাতে পারল ঠিকই, কিন্তু

তারপরই দেখা দিল মহা সংকট।

পরদিনই মার্কিন দূতাবাসের একজন ইন্টেলিজেন্স অফিসার একটা ঘরে একটানা দু'ঘণ্টা বসিয়ে রেখে জেরা করল দালিয়াকে। হোয়াইট হাউস থেকে আসা টপ সিক্রেট ফাইলটা সে দেখেছে কিনা? ওটা আটশো পাতার একটা ফাইল, প্রিন্টার মেশিনের ইন্ডিকেটর-এ দেখা যাচ্ছে ওই আটশো পাতাই প্রিন্ট করা হয়েছে, সেগুলো কোথায়?

অজ্ঞতার অভিনয় করে কোন রকমে সেদিন দূতাবাস থেকে বেরিয়ে আসতে পেরে দালিয়া ভেবেছিল, এ যাত্রায় বোধহয় বেঁচে গেল। কিন্তু মার্কিনিদের চিনতে তখনও বাকি ছিল ওর। ফ্ল্যাটে ফেরার পথে একবার নয়, দু'বার মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয় তাকে। দু'বারই ভাগ্যগুণে রক্ষা পায় সে।

সেদিনই নিজেদের ফ্ল্যাট ছেড়ে ভাইয়ের সদ্য কেনা ফ্ল্যাটে আত্মগোপন করল দালিয়া। ভাইয়ের এই নতুন ঠিকানা কেউ জানত না বলে কয়েকটা দিন কোন সমস্যা হয়নি। কিন্তু নিজেদের ঠিকানায় দালিয়ার স্বামী মার্কিন দূতাবাসের লোকজন আর বিগ ব্রাদারদের হুমকি শুনতে শুনতে অসুস্থ হয়ে পড়ল। এমনকী সরকারের লোকজন আসছে, গোপনে মোটা টাকা সাধছে তাকে।

দালিয়া বা তার ভাইয়ের কোন ধারণা ছিল না মার্কিনিরা কোটি কোটি ডলার খরচ করে বেইজিঙে হাজার হাজার বেঈমান তৈরি করে রেখেছে। প্রথম ধাক্কাটা এল ওদের এক আত্মীয়র কাছ থেকে।

লোকটাকে সৎ, নীতিবান আর দৃঢ়চেতা বলে চিনত ওরা; কমিউনিস্ট পার্টির আঞ্চলিক নেতা সে, চাকরি করে চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসে। তার কাছে বুদ্ধি চাইতে গেল ওরা,

মাইক্রোফিল্মটা কীভাবে সরকারের বিশ্বস্ত কোন কর্মকর্তার হাতে তুলে দেওয়া যায়।

লোকটার হাবভাব ওদের মোটেও ভালো লাগল না। কথাটা শুনে উত্তেজনা চেপে রাখতে পারল না সে। ফিসফিস করে বলল, ‘আমিই তো সরকারের একজন বিশ্বস্ত অফিসার, জিনিসটা তোমরা আমার কাছে রেখে যাও, আমি খুব যত্ন করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেব।’

‘ওটা তো সঙ্গে নেই, নিয়ে আসতে হবে,’ বলে পালিয়ে আসতে চাইল ওরা।

‘বেশ, এখনই গিয়ে নিয়ে আসবে। তবে আরেকটু বসো। চা-নাস্তা আসছে, খেয়ে যাও,’ বলে অন্দরমহলে চলে গেল লোকটা। পরে দালিয়া বুঝতে পারে, লোকটা হুন চেননিকে ফোন করতে গিয়েছিল।

চা খেয়ে বাইরে বেরুল ওরা, সিদ্ধান্ত নিল, মাইক্রোফিল্মটা এই লোককে দেওয়া উচিত হবে না। তারা টেরও পেল না যে হুন চেননির লোকজন তাদের পিছু নিয়েছে।

তখন সন্ধ্যা রাত। হামলা হলো গভীর রাতে। দলবল নিয়ে হুন চেননি নিজে নক করল দরজায়। পুলিশ বলে পরিচয় দেওয়ায় দালিয়ার ভাই দরজা খুলে দিল। হুন চেননি তাকে নিজের পরিচয় জানিয়ে সরাসরি প্রস্তাব দিল, এক লাখ মার্কিন ডলারের বিনিময়ে ফাইলটা কিনতে চায় সে।

জবাবে দালিয়ার ভাই বলল, ‘আমরা কারও হুমকির মুখে নতি স্বীকার করব না। যা পারো করে নিয়ো, আমরা ওটা বেচব না।’

ঘুম ভেঙে যাওয়ায় ওদের সব কথাই নিজের কামরা থেকে শুনতে পাচ্ছিল দালিয়া। গুলির আওয়াজ আর ভাইয়ের গোঙানি

শুনে শিউরে উঠল সে। হুন চেননির এক সঙ্গীকে বলতে শুনল, ‘এক গুলিতেই খতম করে দিয়েছেন, বস্।’

জবাবে হুন চেননি বলল, ‘এবার দরজা ভেঙে তোরা সবাই ধর্ষণ কর মেয়েটাকে। দেখি ফাইলটা না দেয় কী করে।’

এ-কথা শুনে জানালার গ্রিল খুলে পালায় দালিয়া। দোতলা থেকে পানির পাইপ বেয়ে নীচে নামে, তারপর একটা গলি থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে চলে আসে নানকুতে। ওখানে তার দেওর পাওচেনের শ্বশুরবাড়ি। পালাবার সময় শুধু মাইক্রোফিল্ম আর মোবাইল ফোনটা সঙ্গে নেয় সে।

‘ঠিক কী আছে ফাইলটায়?’ মূল প্রসঙ্গে ফিরে এল রানা।

দালিয়া জানাল, আটশো পাতার বিশদ বিবরণ সহ জটিল একটা প্ল্যান, এককথায় বলা সম্ভব নয় কী আছে।

প্রথম দু’বছর তিন হাজার গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণ, স্থাপনা আর প্রতিষ্ঠানের সচিত্র প্রতিবেদন সংগ্রহ আর বিশ্লেষণ করা হয়।

এগুলোর মধ্যে চারটে অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার, বত্রিশটা এয়ারপোর্ট, রকেট আর ফাইটার প্লেন সহ নয়টা সমরাস্ত্র তৈরির কারখানা, একশো বাহাত্তরটা বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রজেক্ট, পাঁচটা সমুদ্রবন্দর, আশিটা গ্যাসফিল্ড, সাতাশটা তেলকূপ, একুশটা ক্যান্টনমেন্ট আলাদা একটা তালিকায় জায়গা পায়, সেটার শিরোনাম দেওয়া হয়: টপ প্রায়োরিটি-ওয়ান।

এই তালিকার প্রতিটি জায়গায় একই দিন একই সময়ে ‘দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক পার্টি’ নামে নতুন একটা রাজনৈতিক দলের সদস্যরা হামলা চালাবে।

বলা হবে, নতুন এই রাজনৈতিক দল গোপনে প্রচারণা চালিয়ে আর জনহিতকর নানা কাজ করে সাধারণ চিনাদের মন জয় করে

নিয়েছিল, তারাই একটা গণ-অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করেছে।

এরপর টপ প্রায়োরিটি-টু।

এটা চিনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবশালী কর্মকর্তা আর মন্ত্রী পরিষদের তালিকা। ওই একই দিনে তাঁদেরকে হত্যা করা হবে।

পরবর্তী তালিকার শিরোনাম: ভিআইপি।

এতে আছে 'দেশপ্রেমিক গণতান্ত্রিক পার্টি'-র প্রথম সারির নেতা আর পৃষ্ঠপোষকদের নাম।

এরপর শুরু হয় এনজিও থেকে ঋণ আর চাকরি দেওয়ার লোভ দেখিয়ে পাঁচ লাখ স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের কাজ। স্বেচ্ছাসেবক মানে কমিউনিজম আর সরকার বিরোধী লোকজন, মৌলবাদী জঙ্গি, চোর-বদমাশ, ভবঘুরে, পাতি গুণ্ডা আর বিশ্বাসঘাতকদের দল।

সিদ্ধান্ত হয়, গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেবে ত্রিশ হাজার মার্সেনারি, তাদের নির্দেশেই পাঁচ লাখ স্বেচ্ছাসেবক গোটা চিনে একযোগে স্যাবটাজ শুরু করবে।

ট্রেন কমপার্টমেন্টের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে রানা বলল, 'তুমি আসলে ওদের একটা তাজা অ্যাটম বোমা চুরি করেছ। এখনও যে বেঁচে আছ সেটাই তো আশ্চর্য।'

'বেঁচে থেকে আর কী লাভ হলো, বলুন? আসল জিনিসটাই তো হারিয়ে ফেলেছি...'

'হারিয়ে ওটা যাবে কোথায়, দালিয়া?' দৃঢ়কণ্ঠে আশ্বাস দিল রানা, চোখে-মুখে আত্মবিশ্বাসের কোন অভাব নেই। 'আমি যখন ওটার পিছু নিয়েছি, তুমি নিশ্চিত থাকো ঠিকই খুঁজে বের করব। চিন আমাদের বন্ধু, কাজেই ষড়যন্ত্রের কথাটা সরকারকে জানানো আমাদের একটা দায়িত্ব।'

‘কিন্তু যদি পানও, আপনি ওটা কার হাতে তুলে দেবেন? কী করে বুঝবেন সেই লোক বেঈমান নয়?’

‘তোমার আসলে ঘরপোড়া গরুর অবস্থা হয়েছে,’ হালকা সুরে বলল রানা, তারপর জানতে চাইল, ‘তুমি কী করে বুঝলে আমি বেঈমান নই?’

‘ও, আচ্ছা, সরকারী পদে পরীক্ষিত বন্ধু আছে আপনার...’

‘অপারেশনটা কবে শুরু হবে জানো?’ জিজ্ঞেস করল রানা। দালিয়ার কথায় ওর বন্ধু, চিনা সিক্রেট সার্ভিসের চিফ লিউ ফু চুঙ-এর মুখটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। ‘কোন টাইমটেবিল আছে?’

‘জী, মাসুদ ভাই, আছে,’ বলল দালিয়া। ‘নতুন বছরের প্রথম হপ্তায়।’

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। ‘তোমাকে আমি আপাতত বেইজিঙে, আমাদের একটা সেফহাউসে রাখব, যতদিন না বিপদটা কেটে যায়, ঠিক আছে?’

মাথা ঝাঁকাল দালিয়া। ‘সেই মঠে, ঊননব্বুই সালে যেটায় ছিলাম?’

‘না, এটা আরেকটা। তবে বেইজিঙে ফেরার আগে তুমি আমাকে তোমার দেওর পাওচেনের কাছে নিয়ে যাচ্ছ।’

‘আপনি না বললেন পাওচেন মারা গেছে?’

‘তার লাশটাই দেখতে যাব আমি,’ বলল রানা। ‘বলা যায় না, ওখানে হয়তো কোন ক্লু পড়ে আছে।’

বাড়িটার সদর দরজা খোলা পেল ওরা।

সামনের বসার ঘরে ফার্নিচার বলতে তেমন কিছু নেই,

পুরানো এক সেট সোফা আর একটা নিচু টেবিল। টেবিলের উপর চাবি সহ একটা তালা পড়ে আছে।

বিপদ হতে পারে এটা পাওচেন জানত, সেজন্যই শ্বশুরবাড়ির সব লোকজনকে আগেই সরিয়ে দেয় সে। পাহাড়ের ঢালে নিঃসঙ্গ একটা বাড়ি, খেয়াল করার কেউ নেই কে গেল বা কে এল। লাশটা ভিতর দিকের একটা ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে। চিৎ করা লাশ, ছোরাটা এখনও বাম বুকে হাতল পর্যন্ত গাঁথা।

বিছানার উপর একটা খোলা সুটকেস দেখল রানা, ভিতরের জিনিস-পত্র খাটে ছড়িয়ে রয়েছে।

কামরাটা বেশি বড় নয়, ঘুরে ঘুরে দেখছে রানা। কিছু পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না, কারণ হুন চেননির লোকজন ছাড়াও অনেকের পা পড়েছে এখানে। আধঘণ্টা পর হাল ছেড়ে দিল রানা। নাহ্, এখানে কোন ক্লু নেই, কিংবা থাকলেও ওর চোখে ধরা পড়ছে না।

ওর জন্য পাশের ঘরে অপেক্ষা করছিল দালিয়া। তাকে নিয়ে বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এল রানা। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল ও। এক সেকেন্ড কী যেন ভাবল, তারপর ঘুরে আবার বাড়িটার ভিতর ঢুকল।

সঙ্গে সঙ্গেই আবার বেরিয়ে এল রানা, হাতে চাবি সহ সদর দরজার তালাটা রয়েছে। 'তালা যখন রয়েছেই, বাড়িটাকে খালি ফেলে রেখে যাই কেন,' বলে দরজা বন্ধ করে তালাটা খোলার জন্য কী হোলে চাবি ঢোকাল ও।

কিন্তু তালার ভিতর চাবি ঢুকছে না। ভালো করে তাকাতে কী হোলের ভিতর সাদা মত কিছু দেখতে পেল রানা, যেন মনে হলো একটুকরো কাগজ গুঁজে রাখা হয়েছে। 'তোমার কাছে চুলের কাঁটা

বা পিন হবে নাকি?'

মাথা থেকে একটা ক্লিপ খুলে রানার হাতে ধরিয়ে দিল দালিয়া। সেটা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তালার ভিতর থেকে জিনিসটা বের করল রানা। ছোট্ট একটুকরো কাগজই। তাতে কিছু লেখা রয়েছে। হাতের লেখাটা চিনতে পারল ও।

চৌ মিন লিখেছে—আপনাকে যদি সত্যি চিনে থাকি, জানি তালাটাকে ব্যবহার করার কথা একমাত্র আপনার মাথাতেই জাগবে। প্রসঙ্গত, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেয়ে যাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু পাওচেনকে আমরা মারিনি। কোথায় দেখা হওয়ার কথা মনে আছে তো, বস্?'

চিনা সিক্রেট সার্ভিস। হেডকোয়ার্টার বেইজিং।

নিজের চেম্বারে বন্দি বাঘের মত পায়চারি করছে চিফ লিউ ফু চুঙ। এ অদ্ভুত এক পেশাগত বিড়ম্বনা শুরু হয়েছে—সব খবরই পাচ্ছে সে, তবে ঠিক সময়মত নয়। ফলে সমস্যার সমাধান বের করা কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

আমেরিকানরা চিনের সর্বনাশ করার জন্য প্ল্যান তৈরি করছে কয়েক বছর ধরে, অথচ সিক্রেট সার্ভিস সে-সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেনি। প্ল্যান সহ গোপন ফাইলটা মার্কিন দূতাবাস থেকে চুরি করেছে এক চিনা মেয়ে, চুরি করার পর সেটা সরকারের হাতে তুলে দেয়ার জন্য বিশ্বস্ত একজন লোক খুঁজছে—এই খবরটাও সময় মত পায়নি তারা। খবর যখন এল, কেউ বলতে পারে না মেয়েটা বা ফাইলটা কোথায় আছে। শুধু জানা গেল, ওটার খোঁজে পাঁচ বিগ ব্রাদার, আমেরিকান দূতাবাস, সিআইএ, ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো সহ অন্য আরও বহু দেশের

স্পাইরা আদাজল খেয়ে মাঠে নেমে পড়েছে।

স্বভাবতই চিনা সিক্রেট সার্ভিসেরও মাঠে নামার কথা। কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, তারা নামেনি। কেন?

চোখে যখন অন্ধকার দেখছে ফু চুঙ, এই সময় খবর এল বিসিআই এজেন্ট মাসুদ রানাকে রাজধানীর কোন একটা হোটেলে দেখা গেছে। প্রিয় বন্ধুর উপস্থিতিতে আশার আলোর দেখতে পেল সে, জানে চিনা সিক্রেট সার্ভিস কী কারণে মাঠে নামতে পারছে না ব্যাখ্যা করে বললে সাহায্য করতে রাজি হবে রানা। কিন্তু এই খবরটাও অনেক দেরিতে পেয়েছে তারা।

তবে শেষ পর্যন্ত রানা এজেন্সির বেইজিং শাখার প্রধান বুন লি-র মাধ্যমে রানার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছে। গুরুতর বিপদে পড়েছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার সঙ্গে দেখা কর্, দোস্ত– এ-ধরনের একটা মেসেজও পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

সেই থেকে চলছে অপেক্ষার পালা। ফু চুঙ আশা করছে যে-কোন মুহূর্তে তার চেম্বারে পৌঁছে যাবে রানা।

রানা এল আরও প্রায় একঘণ্টা পর।

প্রাথমিক কুশলাদি বিনিময়ের পর ফু চুঙ এভাবে শুরু করল, 'আগে শোন্ বিপদটা কী...'

ট্রাফিক পুলিশের মত হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে রানা বলল, 'বিপদটা কী আমি জানি। কালো নকশাটা উদ্ধার করতে হবে, এই তো?'

'তুই তা হলে জানিস! কালো নকশা...হ্যাঁ,' দ্রুতই নিজেকে সামলে নিল ফু চুঙ। 'সেজন্যেই বেইজিঙের কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না তোকে?'

'হ্যাঁ। তোদের এই বিপদটার সঙ্গে ব্যক্তিগত একটা কারণে

জড়িয়ে পড়েছি আমি।'

'সেটা কী ব্যাখ্যা করা যায়?'

'যায়,' বলে ওর বেইজিঙে আসার পর থেকে কী ঘটেছে সংক্ষেপে জানাল রানা।

'তুই তো একাই দেখছি বিগ ব্রাদারদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছিস, দোস্ত!' বলল ফু চুঙ। 'ভালো কথা, তুই কি এ-ও জানিস যে ওই কালো নকশার খোঁজে মাঠে সবাই থাকলেও, আমরা নেই?'

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল রানা। 'মানে?'

'আমরা উভয় সংকটে পড়ে গেছি, দোস্ত। প্রাইম মিনিস্টারের দফতর থেকে বলে দেওয়া হয়েছে, আমেরিকা যদি চিনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে থাকে সেটা কী জেনে নিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করো সেটা বানচাল করতে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করা চলবে না।'

'এর মানে? কিছুই তো বুঝলাম না!'

ফু চুঙ তখন ব্যাখ্যা করল।

মার্কিন দূতাবাস থেকে চিনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের একটা ফাইল চুরি করেছে এক চিনা মেয়ে জিজিয়ানা দালিয়ান। ফলে, স্বভাবতই মার্কিনিরা ধরে নেবে চিন সরকারই এই কুকর্মটি করিয়েছে–গোয়েন্দা লাগিয়ে। হই-চই বাধিয়ে দেবে ওরা, প্রচার শুরু করবে দুনিয়াময়: কূটনৈতিক নীতিমালা লঙ্ঘন করছে চিন।

গণচিন নিজের স্বার্থে বেশ কয়েক বছর ধরে চেষ্টা করছে পাশ্চাত্য দুনিয়ার সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে। তাই কর্তৃপক্ষ এমন কিছু করতে রাজি নন যাতে সেই সম্পর্কে চিড় ধরে। অথচ যুক্তরাষ্ট্রের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার জন্য জানা দরকার আসলে গোপন

ফাইলটায় কী আছে।

'আমরা নিজেরা জড়াব না, কারও সাহায্যে ওই ফাইলটা পেতে চেষ্টা করব,' সবশেষে বলল ফু চুঙ। 'চোখে অন্ধকার দেখছিলাম, কারণ সাহায্য চাওয়া যায় এমন কাউকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তারপর হঠাৎ খবর পেলাম তুই বেইজিঙে। যাক, জানে পানি এল আমার। শুনছি মার্কেটে অনেক টাকার দান চলছে, ফাইলটা হাতে পেলে চিনও অনেক টাকা খরচ করতে রাজি আছে। দোস্ত, করবি তো সাহায্য?'

'দ্যাখ, ব্যাটা!' রেগে গেল রানা। 'মেরে ছাতু করে দেব বলে দিচ্ছি! কোলকাতার গ্র্যান্ড হোটেলের ডান্সফ্লোর থেকে তুলে এনে তুই যেবার আমাকে বাঁচিয়েছিলি, কত টাকা দিয়েছিলাম আমি তোকে তখন?'

'ভুল বুঝছিস, শালা!' হাসল লিউ ফু চুং। 'টাকাটা তোর জন্যে না। যদি ওটা কিনতে হয় কারও কাছ থেকে–সেজন্যে বললাম। তোকে টাকা সাধব, কটা মাথা আমার ঘাড়ে?'

'ঠিক আছে, যা, মাফ করে দিলাম। আর সাহায্য করবার ব্যাপারে, তুই তো জানিস, অনুমতির একটা ব্যাপার আছে। আমাদের বুড়ো খোকার সায় পেলে দেখবি কেমন ঝাঁপিয়ে পড়ি।'

স্বস্তির হাসি ফুটল ফু চুঙের মুখে। রানার হাতে চাপ দিল। বলল, 'গোটা এসপিওনাজ জগতে এক আশ্চর্য কিংবদন্তি উনি। আর তোরাও যেমন পিতার মর্যাদা দিয়ে বুড়ো মানুষটাকে মাথায় তুলে রেখেছিস...ঈর্ষা হয়।' একটু চুপ করে থেকে আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে এল ফু চুং, 'শুনছি, জিনিসটা নিলামে উঠতে যাচ্ছে, অনেক টাকা ডাক উঠবে। সেক্ষেত্রে তোর প্রস্তুত থাকার দরকার আছে না?' টান দিয়ে ডেস্কের একটা দেরাজ থেকে চেক বই বের

করল ও। ‘একটা চেক রেখে দে, দোস্ত, সঙ্গে। সুইস ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট। যত বড় অঙ্কেরই চেক হোক, অনার করা হবে।’

‘ব্ল্যাঙ্ক চেক?’

‘হ্যাঁ, ডিফেন্স মিনিস্টারের সই করা।’ স্বতঃস্ফূর্ত একটুকরো হাসি ফুটল ফু চুঙের ঠোঁটে, তাতেই বোঝা গেল বন্ধুকে কতটা বিশ্বাস করে সে।

চেকটা নিয়ে পকেটে ভরল রানা। ‘তবে একটা কথা,’ বলল ও। ‘তোদের মাঠে একদম না থাকাটাও কেমন যেন দেখায়। মার্কিনিরা ভাববে তোরা মেরুদণ্ড হারিয়ে ফেলেছিস। মনে সন্দেহও জাগবে। তারচেয়ে এক কাজ কর্—অন্তত কয়েকটা দিন থাক তোরা মাঠে, দিশেহারার মত ছোটাছুটি করে ঘুরপাক খা, ভাব দেখাঃ সূত্রের অভাবে এগোতে পারছিস না। ’

‘গুড আইডিয়া।’ খুশি হয়ে রানার পরামর্শ মেনে নিল ফু চুঙ।

ছয়

হংকং।

ফাইভ স্টার চায়না আনলিমিটেড থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ক্যান্টন রোডে চলে এল রানা, তারপর বাঁক ঘুরে জমকালো শপিং এরিয়া নাথান রোডে ঢুকল।

রানার কোন ধারণা নেই চিন থেকে মাইক্রোফিল্মটা নিয়ে মিন ভাইরা আদৌ হংকঙে ফিরতে পেরেছে কিনা। জানতে হলে চৌ মিনের দেওয়া পথ নির্দেশ ধরে হংকঙের কুখ্যাত একটা এলাকায় হাজিরা দিতে হবে ওকে।

ঠিকানাটা হলো–হাংরি গোস্ট, মানে ক্ষুধার্ত ভূত। একধারে বেশ্যা পাড়া, আরেক ধারে সারি সারি শুঁড়িখানা, মাঝখানে কয়েকটা টার্কিশ বাথ, তারই একটা হাংরি গোস্ট। সেখানেই এখন যাচ্ছে রানা।

মাঝখানের তিনদিন ঢাকায় কাটিয়ে এসেছে ও। চিনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে আমেরিকা, সেটা বানচাল করার জন্য চিনা সিক্রেট সার্ভিস বিসিআই-এর সাহায্য চাইছে, কাজেই মেজর জেনারেল (অবসর প্রাপ্ত) রাহাত খানের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দরকার ছিল। সব কথা শোনার পর অনুমতি দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা

করেননি বিসিআই চিফ।

টেমপল স্ট্রিটে পৌঁছাতে পনেরো মিনিট লাগল রানার। সম্ভবত কুখ্যাতি আছে বলেই হংকঙের এদিকটায় ট্যুরিস্টদের ভিড় নেই। ফুটপাথে পাহাড়ের মত স্তূপ করে বিক্রি হচ্ছে মোবাইল ফোন, পাশেই খোলামেলা প্রচ্ছদ সহ পর্নো ম্যাগাজিন। আরেক পাশে বিশুদ্ধ আফিম বা হেরোইন-এর পুরিয়া। রাস্তাগুলো সরু, তাই মানুষের উপচে পড়া ভিড়ে পথ চলা দায়।

বাইশ নম্বর টেমপল স্ট্রিট বিধ্বস্ত একটা পোড়োবাড়ি যেন। সদর দরজায় ভিতর থেকে তালা মারা। কলিং বেল বাজিয়ে স্রোতের মত ধাবমান পথচারীদের উপর নজর রাখছে রানা। তবে ওর ব্যাপারে কাউকে তেমন আগ্রহী বা কৌতূহলী বলে মনে হলো না।

দরজা খুলে গেল। গাউন আর স্কার্ট পরা চিনা তরুণী মাথা নুইয়ে অভ্যর্থনা জানাল ওকে। বেশ মিষ্টি চেহারা তার, তবে বুক বলে কিছু আছে কিনা সন্দেহ। টকটকে লাল নেইলপালিশে রাঙানো আঙুল তুলে রিসেপশন রুমটা দেখিয়ে দিল সে।

কামরাটার দেয়াল কালো মখমল দিয়ে ঢাকা। সোফাসেটটা সোনালি। কয়েকটা ডিভানও ফেলা হয়েছে। সবগুলোতে এক বা একাধিক জাপানি পুতুলের মত চিনা সুন্দরীরা বসে আছে।

'আমাদের মেয়েরা খুব পরিচ্ছন্ন,' বলল মেয়েটা।

'আজ নয়,' অমায়িক হেসে জবাব দিল রানা। 'তবে ধন্যবাদ।'

'তা হলে আপনাকে বরং ম্যাসাজ পারলারে পাঠিয়ে দিই।'

'আবারও ধন্যবাদ, তবে আজ নয়।'

'তা হলে এদিকে,' বলে একটা ধাতব দরজা খুলে পাশের ঘরে ঢুকল মেয়েটা, রানাও তার পিছু নিল।

এই ঘরের মেঝে সাদা আর কালো টাইল দিয়ে ঢাকা। কোথাও থেকে বাষ্প আর ঘামের গন্ধ ভেসে আসছে।

'অ্যাটেনড্যান্ট আপনাকে লকার কী দেবে, চার্জ একশো হংকং ডলার,' বলে চলে গেল মেয়েটা।

চৌ মিন জানিয়েছে, রানার সঙ্গে এখানকার স্টিম রুমে দেখা করবে সে। কাজেই একশো ডলার দিয়ে অ্যাটেনড্যান্টের কাছ থেকে তোয়ালে আর চাবি নিয়ে লকার খুঁজছে রানা। সেটা যেন অন্য এক গ্রহতে, প্যাসেজের গোলকধাঁধা পার হয়ে পৌঁছাতে হলো।

সারি সারি ধাতব লকারগুলোয় মরচে ধরেছে। ওগুলোর সামনে কাঠের লম্বা বেঞ্চও।

জ্যাকেট আর শোল্ডার-হোলস্টার খোলার সময় আশপাশে কাউকে দেখল না রানা। অন্তত আপাতত পিস্তলটাকে তালার ভিতর থাকতে হবে। কোমরে যখন শুধু তোয়ালে থাকে, আগ্নেয়াস্ত্র লুকিয়ে রাখা সত্যি খুব কঠিন। ছুরিটাও লকারে চলে গেল।

সঙ্গে থাকল শুধু একটা ক্যাপসুল, উরুর ভিতর দিকে টেপ দিয়ে আটকানো। মাত্র আধ ইঞ্চি লম্বা হলে কী হবে, আগ্নেয়গিরির মত ধোঁয়ার মেঘ তৈরি করতে পারে। বলাই বাহুল্য যে বিষাক্ত।

লক্ষ্মী ক্রেতা হয়ে যাচ্ছে রানা, অর্থাৎ চৌ মিনের তরফ থেকে কোন বিপদের আশঙ্কা নেই বলেই ধারণা করছে ও।

চাবি সহ ইলাস্টিক ব্যান্ডটা কবজিতে পেঁচিয়ে নিল রানা, তারপর স্টিম রুমের দিকে এগোল।

কাঁচ আর ইস্পাতের তৈরি দরজাটা খুলতেই ঘুসির মত আঘাত করল গরম বাষ্প। শুধু গরম নয়, এত ঘন যে কোথায় পা ফেলছে দেখার উপায় নেই। নিজেকে চুলোয় চড়ানো তাওয়ার

উপর গরম তেলে ভেসে থাকা গলদা চিংড়ি মনে হলো রানার। ঢুকতে না ঢুকতে দরদর করে ঘামতে শুরু করেছে। কপাল থেকে নেমে ঘামের ধারা চোখে এসে পড়ছে।

গরম সিমেন্টের মেঝের উপর দিয়ে সাবধানে এগোচ্ছে রানা, ভয় পাচ্ছে বেঞ্চ বা ভেজা লোকজনের সঙ্গে না ধাক্কা লেগে যায়।

লোকজন কেউ থাকলে তো ধাক্কা লাগবে। সন্দেহ নেই, তারা সবাই ম্যাসাজ পারলারে গিয়ে ভিড় জমিয়েছে। তাতে বরং খুশি রানা। প্রাইভেসি পাওয়া যাবে। চৌ মিনের সঙ্গে আলাপ করার সময় তা দরকারও।

এই সময় রানার মনে হলো, ও বোধহয় একটু আগে পৌঁছেছে। কারণ ঘন বাষ্পের ভিতর যতদূর দেখা যাচ্ছে সবগুলো বেঞ্চই খালি।

'চৌ মিন?' ডাকল ও। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। চারদিকটা ভালো করে দেখার জন্য কাঠের বেঞ্চে উঠে দাঁড়াল রানা।

এতক্ষণে তাকে দেখতে পেল ও। কাছাকাছি ডান দিকের একটা বেঞ্চে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। দেখে মনে হলো টার্কিশ বাথের গরম আর ঘন বাষ্পে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। নাকি ঘুমাচ্ছে? প্রশ্নই ওঠে না, তাপমাত্রা যেখানে পারদকে ১২০-এর ঘরে তুলে দিচ্ছে সেখানে একজন মানুষ ঘুমায় কী করে?

কে জানে, হতেও পারে। কাঁচা ঘুম ভাঙানো গুরুতর অন্যায়ের মধ্যে পড়ে, কিন্তু আর কোন উপায়ও নেই। তার পাশে এসে দাঁড়াল রানা, টোকা দিল কাঁধে।

তারপরই বাষ্পের ভিতর দিয়ে রানা দেখল, চৌ মিনের নগ্ন গলায় সরু একটা লাল দাগ। গলাকাটা লাশ আগেও অনেক দেখেছে ও, তবে এরকম নিখুঁতভাবে কাটা গলা খুব কমই

দেখেছে।

চৌ মিনের কোমর থেকে টান দিয়ে তোয়ালেটা খুলে নিল রানা। কিন্তু শরীরের কোথাও কিছু লুকিয়ে রাখেনি সে। তারপর দেখতে পেল জিনিসটা। লকার কী, হাতের ভাঁজে ইলাস্টিক দিয়ে আটকানো।

আড়ষ্ট হাত লম্বা করে কবজি আর আঙুলের উপর দিয়ে টেনে এনে ইলাস্টিক ব্যান্ডটা খুলে নিল রানা। তাতে মাত্র একটা চাবি দেখে বিস্মিত হলো ও। ওর ব্যান্ডে চাবি রয়েছে দুটো। নিঃশব্দ পায়ে স্টিম রুম থেকে বেরিয়ে এল ও।

চৌ মিনের লকার রানার লকারের কাছ থেকে বেশি দূরে নয়। তালা খুলতে ভিতরে কাপড়ের স্তূপ দেখা গেল, বেশিরভাগই তথ্য সওদাগরের গলার মত কাটা। জানা কথা খুনিও রানার মত মাইক্রোফিল্মটা খুঁজেছে এখানে। চৌ মিনের স্পোর্টস জ্যাকেট আর ট্রাউজারের লাইনিং পর্যন্ত ব্লেড দিয়ে কেটে সার্চ করেছে সে।

তবে খুনি কিছু পেয়েছে কিনা সন্দেহ আছে রানার। কারণ চৌ ওকে জানিয়েছিল, যথার্থ মূল্য না পাওয়া পর্যন্ত মাইক্রোফিল্মটা নিরাপদ একটা জায়গায় লুকিয়ে রাখবে সে। টার্কিশ বাথের লকারকে সে নিরাপদ মনে করবে না।

চৌ মিন মারা যাওয়ার কারণে রানার নৌকা এখন অকূল সাগরে পড়ল, বৈঠা ছাড়া। ওর এখন একমাত্র আশা, চৌ মিন যদি কোন ধরনের ক্লু রেখে গিয়ে থাকে।

কাজেই, কিছু পাবে না জেনেও, কাপড়চোপড়গুলো অত্যন্ত সাবধানে আর যত্নের সঙ্গে সার্চ করল রানা। এমনকী জুতোর গোড়ালি পর্যন্ত খুলে ফেলল। কিন্তু না, গোড়ালির ভিতর ফাঁপা কোন জায়গা নেই যে কিছু লুকিয়ে রাখা যাবে।

এক এক করে প্রায় সবই দেখা শেষ হয়ে এল। সব আবার লকারে ঠাঁই করে নিচ্ছে।

কাজ শেষ, কিন্তু কিছু পাওয়া যায়নি। সিধে হতে যাবে রানা, চোখের কোণে ধরা পড়ল সাদা এক টুকরো কাগজ। সম্ভবত চৌ মিনের জ্যাকেট থেকে খসে পড়েছে–ও বা খুনি জিনিস-পত্র ঘাঁটাঘাঁটি করার সময়।

কাগজটা লকারের মেঝে আর পাশের ধাতব দেয়ালের মাঝখান থেকে উঁকি দিচ্ছে। দু'আঙুলে ধরে সেটা টেনে নিল রানা, তারপর আলোর সামনে ধরল।

এটা একটা টিকিটের অর্ধেক। কাগজটা শক্ত। হংকং ইউনিভার্সিটির মিউজিয়ামে ঢুকতে হলে এই টিকিট কিনতে হয়।

টিকিটটা উল্টো করে আপন মনে হাসল রানা। কাগজের খালি অংশে চিনা ভাষায় কয়েকটা হরফ আঁকা রয়েছে। একটা নাম। তোউ ওয়ান। নামটা আগে কোথাও শুনেছে বলে মনে পড়ছে না রানার। তবে একেবারে কিছু না পাওয়ার চেয়ে ভালো আর কী।

লকার বন্ধ করল রানা, তালা দিল, দরজার মাথার কাছে ধাতব জাফরির ভিতর চাবিটা ঢুকিয়ে ছেড়ে দিল। সরু ক্লজিটের ধাতব মেঝেতে টং করে পড়ল সেটা।

বাইশ টেমপল স্ট্রিটে আর কোন কাজ নেই রানার। ঘুরল ও, নিজের লকারের দিকে এগোচ্ছে। ছোঁয়াটা পরিচিত। শিরদাঁড়ার নীচের দিকের একটা গাঁটে লাগল। ভয়ে কাঠ হয়ে গেল রানা।

'মরার জন্যে খুব বাজে একটা জায়গা, তাই না?' লোকটার ইংরেজি উচ্চারণই বলে দিচ্ছে সে জাত ইংরেজ।

জবাব না দিয়ে রানা বলল, 'গান ব্যারেলের যে আকৃতি অনুভব করছি, তোমার হাতে ওটা সম্ভবত স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন,

৩৯ মডেল। অনুমান করি একা নও।'

লোকটার নিঃশ্বাসের সঙ্গে শ্লেষাত্মক হাসির আওয়াজ শোনা গেল। 'ওরেব্বাপরে, এ তো দেখা যাচ্ছে ওস্তাদ লোক!' পিছন থেকে আরেকজন হেসে উঠল। রানার অনুমান মিথ্যে নয়।

'সহকারী বা দু'নম্বর লোক নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্যে একটু বেশি জোর খাটায়,' বলে কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

এখন আর তারা হাসছে না। 'এতই যখন বোঝো,' ইংরেজ লোকটা বলল, 'তুমিও সহযোগিতা করার জন্য জোর চেষ্টা চালাও।' ওর কাঁধে হাত দিয়ে ধাক্কা মারল সে, পিস্তলের মাজল পিঠে গেঁথে যাচ্ছে। সাবধান হয়ে গেল রানা। এই লোকের রিফ্লেক্স আর ব্যালেন্স অত্যন্ত ভালো। একটু চালাকি করতে দেখলেই ট্রিগার টেনে দেবে।

টিকিটের অর্ধেকটা এখনও রানার দু'আঙুলের মাঝখানে। তবে বেশিক্ষণ থাকল না ওখানে, কারণ ধাক্কা খেয়ে লকার রুম থেকে বেরুবার সময় টাইলের মেঝেতে ফেলে দিয়েছে ওটা।

লোক দুজনকে এখনও দেখেনি রানা। তাড়াহুড়ো না করে ঘাড় ফেরাতে শুরু করেছে, অস্ত্রধারী তার বাম হাত দিয়ে ধাঁ করে মেরে বসল। রানা অনুভব করল, তার আঙুলে পরা আঙটির লালচে-বেগুনি পাথরটা নির্দয়ভাবে গেঁথে গেল ওর বুকে। চুনির সংস্পর্শে আসার এরকম তিক্ত অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি ওর।

'কিছু করার অনুমতি নেই তোমার, স্মার্ট ফেলো,' শ্লেষ মাখা কণ্ঠে বলল লোকটা। তার হাবভাব এত ঠাণ্ডা, গরম বাষ্পও যেন তাপ হারাচ্ছে। লোকটা স্যাডিস্টিক টাইপের, নিজেকে সাবধান

করল রানা।

ওর দৃষ্টিপথে আঙটিবিহীন আরেকটা হাত দেখা গেল, আঙুলগুলো বেঁটে। ইংরেজের সঙ্গী একটা দরজা খুলছে। সেটার গায়ে চৌকো একটা বোর্ড ঝুলছে, তাতে হাতে লেখা কয়েকটা নিরীহ দর্শন হরফ দেখল রানা—ঝঅটঘঅ।

কিছু করার সুযোগ পাওয়া গেল না, কাঁধে ভারী হাতের ধাক্কা খেয়ে ভিতরে ঢুকল রানা, শিরদাঁড়ার উপর পিস্তলের মাজল মুহূর্তের জন্যও সরেনি।

দরজাটা ওর পিছনে বন্ধ হয়ে গেল। নির্দেশ এল, ঘোরো।

এই প্রথম রানা সামনাসামনি দেখল কাদের হাতে বন্দী হয়েছে ও।

ইংরেজ লোকটা এখন তার পিস্তল ওর বুকে তাক করে রেখেছে। কলোনি বানিয়ে দুনিয়ার মানুষকে শোষণ করার পুরানো ঐতিহ্য স্মরণে রেখেই যেন দাগবিহীন সাদা লিনেন-এর সুট পরেছে সে, গলা থেকে ঝুলছে পুরানো ধাঁচের একটা লাল টাই।

দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছে সে, রানার দিকে তাকিয়ে। দৃষ্টিতে গাম্ভীর্য আর জিদ। ভঙ্গিটাই বলে দেয়, এ লোক ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের এজেন্ট না হয়েই যায় না।

দ্বিতীয় লোকটা স্পষ্টতই আমেরিকান। পরিষ্কার সিআইএ। ব্লু সুট, সাদা টাই। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। বক্সিং রিঙে নামিয়ে দিলে রক্তারক্তি কাণ্ড বাধিয়ে ছাড়বে।

'বসো,' নির্দেশ দিল সাদা সুট।

পিছু হটল রানা, যতক্ষণ না কাঠের পিচ্ছিল বেঞ্চের স্পর্শ পেল। নির্দেশ মেনে নিয়ে বসল ধীরে ধীরে। সনার শুকনো তাপও

দরদর করে ঘামাচ্ছে। তোয়ালেতে বার বার মুছে শুকনো রাখতে হচ্ছে হাত দুটোকে, জানে সময় হলে মুঠোর আঁকড়ে ধরার শক্তি পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে।

'তুমি সত্যি কথা বলবে, কেমন? কারণ কেউ মিথ্যে বললে আমাদের মেজাজ আমরা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি না। কোথাকার কে তুমি?'

'শ্রীলঙ্কান। আমার নাম কুমার সম্ভব।' এটাই রানার কাভার। পাসপোর্টও তাই বলবে।

'আমরা ধরে নিচ্ছি তুমি হাংরি গোস্টের রেগুলার কাস্টমার নও,' বলল সাদা কোট। 'এ-ও ধরে নিচ্ছি চৌ মিনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা তুমি মিস করেছ।'

'চৌ কে?'

'কৌতুক শুধু আমরা করব, মিস্টার সম্ভব। তুমি শুধু রিয়্যাক্ট করবে, ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে,' রাজি হলো রানা।

সিআইএ-র কানে ফিসফিস করল ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ। সাদা টাই, অর্থাৎ সিআইএ, জায়গা বদলে রানার বেঞ্চের পিছনে গিয়ে পজিশন নিল। 'এখনই?' উৎসাহের সঙ্গে জানতে চাইল লোকটা।

'তোমার সময় মত, দোস্ত,' সাদা সুট জবাব দিল।

রানা নিরীহ সাধারণ মানুষ সাজার অভিনয় করছে, হঠাৎ অচেনা একটা বিপদে পড়ে সিটকে আছে ভয়ে। কিন্তু সিআইএ-র গর্ব চুপচাপ লোকটা যখন হাড় ভাঙার মত ঝাঁকি দিয়ে ওর একটা হাত ধরে মোচড় দিল, আকস্মিক ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল ও। তারপর দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করতে চেষ্টা করল, দেখল পিস্তলটা এখনও

বুকের ঠিক মাঝখানে তাক করা।

বাচাল ইংরেজ হাসল। 'গুলি করা হবে আরও অনেক পরে। তার আগে হাত-পা ভাঙা হবে। মানে যদি উল্টোপাল্টা কথা বলো। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'কানেকশনটা কী, তোমার সঙ্গে পরলোকগত মিস্টার চৌ মিনের?'

উত্তরে কিছু বলল না রানা, তার বদলে তীব্র ব্যথায় আবার চেঁচিয়ে উঠল। পিছন থেকে বক্সার লোকটা ওর হাতটা মুচড়ে শিরদাঁড়ার কাছে তুলে দিয়েছিল।

'এটা হুশিয়ারি,' সামনে থেকে বলল সাদা কোট। 'তুমি যাতে আজেবাজে কথা বলে অযথা সময় নষ্ট না করো। কানেকশনটা কী?'

'চৌ মিন আমাকে একটা চালান বেচতে চেয়েছিল,' কোন রকমে বলল রানা, ব্যথায় এখনও অন্ধকার দেখছে চোখে।

'এই তো, কী সুন্দর মূল প্রসঙ্গে চলে আসছি আমরা। কীসের চালান, মিস্টার সম্ভব?'

'ডায়মন্ড। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডায়মন্ড।'

'তুমি বোকামি করছ, মিস্টার সম্ভব,' বলল সাদা কোট। 'আরও খারাপ লাগছে এইজন্যে যে তুমি নিজের চেয়েও বড় বোকা মনে করছ আমাকে।' রানাকে ছাড়িয়ে সঙ্গীর দিকে ছুটল তার দৃষ্টি। 'এবার দুটো হাতই, দোস্ত।' এক পা এগিয়ে এল সে, পিস্তলটার ট্রিগারে আঙুল শক্ত করে পেঁচাল।

হাত দুটো ধরে আবার ঝাঁকি দিল বক্সার।

এবার জ্ঞান হারাবার মত অবস্থা হলো রানার। প্রচণ্ড ব্যথায়

বমি পাচ্ছে।

‘এবার বসে বসে হাঁটো, মিস্টার সম্ভব। ঠিক একটা হাঁসের মত।’

সিআইএ-র সাদা টাই লাথি মেরে বেঞ্চ থেকে মেঝেতে ফেলে দিল রানাকে। হাত দুটো পিঠে সেঁটে থাকায়, ওর পক্ষে সিধে হওয়া সম্ভব নয়।

ভাঁজ করা পায়ে, হাঁসের হেঁটে যাবার ভঙ্গিতে, সামনে এগোতে বাধ্য করা হচ্ছে ওকে। ধীরে ধীরে পিস্তলটার কালো মাজলের দিকে এগোচ্ছে ও।

ওর এই আড়ষ্ট ভঙ্গি আর কষ্ট দারুণ উপভোগ করছে সাদা কোট। ‘তুমি বেশ লম্বা তো, পজিশনটা তাই খুব মানাচ্ছে।’ তারপর সাদা টাইকে বলল, ‘ওকে ওখান থেকে ওদিকটায় নিয়ে যাও।’ হাত তুলে শেষ প্রান্তের উত্তপ্ত কিউবিকলটা দেখাল।

এক মুহূর্ত পর হঠাৎ রানার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল, কারণ বুঝতে পেরেছে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওকে। সরাসরি ইলেকট্রনিক হিটিং গ্রিড-এর দিকে এগোচ্ছে ও, যেখান থেকে সনা-র তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

একটা টোস্টারের ভিতরটা যেমন হয়, এটার মেকানিজম সেরকম দেখতে। এক ঝাঁক ধাতব কয়েল আগে থেকেই প্রচণ্ড উত্তাপে টকটকে লাল। ইস্পাতের অবলম্বন দিয়ে গ্রিডটা ঘেরা, বাকি সব কিছুর সঙ্গে এটাও গরম আগুন হয়ে আছে বলে মনে হলো।

‘কী, মিস্টার সম্ভব? সহযোগিতা পাব? নাকি তুমি চাইছ আমরা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠি?’ জানতে চাইল বিআইবি, ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ।

‘বললামই তো, চৌ আমার কাছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডায়মন্ড বেচতে চেয়েছিল। ওগুলো সে তার লোকদের দিয়ে চুরি করায়...’

‘এ-সবে কাজ হবে না, সম্ভব।’ মাথা নাড়ছে সাদা কোট। ‘না, একদমই কাজ হবে না।’

ঘেমে সারা হচ্ছে রানা। ইলেকট্রিক গ্রিড থেকে আর বোধহয় ফুটখানেক দূরে ও, তবে আঁচটা এখনই অনুভব করতে পারছে।

‘আরেকটু সামনে বাড়াও ওকে,’ সিআইএ-কে বলল বিআইও। পিঠে তোলা রানার হাতে আরেকটু চাপ দিল সিআইএ।

আর ছয় ইঞ্চি দূরে ওটা। হিটিং ইকুইপমেন্টের লালচে আভা রানার ভুরু আর চোখের পাতা পুড়িয়ে দিচ্ছে। চুল পোড়ার কটু গন্ধ ধাক্কা মারল নাকে।

‘এখনও সময় আছে, মিস্টার সম্ভব। চৌ মিন সম্পর্কে কী জানো বলে ফেলো।’ হাসছে ইংরেজ। ‘দোস্ত, আরেকটু কাছে।’

আরেকটু কাছে? অসম্ভব, সেটা সহ্য করার মত হবে না! রানা সিদ্ধান্ত নিল, গুলি খাওয়ার ঝুঁকি নিয়েই পুড়ে মরার হাত থেকে বাঁচতে চেষ্টা করতে হবে ওকে।

এই সময় বাধা পেল ওরা। হঠাৎ করে সনার দরজা খুলে গেল। সন্দেহ নেই আরেকজন খদ্দের উঁকি দিচ্ছে ভিতরে, ফ্যাসিলিটিটা ব্যবহার করতে চায়—তবে অবশ্যই প্রচলিত নিয়মে বা প্রাপ্য সুবিধে সহ।

এই ডাইভারশানটাই দরকার ছিল রানার। সাদা কোট ঝট করে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল, তারপর দেখা গেল ভিতর থেকে তালা লাগাচ্ছে দরজায়। মনে মনে ‘রেডি, গো!’ বলে পিছন দিকে ডান পা চালাল রানা। সাদা টাইয়ের হাঁটুতে লাগল লাথিটা। হাড় হয়তো ভাঙেনি, তবে ব্যথায় গুঙিয়ে উঠে রানার হাত দুটো ছেড়ে

দিল সে।

কাজের সময় দেখা গেল সাদা সুট পিস্তলটাকে ব্যবহার করতে রাজি, কিন্তু ট্রিগারটাকে নয়। পিস্তলটা উল্টো করে ধরে রানার দিকে তেড়ে এল সে।

লাফ দিয়ে সিধে হলো রানা, এক পায়ে ভর দিয়ে খানিকটা ঘুরল, নড়াচড়ায় বিরতি না দিয়ে ফ্লাইং কিক মারল ইংরেজের পিস্ত ল ধরা হাতে।

পিস্তল উড়ল। লাথিটা থামেনি, লোকটার ঠিক চিবুকে আঘাত করল। বিদ্যুৎ-বেগে পিছনদিকে ঝাঁকি খেল মাথাটা।

মট করে গা রিরি করা একটা শব্দ শোনার আশায় ছিল রানা, তবে সেটা পূরণ হলো না। জড় কাটা গাছের মত সটান পড়ে গেল ইংরেজ। শুধুই জ্ঞান হারিয়েছে বলে মনে হয়।

ঠিক সেই মুহূর্তে পিছন দিকে ওর পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল সিআইএ। দু'হাত দিয়ে গলাটা পেঁচিয়ে ধরল সে। নখ সহ আঙুলগুলো ঢুকিয়ে দিচ্ছে উইন্ডপাইপে।

পিছন দিকে কনুই চালাল রানা। কিন্তু সিআইএ ছাড়ল না ওকে।

তার দুই কড়ে আঙুল মুঠোয় ভরার সময় ঘাড়ে গরম নিঃশ্বাস অনুভব করল রানা। লোকটার বাকি আঙুল ওর গলায় ডেবে যাচ্ছে, উইন্ডপাইপ ভেঙে ফেলবে। তবে সেটা ঘটার আগে তার আঙুল দুটো পিছনদিকে ঠেলে দিল রানা।

কানে মধু ঢেলে হাড় দুটো ভাঙল, একটার পর একটা। কিন্তু গোঁয়ার লোকটা তারপরও থামছে না। তার ব্যথা সহ্য করার ক্ষমতা দেখে রানা অবাক।

অকেজো দুই আঙুল ছাড়াই গলা টিপে রানাকে খুন করতে

চাইছে সাদা টাই। দুর্বোধ্য আওয়াজ বেরুচ্ছে মুখ থেকে, আসলে সবটুকু শক্তি ব্যবহার করায় কোত পাড়ছে।

রানাকে ধরে সামনে-পিছনে ঘন ঘন ঝাঁকাচ্ছে সে। পাশ থেকে পা চালিয়ে তার হাঁটুর ঠিক পিছনে লাথি মারল রানা। শরীরের নীচে পাটা ভাঁজ হয়ে গেল, সেই সঙ্গে ঢিল পড়ল রানার গলায়।

প্রথমটার পিছু নিয়ে ছুটল আরেকটা লাথি, এটার লক্ষ্য দ্বিতীয় হাঁটুর পিছন দিক।

এই মুহূর্তে টলছে লোকটা, অবশেষে রানাকে ছেড়ে দিয়ে জ্যাকেটের ভিতর হাত ঢোকাচ্ছে, বেগুনি পোকার মত ঝুলছে অকেজো আঙুল দুটো ।

'এই ব্যাটা, থাম!' হুঙ্কার ছাড়ল রানা, বাঁ হাত দিয়ে মারার ভঙ্গি করে চালাল ডান হাতটা।

এক ঘুসিতেই ছিটকে পড়ল বক্সার। তবে পিস্তলটা ছাড়েনি, বেরিয়ে আসছে পকেট থেকে। এগিয়ে এল রানা, লাথি চালাল পিস্তল ধরা হাতে।

পিস্তলটা ছিটকে পড়ল দূরে। ভাঙা আঙুলে লাথি লাগায় চোখে অন্ধকার দেখছে লোকটা। এক পা পিছু হটল রানা, তারপর আবার লাথি মারল—এবার লোকটার কপাল লক্ষ্য করে।

লাথি খেয়ে লোকটা কোন শব্দ করছে না। আবার পা চালাতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল রানা। সঙ্গীর মতই জ্ঞান হারিয়েছে লোকটা।

সাত

চৌ মিনের সম্ভাব্য হত্যাকারীর তালিকাটা এত বড় যে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর ধৈর্য হলো না রানার। হংকং ভার্সিটির মিউজিয়ামে ঢোকার সেই টিকিটের টুকরোটাই একমাত্র সূত্র ওর, কাজেই টার্কিশ বাথ থেকে বেরিয়ে আসার পঁচিশ মিনিট পর বোট নিয়ে হারবার পেরুতে দেখা গেল ওকে, শহরের আরেক অংশে যাচ্ছে।

জেটি থেকে ম্যান্ডারিন হোটেল হাঁটা পথে অল্প দূর, সেখান থেকে মিউজিয়ামের নিজস্ব বাস ছাড়ে। তিন ডলার দিয়ে টিকিট কেটে ওই বাসে চড়ে বনহ্যাম রোডে মিউজিয়ামের সামনে পৌঁছাল রানা।

তোই ওয়ান।

একটা মেয়ের নাম বলে মনে হচ্ছে। চৌ মিনের বোন? মা? প্রেমিকা, রক্ষিতা, স্ত্রী? রানার কোন ধারণা নেই। তবে আশা করল মিউজিয়ামটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কেউই হবে।

দালানটা তিনতলা। দ্রুত একবার সার্ভে করে আগ্রহ জাগানোর মত কিছু খুঁজে পাওয়া গেল না। প্রাচীন চিনা মৃৎশিল্প, চিনামাটির কাপ-পিরিচ আর ব্রোঞ্জমূর্তির বিপুল সমাবেশ রানার

কৌতূহলকে উসকে দিতে পারল না।

এখানকার সংগ্রহ খুব উন্নতমানের নয়, সাজানোও হয়েছে শৃংখলার প্রতি শ্রদ্ধা না দেখিয়ে। চৌ মিন এরকম একটা জায়গায় জিনিসটা লুকিয়ে রাখবে, বিশ্বাস করা যায় না।

মিউজিয়ামের একজন অ্যাটেনড্যান্ট রানাকে একটা কেসের দিকে ঝুঁকে থাকতে দেখল, দুটো কনুইই কাঁচ ছুঁয়ে আছে, চোখ দুটো আধবোজা, মন উড়ে গেছে অ্যান্টিক সিরামিক থেকে বহু দূরে।

কাঁধে একটা টোকা পড়তে বাস্তবে ফিরে এল রানা। সিধে হয়ে ধীরে ধীরে ঘুরল ও। চশমা পরা, পরিপাটি এক চিনা তরুণ সবিনয়ে হাসল, তার ইংরেজি স্পষ্ট এবং বিশুদ্ধ। 'প্লিজ, সার, কেসের ওপর ভর দেবেন না,' বলল সে, প্রায় ক্ষমা প্রার্থনার সুরে। 'অত্যন্ত পুরানো, ভঙ্গুর।'

'দুঃখিত,' বিড়বিড় করল রানা। ঘুরে আরেক দিকে চলে যাবে ছেলেটা, তার আগেই শুনিয়ে দিল প্রদর্শনীটা মুগ্ধ করেছে ওকে।

'আপনার ভালো লেগেছে?' ভারী খুশি দেখাল তরুণকে।

'দারুণ, দারুণ,' আবার বলল রানা। 'ব্যবসার কাজে হংকঙে প্রায়ই আসা হয়, কিন্তু এখানে এই প্রথম এলাম।'

'সত্যি দুঃখজনক!' বলল তরুণ। বলার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, যেন নিজের মায়ের মৃত্যুসংবাদ দিচ্ছে।

স্বভাবতই জিজ্ঞেস করতে হলো রানাকে–কেন, দুঃখজনক কেন?

'বিশেষ একটা প্রদর্শনী হয়ে গেল, আপনি সেটা মিস করেছেন।'

আগ্রহের আতিশয্যে বিরাট হয়ে উঠল রানার চোখ দুটো।

‘কই, শুনিনি তো!’

‘ওটা ছিল ভারী শিক্ষণীয় আর প্রেরণাদায়ক,’ জানাল তরুণ। ‘কিন্তু দুঃখের বিষয়, দু’দিন আগে প্রদর্শনীটা শেষ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, পরশুদিন।’

‘ঠিক কী ধরনের প্রদর্শনী ছিল ওটা?’

‘অমূল্য সম্পদ,’ বলল তরুণ, উচ্ছ্বসিত। ‘টাকা দিয়ে ওগুলোর মূল্যমান নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। পাঠানো হয়েছে মেইনল্যান্ড, বেইজিংয়ের মিউজিয়াম অভ চাইনিজ হিস্টরি থেকে।’

‘কপাল খারাপ, তা না হলে কি মিস করি,’ সখেদে বলল রানা, এখনও তরুণের কাছ থেকে তথ্য আদায়ের চেষ্টা চালাচ্ছে। ‘ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই সব আবার বেইজিঙের পথে রওনা হয়ে গেছে?’

সবেগে মাথা নাড়ল অ্যাটেনড্যান্ট, ফলে চশমাটা পিছলে নাকের ডগায় নেমে এল। সেটাকে ঠেলে উপরে তুলল সে। ‘না, বেইজিঙে নয়। ওগুলো মায়ানমারে যাচ্ছে। গেছেন ওখানে?’

মাথা ঝাঁকাল রানা। ‘ইয়াঙ্গুনে গেছি।’

‘আপনি সত্যি ভাগ্যবান, দুনিয়ার কত জায়গায় গেছেন। তো প্রদর্শনীটা এখন ইয়াঙ্গুনে চলছে, সাংস্কৃতিক আর শুভেচ্ছা বিনিময় চুক্তির আওতায়…’

‘দেখা যাচ্ছে শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে আপনার প্রচুর আগ্রহ, খবর-টবর ভালোই রাখেন,’ বলল রানা। ‘আমি এক মহিলা সম্পর্কে জানতে চাই, আপনাদের এই লাইনেরই কেউ হবেন বোধহয়…’

‘নামটা কী বলুন তো?’

‘তোউ ওয়ান। বলতে পারেন কে সে, কীভাবে আমি তার

সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি?'

'তোউ ওয়ান?' বিড়বিড় করল তরুণ, ব্যাকব্রাশ করা কালো চুল এত জোরে চুলকাতে শুরু করল, যেন খুলির ঠিক নীচেই লুকিয়ে আছে উত্তরটা। 'না, তাকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে চিনি না,' বলল বটে, অথচ মৃদু শব্দে হাসছে।

এর মধ্যে হাসির কী আছে বুঝতে পারছে না রানা। 'আপনি চেনেন না, কিন্তু অন্য কেউ?' জিজ্ঞেস করল ও।

অ্যাটেনড্যান্ট মাথাটা একদিকে কাত করে নিঃশব্দে কয়েক সেকেন্ড দেখল রানাকে। তারপর ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটল। 'আপনি সিরিয়াস? আমার সঙ্গে কৌতুক করছেন না তো?'

'না,' বলল রানা। ছোকরার প্রতিক্রিয়া দেখে নিজেকে বোকা বোকা লাগছে ওর। 'আমি সিরিয়াস। কেন আপনার মনে হলো আমি কৌতুক করছি?'

'মনে হলো, কারণ তোউ ওয়ান মারা গেছে,' জবাব দিল তরুণ।

'মারা গেছে? কবে মারা গেল?'

'সে তো দু'হাজার বছর বা তারও আগে, সার!' বলল সে, তারপরই গলা ছেড়ে হেসে উঠল।

জানা কথা, তোউ ওয়ানের সাধ্য নেই সাহায্য করে রানাকে।

এক মুহূর্ত পর হঠাৎ করেই থেমে গেল মিউজিয়াম অ্যাটেনড্যান্টের হাসি, বোঝা গেল ভয় পাচ্ছে রানা না আবার তার আচরণে অপমান বোধ করে। 'সার, প্লিজ, কিছু মনে করবেন না,' বলল সে। 'কিন্তু আপনার প্রশ্নটা...যে শুনবে সেই হেসে খুন হবে। আসলে, সার, তোউ ওয়ান ছিল হান সাম্রাজ্যের রাজকুমারী। মারা

গেলে, দু'হাজার বছরেরও আগে, তোউ ওয়ানের মৃতদেহ আর্মার সুটে রাখা হয়...হ্যাঁ, জিনিসটাকে তাই বলা উচিত। ওটা জেড দিয়ে তৈরি। আপনি জেড পাথর সম্পর্কে জানেন?'

মাথা নাড়াল রানা। জানে না।

'মনে করা হত জেড পাথরের ভেতরে রাখলে মানুষের শরীর অবিকৃত থাকে–চিরকাল। আসলে তা সত্যি নয়, তবে এটাই বিশ্বাস করত তোউ ওয়ান আর তার রাজ পরিবার। কাজেই আপনি যখন জিজ্ঞেস করলেন আমরা কেউ তাকে চিনি কিনা, হাসি পেয়ে গেল, কারণ এতদিনে তার এমনকী ধুলো পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই।'

'তারমানে এই জেড...এক ধরনের কাফন–?'

'একটা সুট, মৃত্যুর পর পরানো হয়, হ্যাঁ,' বলল অ্যাটেনড্যান্ট, মাথাটা ঘন ঘন উপর-নীচে ঝাঁকাচ্ছে।

'জেডের তৈরি এই কাফন বা সুটটাও বেইজিং থেকে পাঠানো হয়েছিল প্রদর্শনের জন্যে?'

আবার উপর-নীচে মাথা ঝাঁকাল অ্যাটেনড্যান্ট। 'সমস্ত কালেকশানের মধ্যে ওটাই সবচেয়ে মূল্যবান, সার,' বলল সে। 'নির্ভেজাল সোনার তারে জড়ানো আছে অসংখ্যা জেড পাথর। শোনা যায় ওটা তৈরি করতে দশ বছর সময় লেগেছিল...'

ট্যাক্সি নিয়ে ফেরিঘাটে ফেরার সময় রানা ভাবছে, ক্লু ধরে এগোতে হলে চাইনিজ আর্টিফ্যাক্ট অনুসরণ করে মায়ানমারে ঢুকতে হয় ওকে।

একটাই নিরেট ক্লু আছে ওর কাছে, আর সেটা হলো তোউ ওয়ানের ওই সর্বশেষ পরিচ্ছদ–জেড সুটটা। কিছু পাক বা না

পাক, দু'হাতে নিয়ে জিনিসটা ভালো করে পরীক্ষা না করা পর্যন্ত শান্তি নেই ওর। তার আগে পর্যন্ত বোঝারও কোন উপায় নেই যে এটা ফলস্ ট্রেইল কিনা।

সময় কম, যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে রানাকে। কমন সেন্স সাবধান করে দিল, সিআইএ আর বিআইবি খুব একটা পিছিয়ে থাকবে না।

প্রথম কাজ মায়ানমার কনসুলেট থেকে একটা এন্ট্রি ভিসা সংগ্রহ করা। ট্যাক্সি ড্রাইভার জানে ঠিক কোথায় নামিয়ে দিতে হবে ওকে–ফেরির কাছাকাছি একটা চৌরাস্তায়।

ভাগ্যগুণে কনসুলেট বন্ধ হবার ঠিক আগে পৌঁছাল রানা। ফর্মগুলো ঝটপট পূরণ করল ও।

'আটচল্লিশ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে,' ইনফরমেশন ডেস্কের পিছনে বসা বার্মিজ মেয়েটা বলল ওকে।

ঝলমলে হাসি দিয়ে ওকে জাদু করার চেষ্টা করল রানা। 'কোনভাবে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সারা যায় না?'

'আমাদের নিয়ম খুব কড়া,' বলল তরুণী, গর্বের সুরে। 'শিথিল করার উপায় নেই। আরেকটা কথা মনে করিয়ে দিই, মায়ানমারে আপনি মাত্র এক হপ্তা থাকতে পারবেন। সাতদিন, কোনমতে তার বেশি নয়।'

'কেন, মেয়াদ কি বাড়ানো যাবে না?'

'মায়ানমারে আপনি যেতে চাইছেন কেন, সার?' প্রশ্ন করল মেয়েটা, চোখে সন্দেহের দৃষ্টি।

'ওখানে লেখা আছে,' ফর্মের দিকে আঙুল তাক করল রানা। 'ট্যুরিজম,' মুক্তোর মত ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসল।

'একটা দেশ দেখার জন্যে সাতদিন যথেষ্ট সময়। একজন

বিদেশীকে তো আর সব জায়গায় যেতে দেয়া হয় না,' রানার পাসপোর্টের সঙ্গে ফর্মটা ক্লিপ দিয়ে আটকাল সে, তারপর নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল

পরদিন সকালের কাগজে খবরটা দেখল রানা।

মিন ভাইদের অভিহিত করা হয়েছে 'টপ সিক্রেট ইনফরমেশন-এর চোরাকারবারী' বলে। এই চোরাকারবারীদের মূল হেডকোয়ার্টার হংকঙের কাউলান-এ। কাল দুপুরের দিকে অজ্ঞাতপরিচয় একদল সন্ত্রাসী সেখানে ঢুকে প্রথমে ভাঙচুর চালায়, তারপর সাততলা ভবনটার নীচতলায় আগুন ধরিয়ে দেয়।

আগুন অবশ্য ছড়িয়ে পড়ার আগেই নিভিয়ে ফেলা হয়েছে। তবে পুলিশের বক্তব্য থেকে জানা গেছে তিনটে ফ্লোরের সমস্ত ফার্নিচার আর কাগজ-পত্র পুড়ে গেছে, মিন ভাইদের পাঁচজন স্টাফও অল্প-বিস্তর আহত হয়েছে, তবে ভাগ্যক্রমে মারা যায়নি কেউ।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য মিন ভাইদের খুঁজছে তারা।

খবরটা কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে।

একই কাগজের শেষ পৃষ্ঠায় দেখা গেল মিনদের আরেকটা খবর। চৌ মিনের লাশের গলাকাটা ছবিটা যেন লাফ দিয়ে উঠে এল রানার চোখে। ছবির নীচে ছোট্ট খবর। হেডিংটা এরকম–চোরাই তথ্যের ব্যবসায়ী চৌ খুন!

খবরে বলা হয়েছে, পাঁচজন বডিগার্ডকে সঙ্গে নিয়ে হাংরি গোস্ট নামে একটা টার্কিশ বাথে গিয়েছিল চৌ, গভীর রাতে খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে তার লাশ দেখতে পায়। তার পাঁচ বডিগার্ডের

একজনকেও কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

দুটো খবরের কোনটাতেই থৌ মিন সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলা হয়নি।

রানা ওর হোটেল চায়না আনলিমিটেডে বসেই ইয়াঙ্গুন শেরাটন-এর একটা স্যুইট বুক করল। তবে পাসপোর্ট না থাকায় প্লেনের টিকিট কাটা গেল না।

হাতে একটা দিন সময় আছে, তাই রানা সিদ্ধান্ত নিল পার্ল নদীর মোহনা অর্থাৎ ম্যাকাও থেকে একবার বেড়িয়ে আসবে। দ্রুতগামী জলযান হাইড্রোফয়েল-এর একটা টিকিট কেটে রাখল।

যত ভাবছে ততই মায়ানমারে যাবার যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে রানা। অত দামী একটা জিনিস নিজের কাছে অবশ্যই রাখেনি চৌ মিন। তার হয়তো বেইজিং মিউজিয়ামের কারও সঙ্গে পরিচয় ছিল, কিছু টাকা দিয়ে কাজে লাগিয়েছে লোকটাকে।

চিন থেকে মাইক্রোফিল্মটা বের করে আনার জন্য হান সাম্রাজ্যের আর্টিফ্যাক্ট প্রদর্শনীকে ব্যবহার করার চিন্তাটা সত্যি দারুণ।

স্টার ফেরি পেরিয়ে হংকং লাইব্রেরিতে চলে এল রানা, তোউ ওয়ান সম্পর্কে আরও তথ্য দরকার ওর। ট্যাক্সিতে বা ফেরিতে থাকার সময় ভালো করে দেখে নিয়েছে—কেউ ওর পিছু নেয়নি।

তোউ ওয়ান-এর জেড কফিন-সুট প্রথম আবিষ্কার হয় মাঞ্চও'য়েং শহরে, উনিশশো আটষট্টি সালে। শহরটা বেইজিং থেকে বেশি দূরে নয়। মাটি খুঁড়ে পাওয়া যায় একাধিক চেম্বার সহ একটা সমাধি।

আসলে পাওয়া গিয়েছিল দুটো বেরিয়াল স্যুইট, দ্বিতীয়টা ছিল লিউ শেঙ-এর। লিউ শেঙ ছিলেন তোউ ওয়ান-এর স্বামী, হান

সম্রাট উ-র সৎভাই।

চিনা আর্কিওলজিস্ট আর আর্ট এক্সপার্টরা প্রাচীন কারিগরদের তৈরি দু'হাজার একশো ছাপান্নটা জেড পাথর বসানো সোনার পাত নতুন করে সাজিয়ে দেন, কারণ তু ওয়ান-এর ধারণা মিথ্যে প্রমাণ করে কালের আঁচড়ে ভেঙে পড়েছিল ওগুলো।

রানার ভাগ্যটা ভালোই বলতে হবে। একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা পেয়ে গেল ও, হাতের কাছেই পড়ে ছিল, তাতে প্রাচীন চিনা আর্টিফ্যাক্ট প্রদর্শনী সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট করা হয়েছে। শুধু তোউ ওয়ানের জেড সুট নয়, প্রদর্শনীতে জায়গা পেয়েছে সব মিলিয়ে তিনশো পঁচিশটা আর্টিফ্যাক্ট। এগুলোর সবই উনিশশো নব্বুইয়ের আগে খুঁজে পাওয়া গেছে।

তবে সুটটার ব্যাপারেই বেশি আগ্রহী হতে দেখা গেল রানাকে। কিছু আর্ট ট্রেজার-এর রঙিন ছবিও ছাপা হয়েছে পত্রিকাটিতে। তার মধ্যে জেডের তৈরি কফিন-সুটটাও আছে।

জিনিসটা দেখতে হুবহু যেন একটা মানুষের শরীর, দেখামাত্র চেনা যায় কাঠামোটা–হাত-পা থেকে শুরু করে নাক-কান পর্যন্ত সবই আছে, এমনকী শক্ত করা মুঠোও।

গিল্ড করা ব্রোঞ্জের হেডরেস্ট তোউ ওয়ানের শেষ শয্যায় বালিশ হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে। তার প্রতিটি হাতের সামনে শোভা পাচ্ছে জেডের তৈরি অর্ধচন্দ্র। পাশে নীলচে-সবুজ জেড ডিস্ক–একজোড়া ডান পাশে, আরেক জোড়া বাঁ পাশে। ওগুলোকে পাইচও বলে, স্বর্গের প্রতীক। মর্ত্যলোকে প্রশ্রয় আর সম্মান পেয়েছে সে, কাজেই সন্দেহ কী স্বর্গেও রাজকীয় অভ্যর্থনা পাবে; এ-ও নিশ্চিত যে এই বেরিয়াল সুট তার ইহজাগতিক মরদেহটাকে চিরকাল সংরক্ষণ করবে।

তবে সমাধিটা প্রথম যখন খোলা হয়, তার জাগতিক উপস্থিতি বলতে অবশিষ্ট ছিল এক মুঠো ধুলো মাত্র, তারচেয়ে কম বা বেশি কিছু নয়।

পত্রিকাটা রেখে দিল রানা।

আরেকটা দিন পার হলো।

পরদিন সকালে হাইড্রোফয়েলে চড়ে চল্লিশ মাইল পাড়ি দিচ্ছে রানা, সময় লাগবে ঘণ্টা দেড়েকের কিছু বেশি। হংকঙের পশ্চিমে ম্যাকাও মাথাচাড়া দিয়ে আছে পার্ল নদীর মুখে।

ভারী সুন্দর আবহাওয়া। সাগর যেন গাঢ় নীল কাঁচ। আপার ডেকের একটা সিটে বসেছে রানা, অপেক্ষা করছে হাইড্রোফয়েল কখন হারবার ছাড়বে।

হাইড্রোফয়েল তখনও ছাড়েনি, হঠাৎ ওর পাশের খালি সিটটা রূপ-লাবণ্যের বিপুল সম্পদে ভরাট হয়ে গেল।

বয়স হবে পঁচিশ কি ছাব্বিশ; পিঠে জোড়া কালকেউটের মত বেণী, নিচু হিল লাগানো জুতো, পরনে কাশ্মীরী সালোয়ার-কামিজ। হাত দুটো কোলের উপর, ব্যাগটা এখনও কাঁধ থেকে ঝুলছে। নেইলপালিশ না লাগানো নখ ছোট করে কাটা, যেন খুব কাজের মেয়ে, সব সময় ব্যস্ত।

যতই সাধারণ থাকার চেষ্টা করুক, সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছে তার দেহসৌষ্ঠব আর তুলনারহিত রূপ।

এই মেয়ে পাশে বসলে যে-কোন পুরুষ নেশাগ্রস্ত হবে। রানা ভাবল, মেয়েটা জানে, তা সত্ত্বেও ওকে কথাটা বলা উচিত যে তুমি সুন্দরী, তা না হলে যেন এই সৌন্দর্যকে যথাযোগ্য সম্মান জানানো হয় না।

বলল রানা; বলল ষোলো আনা ভব্যতা বজায় রেখে,

সংক্ষেপে, যতটুকু পারা যায় মার্জিত বিনয়ের সঙ্গে।

আরেকদিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল মেয়েটি, 'ধন্যবাদ।' ঠোঁট জোড়া নিশ্চয় লজ্জাতেই একবার কেঁপে উঠল। দেখে মনে হলো মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইছে, কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে সে নিজেই–তার দ্বিতীয় সত্তা নিজেকে প্রকাশ করতে আকুল, লুকাতে নয়।

'হংকঙে এবারই প্রথম?' জিজ্ঞেস করল রানা। জ্যাকেটের পকেটে হাত ভরে ছোট আকৃতির একটা বিনকিউলার বের করল।

'হ্যাঁ।'

অবশেষে ডক থেকে রওনা হলো ওরা। সিটে হেলান দিয়ে পায়ের উপর পা তুলল রানা, তারপর চোখে বিনকিউলার। হাইড্রোফয়েলকে অন্য কোন জলযান অনুসরণ করছে না, নিশ্চিত হয়ে বিনকিউলারটা নামাল।

বেশ কিছু প্যাসেঞ্জারকে হাইড্রোফয়েলে চড়তে দেখেছে রানা, তাদের মধ্যে সিআইএ বা বিআইবি-র সেই লোক দু'জন নেই। তবে ওর আগে পৌঁছে কোথাও যদি গা ঢাকা দিয়ে থাকে, সেটা আলাদা কথা।

'আমি বোধহয় নিজের পরিচয় দিইনি। শ্রীলঙ্কান, কুমার সম্ভব।' হাতটা বাড়াল রানা।

দ্বিধায় ভুগল মেয়েটা, তবে মাত্র দু'সেকেন্ডের জন্য। তারপর নিজের হাতটা ধরতে দিল রানাকে। তার আঙুল নরম, উষ্ণ, তালু সামান্য ভেজা ভেজা। 'নন্দিনী অপরূপা,' বলল সে; একটু যেন লালচে হলো মুখ, ধরা যায় কি যায় না।

'নন্দিনী?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'অপরূপা?'

মাথা ঝাঁকাল সে।

'মানুষটার মত, নামটাও সুন্দর।' কয়েক সেকেন্ড পর আবার বলল রানা, 'ধন্যবাদ।'

'ধন্য...কেন?' কৌতূহলী হলো মেয়েটা, তবে তারচেয়ে বেশি বোধহয় বিস্মিত।

'কোন কারণ নেই, আবার কারণের কোন অভাবও নেই। আপনি আমার যুগে জন্মেছেন, শুধু এ-কারণেও ধন্যবাদ পেতে পারেন।'

'সেটা কী অপাত্রে দান হয়ে যাবে না? আপনার ধন্যবাদ যাঁদের পাওনা তাঁরা তো কোলকাতায়।'

'ওখান থেকেই আসছেন আপনি? ভারতীয়?' এবার ভাঙা ভাঙা বাংলায় প্রশ্ন করল রানা।

'হ্যাঁ। এদিকটা এত...এত...' হাতটা অসহায় ভঙ্গিতে তার সামনে ঢেউ তৈরি করছে।

'অন্যরকম?'

'শুধু অন্যরকম নয়। ইগজটিক। এত সুন্দর, অথচ আগে আসা হয়নি–আমার গবেষণার সাবজেক্ট প্রচুর থাকা সত্ত্বেও।'

একদিকে একটু কাত হয়ে বসল নন্দিনী, নিজেকে আরেকটু আরাম দেওয়ার ইচ্ছে। সন্দেহ নেই, দাঁড়ালে এই মেয়ে পাঁচফুট ছয় ইঞ্চির কম হবে না।

অপলক দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ করছে রানা, বোঝার চেষ্টা করছে কালো দীঘল চোখের পিছনে কী আছে। নিরীহ শব্দটাই বারবার ফিরে এল রানার মাথায়, আর কোন শব্দ সুযোগই পাচ্ছে না। 'আপনি বোধহয় সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্রী বা গবেষক?' জিজ্ঞেস করল রানা।

হেসে উঠল নন্দিনী অপরূপা। 'না! আমি আর্কিওলজির ছাত্রী।'

হঠাৎ রানার দিকে একটু ঝুঁকল। 'ভালো কথা, সিংহলী হয়ে বাংলা শিখলেন কেত্থেকে?'

'কিছু দিন কোলকাতায় ছিলাম,' বলল রানা। 'আর্কিওলজি... সিরিয়াস সাবজেক্ট, ভাই। হেনরিক শ্লিম্যানের শিষ্যা, কেমন?'

ভদ্রলোক জার্মান আর্কিওলজিস্ট ছিলেন, প্রতিজ্ঞা করেছিলেন হোমারের লেখা মহাকাব্য ইলিয়াডে যে ট্রয় নগরীর কথা বলা হয়েছে সেটা তিনি আবিষ্কার করে ছাড়বেন। তুরস্কে একে একে নয়টা প্রাচীন নগরী খুঁজে পান তিনি, তার মধ্যে একটাকে তিনি ট্রয় বলে দাবী করেন।

পরে প্রমাণ হয়, ওটা ট্রয় নগরী নয়, তারচেয়েও এক হাজার বছরের পুরানো একটা শহর।

নন্দিনী অন্যমনস্ক হয়ে দূরে তাকিয়ে আছে, রানার প্রশ্ন যেন শুনতে পায়নি।

'হারিয়ে গেলেন নাকি?' কৌতুক করল রানা।

যেন হঠাৎ স্বস্তি পেয়ে হালকা বোধ করছে নন্দিনী, বলল, 'আমি আসলে পেগান-এ যাবার পথে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি, মোন ধ্বংসাবশেষকে নিয়ে ফিল্ড রিসার্চ করব। খুবই নাকি ইন্টারেস্টিং সাইট। শুনেছেন নাকি, মিস্টার...?'

'সম্ভব,' নামটা মনে করিয়ে দিল রানা। 'হ্যাঁ, শুনেছি। সেন্ট্রাল মায়ানমারে, তাই না?'

'হ্যাঁ। খুবই ছোট একটা জায়গা, কিন্তু প্রত্ন-নিদর্শনে ঠাসা। পাঁচ হাজার মনুমেন্ট, সমাধি ইত্যাদি। ওখানে আমার কাজ আমাকে ডক্টরেট পেতে সাহায্য করবে।'

ঠিক যেমন সন্দেহ করছে রানা, মোটেও সাধারণ একটা ট্যুরিস্ট মেয়ে নয় সে। একে ডানাকাটা পরী, তার উপর

উচ্চশিক্ষিতা, তারও উপর বঙ্গললনা–কাজেই সহজে তাকে হারাতে রাজি নয় ও।

তবে ও-ও যে মায়ানমারেই যাবে, কথাটা তাকে জানাল না। কিছু ব্যাপার প্রকাশ না করাই স্বাস্থ্যের জন্য ভালো, বিশেষ করে এসপিওনাজে।

'মায়ানমার,' বলল রানা, মাথাটা নাড়ছে যেন তাজ্জব হয়ে পড়ায়। 'সে তো বহুদূর, রে, ভাই। কতদিন থাকবেন ওখানে?'

'পাঁচ হপ্তা,' বলল নন্দিনী। তারপর সে ব্যাখ্যা করল–মায়ানমার সরকার বিশেষ ভিসা ইস্যু করেছে তাকে, যেহেতু স্থানীয় আর্কিওলজিস্টদের সঙ্গে কাজ করবে সে। 'সব কিছু ঠিকঠাক মত গুছিয়ে আনতে প্রায় এক বছর সময় লেগেছে আমার। ক্যানডিডেট ছিল সাতজন, তাদেরকে আমার পিছনে ফেলতে হয়েছে, তারপর পারমিশন যোগাড় করা–উফ্। এখন যখন ব্যাপারটা ঘটতে চলেছে, মনে হচ্ছে যেন একটা ঘোরের মধ্যে আছি আমি,' হঠাৎ আবেগের রাশ টেনে ধরে নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসল মেয়েটা। 'জানি না অনুভূতিটা ঠিক এক্সপ্রেস করতে পারলাম কিনা।'

'এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়,' বলল রানা। 'বেড়াতে বেরুলে আশ্চর্য সব অনুভূতি হয় মানুষের।' পরিচ্ছদের মত নিজের শরীরে লেগে থাকা শুকনো ক্ষতগুলোর কথা ভাবল রানা, যেন ব্যাগেজ হিসাবে দুনিয়ার এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত বয়ে বেড়াচ্ছে। 'তবে আমি জানি সময়টা আপনার ভালোই কাটবে।'

'আশা করি।' সামনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে মৌনব্রত অবলম্বন করল নন্দিনী।

ব্যাপারটা ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে আসছে, রানাসুলভ জাদু

দেখিয়ে মেয়েটাকে দ্রুত পটিয়ে ফেলার কোন সম্ভাবনা নেই। তবে তার মানে এই নয় যে হাল ছেড়ে দেবার কথা ভাবছে ও।

নন্দিনীর লাজুক ভাব ওর জন্য একটা চ্যালেঞ্জ, আর যতই তাকে দেখছে ততই তার রক্ষণশীলতার মুখোশ ভেঙে আসল নন্দিনীকে বের করে আনার জিদটা প্রবল হয়ে উঠছে ওর ভিতরে। কারণ মায়ের শেখানো আচরণবিধি মেনে চলা নন্দিনীকে দিয়ে ওর কাজ হবে না।

তাকে হাসাতে চেষ্টা করে সফল হলো রানা যাত্রার একেবারে শেষ মাথায় পৌঁছে। তবে ব্যক্তিগত গাইড হবার প্রস্তাবটা যখন মেনে নিল নন্দিনী, রানার মনে হলো সবচেয়ে বড় বাধাটা পার হওয়া গেছে।

হাইড্রোফয়েল থেকে হাত ধরে তাকে দ্বীপটায় নামাল রানা, হাতছানি দিয়ে একটা রিকশা ডেকে বসতে সাহায্য করল।

রানার আচরণ দেখে মনে হতে পারে, নন্দিনী যেন ভারতের কোন রাজকুমারী, আর ও নিজে দ্বীপটার মালিক—ব্যক্তিগত আগ্রহ থাকায় রাষ্ট্রীয় সফরে আসা অতিথিকে সবকিছু ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে।

নন্দিনীকে নিয়ে কৃত্রিম গুহায় ঢুকল রানা, ম্যাকাওয়ের সবচেয়ে বিখ্যাত ল্যান্ডমার্ক সেন্ট পল-এর ধ্বংসাবশেষ দেখার জন্য লাইনে দাঁড়াল, তারপর লম্বায় এশিয়ার আট নম্বরে থাকা টাওয়ারটায় উঠে পঞ্চান্ন মাইল পর্যন্ত চোখ বুলাল, দুপুরে লাঞ্চ খেলো চায়না আনলিমিটেড-এর ম্যাকাও শাখার রেস্তোরাঁয়, তারপর একটা ক্যাসিনোয় ঢুকে পাঁচশো ডলার দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করল দু'জনের।

এত কিছুর পর এখন রানা আশার আলো দেখতে পাচ্ছে। একটু একটু করে বদলানো গেছে মেয়েটাকে। নন্দিনীর লাজুক,

আড়ষ্ট ভাব অনেকটাই কেটে গেছে। এমনকী চোখে চোখ রেখে মাঝে মধ্যে হাসছেও সে।

'সত্যি,' ক্যাসিনো থেকে হাজার ডলার জিতে বেরিয়ে আসার পর বলল নন্দিনী, 'দিনটা আমার জীবনে মজার একটা অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে। এত আনন্দ কখনও পাইনি, মিস্টার কুমার।'

'একটু আগে মিস্টার বলোনি,' মনে করিয়ে দিয়ে হেসে উঠল রানা।

ওর সঙ্গে নন্দিনীও।

ম্যাকাওয়ের অভিজাত এলাকার ফুটপাত ধরে পরস্পরের হাত ধরে হাঁটছে ওরা, রাস্তা দিয়ে টুং-টাং বেল বাজিয়ে রিকশা চলছে।

'তোমার মজার অভিজ্ঞতা এখনও শেষ বা পুরো হয়নি,' নন্দিনীকে বলল রানা। 'আজ রাতে কেউ যদি তোমাকে ডিনার খাওয়াতে চায়?'

'শুধু ডিনার, আর কিছু নয় তো?' জিজ্ঞেস করল সুন্দরী অপরূপা, কুমারীসুলভ ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে ওঠার পর।

'ঈশ্বরের দিব্যি,' কথা দিল রানা, এমনকী চোখ তুলে আকাশের দিকেও তাকাল একবার।

কামড়ানো ঠোঁটের কোণে দুষ্ট হাসি নিয়ে মাথা ঝাঁকাল নন্দিনী। 'ঠিক আছে, তবে একটা শর্তে—তুমি রাবণ হতে চেষ্টা করবে না।'

'প্রশ্নই ওঠে না, যেহেতু তুমি সীতা নও,' বলে একটা গাছের তলায় দাঁড়াল রানা, নন্দিনীকে একটু কাছে টানল।

যতটা টানল, তারচেয়ে বেশি কাছে সরে এল নন্দিনী। সাধারণত প্রায় সব মেয়ের ক্ষেত্রেই এটা ঘটতে দেখা যায়। মন থেকে সায় থাকলে ঢলে পড়ার একটা প্রবণতা চলে আসে।

রানাকে ধরে প্রায় ঝুলে পড়তে যাচ্ছে নন্দিনী। বুঝতে পেরে না ঘাবড়ালেও, সতর্ক হয়ে গেল ও। চোখ তুলে তাকাল সে, দৃষ্টিতে দেরি করছে বলে অভিমান, ঠোঁট জোড়া আরেকটু ফাঁক হয়ে গেল। এই অবস্থায় একটা মেয়েকে প্রত্যাখ্যান করাটা মাসুদ রানার অভিধানে রীতিমত অপরাধ। কাজেই চুমোটা খেতে হলো।

'না, এখানে নয়,' নন্দিনী যেন গোঙাচ্ছে, একই সঙ্গে উত্তেজনায় অবশ, আবার নিজের আচরণে বিব্রত।

তারপর দেখা গেল রানার কাঁধে মাথা রেখে শান্ত পায়ে অপেক্ষারত হাইড্রোফয়েলের দিকে হাঁটছে মেয়েটা। ডকে গিজ গিজ করছে ট্যুরিস্ট আর স্থানীয় চিনা, তবে রিটার্ন টিকিট থাকায় নিজেদের সিট ফিরে পেতে ওদের কোন অসুবিধে হলো না।

দক্ষিণ চিন সাগর চঞ্চল হয়ে উঠেছে, প্রতিটি ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফেনা দেখা গেল; পানির রঙ এখন মরচে ধরা লোহার মত। হারবার থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল হাইড্রোফয়েল। রানার কাঁধে মাথা রেখে চোখ বুজল নন্দিনী।

'আনন্দ-উত্তেজনা একটু বেশি হয়ে গেছে,' তার কানে ফিসফিস করল রানা। 'রক্ষণশীল ভারত থেকে মেয়েটাকে বের করে আনা যায়, কিন্তু মেয়েটার ভেতর থেকে ভারতকে বের করা সম্ভব নয়।'

কোন মতামতই দিল না নন্দিনী, এরইমধ্যে আধো ঘুমে চলে গেছে।

সব মিলিয়ে, এর বেশি আর কিছু চাইতে পারে না রানা। সারাদিনের চেষ্টায় পাগল করা এক সুন্দরী নারীর জড়তা ভেঙে দিয়েছে। তাকে নিয়ে এখন বহু রঙা গোপন স্বপ্ন দেখতে আর কোন বাধা নেই।

সন্ধ্যা, এবং তারপর রাতটা, কীভাবে কাটাবে ভাবছে রানা। এই সময় কিছু একটা–আসলে কেউ একজন–প্রথমে ওর দৃষ্টিপথে, তারপর ওর চিন্তায় ঢুকে পড়ল।

প্রথমে অস্বস্তিকর একটা সচল ছায়া, তারপর সেটাকে নিয়ে অশুভ একটা আশঙ্কা। ঝট করে তাকাবার ইচ্ছেটাকে দমন করল রানা। চোখের কোণ দিয়ে একজন প্যাসেঞ্জারকে দেখতে পেল–চেহারায় কোন বৈশিষ্ট্য নেই, শুধু সরু করা নীল চোখে অনুসন্ধানী দৃষ্টি। সে দৃষ্টি ওর দিকেই তাক করা। কোন ভদ্রলোক এভাবে কারও দিকে তাকায় না। এই ছিল, তারপরই আর নেই।

এ-সব তোমার কল্পনা, নিজেকে বলল রানা। দিনটা নষ্ট করার মত কিছুই ঘটেনি বলে চোখ দুটো তোমার সঙ্গে খেলছে।

তবে না, এ-ধরনের সহজ ব্যাখ্যা টিকছে না। দেখা গেল যখনই মাথা ঘুরিয়ে কোন এক পাশে তাকাচ্ছে রানা, সেই একই চঞ্চল আর অনুসন্ধানী চোখ জোড়াকে দেখতে পাচ্ছে, চোখাচোখি হওয়া মাত্র দ্রুত সরিয়ে নিচ্ছে দৃষ্টি। ব্যাপারটা প্রায় ইঁদুর বিড়ালের খেলা হয়ে দাঁড়াল, অথচ রানার কোন ইচ্ছেই নেই কারও ডিনারে পরিণত হওয়ার।

'এক মিনিটের জন্যে ক্ষমা চাই,' বিড়বিড় করে নন্দিনীর মাথাটা কাঁধ থেকে সরিয়ে সিট ছাড়ল রানা।

চোখে ঘুম, সাগরের তাজা বাতাস পেয়ে আচ্ছন্ন, দশ সেকেন্ডের জন্য চোখ মেলে তাকাল নন্দিনী। 'কোথায় যাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল সে, এত অস্পষ্ট যে কোন রকমে শোনা গেল।

'টয়লেটে,' বলে শান্ত ভঙ্গিতে তাকে পাশ কাটাল রানা।

পিছনদিকে তাকায়নি ও, অর্থাৎ নীচের ডেকে নামার সময় লোকটা ওর পিছু নিয়েছে কিনা দেখার জন্য অপেক্ষা করেনি।

শোল্ডার হোলস্টারে প্রিয় অস্ত্র ওয়ালথার আছে; বগলের নীচে, বাহুতে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা আছে ছুরি, কাজেই নিজেকে রানা মোটেও 'একা' মনে করছে না।

তবে আশা করা যায় এ-সব বের করার কোন দরকার হবে না। এখনও নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করছে রানা, সন্দেহটা অমূলক, ওর মনের অতি সাবধানতা।

খুবই সম্ভাবনা আছে ওর দিকে তাকিয়ে থাকা লোকটার টার্গেট হয়তো নন্দিনী। তার রূপ-যৌবন উত্তেজিত করে তুলেছে লোকটাকে, ফলে রানাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবছে। তবে নিশ্চিতভাবে জানতে হবে ওকে, আসল ব্যাপারটা কী।

লোহার ধাপ বেয়ে সিঁড়ির নীচে পৌঁছাল রানা, তারপর লম্বা করিডর ধরে 'মেন' লেখা একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। কবাট ঠেলে দরজা খুলে প্রথমে ভিতরটা ভালো করে দেখে নিল ও। সরু ঘরগুলো খালি বলেই মনে হলো।

স্টেইনলেস-স্টিলের সিঙ্ক, সামনে বড় সাইজের চারকোনা একটা আয়না। ওটার সামনে দাঁড়িয়ে গরম পানির ট্যাপটা ঘোরাল রানা, অলস একটা ভঙ্গিতে হাত ধুচ্ছে, চোখ আঠার মত সেঁটে আছে আয়নায়।

আয়নার ভিতর দিয়ে সুইং ডোরটা দেখতে পাচ্ছে রানা।

টাওয়েলিং পেপারে হাত মুছছে রানা, এই সময় ওর সাবধানতা ফল প্রসব করল। বাতাসে সামান্য আলোড়ন তুলে নিঃশব্দে দোল খেল সুইং ডোর, ভিতরে ঢুকল একটু বেঁটেখাটো এক লোক, ঠোঁট জোড়া পরস্পরের সঙ্গে শক্তভাবে সেঁটে আছে। লোকটার মুখে কয়েক গাছি সাদা-কালো ছাগল দাড়ি দেখা যাচ্ছে, মাথায় কাঁচাপাকা বাবরি চুল।

ডেকে এই লোকটাই ওকে দেখছিল।

কেউ কোন কথা বলছে না। রানার আঙুল এরই মধ্যে শোল্ডার হোলস্টারের কাছে পৌঁছে গেছে। দেখল ওর মতই সিঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে হাত ধুতে শুরু করল লোকটা।

তারপর সিধে হলো সে, টাওয়েলিং পেপার নিয়ে হাত মুছছে। রানার দিকে এখন পর্যন্ত এমনকী আড়চোখেও তাকায়নি। না তাকিয়েই মুখ খুলল সে।

'আমার বিশ্বাস, মিস্টার সম্ভব, আমাদের কমন একজন বন্ধু আছেন।'

দুই শ্বেতাঙ্গ এজেন্ট, সিআইএ আর বিআইবি, ওকে কুমার সম্ভব নামে চিনত। ওর এই নামটা আর জানত চৌ মিন। 'আছে নাকি?' বিদ্রূপের সুরে জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ। ইয়ে...মানে, ছিলেন আর কী।' বলল লোকটা, এখনও হাত মুছছে। 'ঠিক একজনও নয়, আমাদের কমন বন্ধুর সংখ্যা আসলে দু'জন। তো তাদের একজন আমাকে বিশ্বাস করে একটা ইনফরমেশন দিয়েছেন। খুব গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন, মিস্টার সম্ভব। আপনার ওটা দরকার।'

'কমন বন্ধুদের একজনের নাম বলো।'

'একজনকে চৌ মিন বলে ডাকা হত,' শ্রদ্ধা আর বিনয়ের সঙ্গে নামটা উচ্চারণ করল লোকটা। 'তবে দুঃখের বিষয় যে এখন আর তিনি স্বাভাবিক আলাপ চালাবার অবস্থায় নেই। তাই তো, মিস্টার সম্ভব?'

ধীরে ধীরে ঘুরে লোকটার মুখোমুখি হলো রানা। নিজের হাত দুটো ওর চোখের সামনে রাখার চেষ্টাটা এখনও চালিয়ে যাচ্ছে সে। হয়তো ভয় পাচ্ছে চৌ মিনের মত তাকেও না মেরে ফেলা

হয়।

লোকটা রোগা, তবে রুগ্ন নয়; কাপড়চোপড়ের নীচে পাকানো রশির মত পেশির অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিটাতেও বিশেষত্ব আছে, পরিষ্কার বলে দেয় কুং ফু জানে।

'আরেকজনকে থৌ মিন বলে ডাকা হয়,' বলল রানা। 'কোথায় সে?'

'ডাকা হত,' বলল লোকটা। 'আজ সকাল থেকে তিনিও আর কথা বলার অবস্থায় নেই। অর্থাৎ থৌ মিনও খুন হয়েছেন।'

'সত্যি দুঃখজনক।'

'সত্যি। তবে আমি তাঁদের ম্যানেজার হিসেবে আপনাকে জানাচ্ছি, ইনফরমেশনটা আমার কাছে আছে।'

'তাই? তা কী ইনফরমেশন ওটা?'

'মাফ করবেন?'

'জানতে চাইছি, তুমি আমাকে কী ধরনের ইনফরমেশন দিতে চাইছ?'

'আপনাকে দিতে চাইছি না, মিস্টার সম্ভব,' ঠোঁটে টান টান হাসি ফুটিয়ে বলল লোকটা। 'আপনার কাছে বিক্রি করতে চাইছি।'

হংকং আর ইয়াঙ্গুনের দুটো ব্যাঙ্কের চেক বই আছে রানার কাছে, কোটি কোটি টাকার চেক কাটতে পারবে ও। কিন্তু চৌ মিনের তথাকথিত ম্যানেজার ওকে আসল মাইক্রোফিল্মটা দেবে কিনা জানার উপায় কী?

'চৌ মিনকে টাকা দেয়ার জন্যে তৈরি ছিলাম আমি, কারণ জানতাম কী পেতে যাচ্ছি। তুমি সেই একই জিনিস বেচতে এসেছ কিনা বুঝব কীভাবে?'

'জিনিস সেই একই,' বলল লোকটা। 'কিন্তু প্রমাণ করা বা ব্যাখ্যা করার সময় এটা নয়।'

পানি কেটে হাইড্রোফয়েলের ছুটে চলা অনুভব করছে রানা, অনুভব করছে মৃদু দোলাও। 'এটাই সবচেয়ে ভালো সময়। এখানে প্রাইভেসি আছে।'

সুইং ডোরটার দিকে একবার তাকাল লোকটা। 'কথাটা ঠিক বললেন না।'

'কী বলতে চাও?' কৌতূহলে সরু হয়ে গেল রানার চোখ।

'মিস্টার সম্ভব, আমাদের দু'জনের ওপরই নজর রাখা হচ্ছে,' ধীরে ধীরে বলল ম্যানেজার, প্রতিটি শব্দ যেন সযত্নে সতর্কতার সঙ্গে বাছাই করা।

'নজর রাখছে?' রানা বিস্মিত। 'কারা?'

'মার্কিনিদের বিশ্বস্ত কোন বন্ধু।'

রানা ভাবল, তৃতীয় কোন পক্ষ, যারা টার্কিশ বাথে চৌ মিনের গলা কেটেছে? নাকি এটা আরেক দল?

'ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই আপনি টের পেয়েছেন যে হংকঙে সারাক্ষণ আপনার পিছনে লোক ছিল,' বলল লোকটা। 'কোথায় আপনি যান বা কী করেন, সব তারা জানে। এমনকী এখন, আজও, তারা এই আশায় অপেক্ষা করছে যে আপনি তাদেরকে মাইক্রোফিল্মটার কাছে নিয়ে যাবেন।'

'তারমানে তুমি জানো মাইক্রোফিল্মটা কোথায় আছে?'

'হ্যাঁ, মিস্টার সম্ভব, আমি জানি।'

'তুমি এ-ও জানো কে আমাকে ফলো করছে?'

'হ্যাঁ, তাও জানি।'

'তা হলে বলো, কে সে?'

চওড়া হাসি দেখা গেল লোকটার মুখে, এক ঝাঁক তীরের মত প্রশ্ন করায় কৌতুক বোধ করছে। জবাব দেওয়ার জন্য মুখ খুলল সে, তারপর হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল স্টেইনলেস-স্টিল সিঙ্কটার উপরে। ডাইভ দিয়ে মেঝেতে পড়ার আগে রানা দেখল তার নীল চোখ গড়িয়ে মাথার ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল, উন্মোচিত হলো হলদেটে সাদা অংশটা।

রানার অ্যাকশন পুরোপুরি রিফ্লেক্স, একটার পর আরেকটা। মেঝেতে পড়ে শরীরটা গড়িয়ে দিয়েছে ও, একটা মাত্র গড়ান শেষ হবার আগেই শোল্ডার হোলস্টার থেকে হাতে চলে এসেছে পিস্তল, চোখের দৃষ্টি ঘুরে গেছে দরজার দিকে।

তেল দেওয়া মেকানিজম, নিঃশব্দে দোল খাচ্ছে সুইং ডোর। মিন ভাইদের ম্যানেজারকে এখন সাবেক ম্যানেজার বলতে হবে, সিঙ্কের কিনারা বরাবর ধীরে ধীরে ঢলে পড়ছে।

লোকটা রানার পায়ের সামনে মেঝেতে স্থির হলো, নিষ্প্রাণ আর রক্তাক্ত একটা স্তূপ। নিঃশব্দে সিধে হলো রানা, সুইং ডোর লক্ষ্য করে ছুটল, হাতে উদ্যত পিস্তল। কবাট পুরোপুরি ফাঁক করে সাবধানে উঁকি দিয়ে সরু করিডরে তাকাল।

করিডর খালি, আততায়ী বাতাসে মিলিয়ে গেছে। এক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। হাইড্রোফয়েল সার্চ করলেই যে খুনিকে ধরা যাবে, তা নয়। সে যদি চিনা হয়, দেড়শো আরোহীর যে-কোন একজন হতে পারে।

ঘুরে লাশটার কাছে ফিরে এল রানা। কড়া ইস্ত্রি করা সাদা শার্টের সামনেটা টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। ঠোঁট ফাঁক হয়ে আছে তার, চেহারায় বিস্ময় আর অবিশ্বাস, সে যেন ভাবতেই পারেনি এত সহজে সরিয়ে দেওয়া হবে তাকে। এই মুহূর্তে ডেকে, কিংবা

হাইড্রোফয়েলের অন্য কোথাও, সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলধারী এক লোক নিজের কাজে ভারি সন্তুষ্ট বোধ করছে।

যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে রানাকে। হঠাৎ কেউ এসে যদি একটা লাশের উপর ঝুঁকে থাকতে দেখে ওকে, পুলিশী ঝামেলা এড়ানো যাবে না।

পকেট সার্চ করে হংকং থেকে ইস্যু করা একটা পাসপোর্ট পেল রানা। লোকটার নাম ফুয়া ফুয়ান।

লোকটার পরিচয় যাই হোক, রানার কাছে তারচেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল পাসপোর্টের শেষ পৃষ্ঠায় সম্প্রতি সিল মারা মায়ানমারের একটা ভিসা–গতকালের তারিখে। এখনই নিজের পিঠ চাপড়াতে রাজি নয়, তবে রানা বুঝতে পারল ঠিক পথেই এগোচ্ছে ও।

লোকটার কাছে আর কোন কাগজ-পত্র নেই। আর মাইক্রোফিল্মটা তো নে-ই। তাকে টেনে এনে একটা কিউবিকলে ঢোকাল রানা, তারপর সিটে বসিয়ে ভিতর থেকে তালা লাগিয়ে দিল দরজায়। পার্টিশন টপকে বেরিয়ে এল রানা, হোসপাইপ দিয়ে মেঝের রক্ত ধুয়ে ফেলল, তারপর টাওয়েলিং পেপারে হাত মুছে বেরিয়ে এল করিডরে। এখনও সেটা খালি।

সিঁড়ি বেয়ে ডেকে ওঠার সময় নন্দিনীর কথা মনে পড়ল রানার। কে জানে কী ভাবছে মেয়েটা।

ম্যানেজার ফুয়া ফুয়ানের ধারণা ছিল, এক বা একাধিক লোক বিশ্বাস করে রানাকে ফলো করলে মাইক্রোফিল্মটার কাছে পৌঁছাতে পারবে তারা। এই হিসাবে, অন্তত আপাতত, মৃত রানার চেয়ে জীবিত রানা অনেক বেশি মূল্যবান।

তবে হিসাব যাই বলুক, এরকম একটা পরিস্থিতি মোটেও স্বস্তি

কর নয়।

আট

মায়ানমার সরকার মাত্র সাতদিনের ভিসা ইস্যু করেছে। আজ তার প্রথম দিন।

হংকঙের কাই টাক এয়ারপোর্ট থেকে প্লেন ধরল রানা। মায়ানমার এয়ারওয়েজের ননস্টপ ফ্লাইট। সামনে-পিছনের, দুই কেবিনের চারজন স্টুয়ার্ডেই বার্মিজ; পরনে বহুরঙা সারং, তার উপর স্বচ্ছ কাপড়ের ঢোলা ব্লাউজ পরেছে। এই পরিচ্ছদের নীচের অংশটাকে লুঙ্গিও বলা হয়, আর উপরের অংশটাকে বলে ইঙ্গি।

বার্মিজ বিমানবালারা আইল ধরে আসা-যাওয়া করছে, রানা তাদের হাঁটার ভঙ্গির মধ্যে অদ্ভুত এক ঝাঁকি আবিষ্কার করল, যে কারণে ইঙ্গির ভিতর তাদের উন্নত স্তন প্রতি মুহূর্তে লাফাচ্ছে।

দৃশ্যটা রানাকে মনে করিয়ে দিল কাল রাতে কী উপভোগ করেছে ও।

বিছানায় ওর বুকের সঙ্গে সেঁটে এসে নন্দিনী অপরূপা আদুরে সুরে আবদার করেছে, ‘আরেকটা দিন থাকো না, প্লিজ!’

একটা মেয়েকে যতই ভালো লাগুক, তার সঙ্গে যতই ঘনিষ্ঠতা জন্মাক, এক নম্বরে থাকবে কাজ।

এবং পাশাপাশি সতর্কতা। সেই সতর্কতার কারণেই নন্দিনীকে রানা বলেনি যে মায়ানমারে যাচ্ছে ও। যদি সম্ভব হয় যতটা সম্ভব কম মিথ্যেকথা বলতে চায়।

নন্দিনী অনেক কথাই বলেছে, তা থেকে ধরে নেওয়া চলে আগামী কয়েকদিন মায়ানমারে ঢুকছে না সে। আশা করা যায় তার আগেই দেশটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে রানা, পকেটে মাইক্রোফিল্মটা নিয়ে।

ঘনিষ্ঠ মুহূর্তগুলো স্মৃতির পথ ধরে ফিরে ফিরে আসছে মনে।

'ব্যাপারটা সত্যি খুব মজার আর অবাক করা।'

'কোনটা?'

'তুমিই প্রথমপুরুষ যাকে বিশ্বাস করেছি, যার সঙ্গে নিজেকে আমার সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে হয়েছে। আমি অত্যন্ত লজ্জা আর অসহায় বোধ করতাম...'

'লাজুক? হ্যাঁ,' হেসে উঠে বলল রানা। 'অসহায়? নেভার!'

'আপনি সন্তুষ্ট, সার?' সংবিৎ ফিরল বিমানবালার মধুর কণ্ঠে।

'ওহ্, ইয়েস!' বলল রানা, হঠাৎ করে উপলব্ধি করল নন্দিনী শুধু ওর শারীরিক চাহিদা মেটানোর একটা মেশিন নয়, তারচেয়েও অর্থবহ কিছু। মেয়েটার সরলতা ওর ভালো লেগেছে। এমনকী আত্মসমর্পণের ভঙ্গিটিও।

তবে কাজের প্রাধান্য আগে। নন্দিনী অপরূপাকে এড়িয়ে না গিয়ে আর কোন উপায় ছিল না ওর। নতুন একটা অ্যাসাইমেনন্টে রয়েছে ও, এখনও জানে না মাইক্রোফিল্মটা কোথায় আছে। জানার পর ঝামেলা আরও বাড়বে। হাতে পেতে হবে ওটাকে, তারপর সবাইকে ফাঁকি দিয়ে মায়ানমার থেকে বের করে নিয়ে যেতে হবে।

বলা যায় না, হয়তো এই মুহূর্তেও ওর উপর নজর রাখা হচ্ছে। প্যাসেঞ্জার সেজে ওর আশপাশেই হয়তো বসে আছে কেউ। কিংবা বিমানবালাদের কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শত্রুপক্ষ তো অনেক, তাদের সবার সম্পর্কে ওর ধারণাও নেই।

বিকেলের দিকে মায়ানমার জাতীয় মিউজিয়ামে পৌঁছাল রানা।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে পায়ে হেঁটে এল ও। সরু রাস্তাটার নাম পিয়ারে স্ট্রিট, সেটা ধরে খানিক হাঁটার পর ডান দিকে বাঁক ঘুরে চলে এল শয়ে ডাগন প্যাগোডা রোড। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে কালচারাল ইনস্টিটিউট তৈরি করা হয় এখানে। ধীরে ধীরে ওটার পাশে বিরাট সব দালান গড়ে উঠেছে–ন্যাশনাল মিউজিয়াম, ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি, ন্যাশনাল লাইব্রেরি আর ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অভ মিউজিক, ড্রামা অ্যান্ড ডান্স।

ঘাড় ফিরিয়ে ফেলে আসা ফাঁকা রাস্তাটার দিকে তাকাল রানা। একটা বিড়াল পর্যন্ত নেই। ছায়ার ভিতরও কিছু নড়ছে না।

মিনিস্ট্রি অভ কালচার লেখা প্রবেশপথ দিয়ে ভিতরে ঢুকল রানা। মিউজিয়ামে পৌঁছাবার আগে মার্বেল পাথরের তিন প্রস্থ সিঁড়ির ধাপ টপকাতে হলো ওকে।

বিখ্যাত লায়ন থ্রোন বসানো হয়েছে একটা খিলানের পাশে। ১৯৬৪ সালে বার্মাকে ওটা ফিরিয়ে দেয় ব্রিটেন। রানা বিশেষ আগ্রহ বোধ করছে না। সম্পূর্ণ অন্য এক কাল আর অন্য এক সংস্কৃতির খোঁজে এসেছে ও।

এই সময় নোটিশটা চোখে পড়ল, ইংরেজি আর বার্মিজ ভাষায় ছাপা হয়েছে।

হান সাম্রাজ্যের আর্টিফ্যাক্ট মাত্র আজ সকাল থেকে প্রদর্শনের

আয়োজন করা হয়েছে। করিডর ধরে এগিয়ে ডান দিকে বাঁক নিল রানা, দুটো হল আর একটা গ্যালারিকে পাশ কাটাল। এবার সামনে পড়ল একজন ইউনিফর্ম পরা গার্ড।

অ্যাডমিশন ফি হিসাবে অল্প কিছু কিয়াত দিয়ে ভিতরে ঢুকল রানা, তারপর সরাসরি সেন্ট্রাল ডিসপ্লের কাছে চলে এল, তোউ ওয়ান-এর কাফন-সুট দেখার জন্য অস্থির হয়ে আছে।

ওয়াইন রঙের ভেলভেট রশি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে জেড পাথরের তৈরি বেরিয়াল সুট। কাঠের ফ্রেম দিয়ে বানানো, কাঁচ মোড়া একটা কেস-এর ভিতর। কেসটার পাশে আরেকজন গার্ডকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। এর আগে ডেথ সুটের শুধু একটা ফটো দেখেছে রানা, উপলব্ধি করল সেই ফটোয় জিনিসটার প্রতি সুবিচার করা হয়নি।

নীল-সবুজ বেরিয়াল আর্মার সম্পর্কে 'চোখ ঝলসানো' শব্দ দুটোই শুধু মানায়। সোনার খুদে পাত আর জেড বসিয়ে গোটা জিনিসটা বোনা হয়েছে, ব্যবহার করা হয়েছে সোনারই তৈরি সুতো বা তার। আর্মারটা ছাড়া হান রাজকুমারীর কিছুই আর অবশিষ্ট নেই, তা সত্ত্বেও চাপা ফিসফাস আর নড়াচড়ার খসখস শব্দের ভিতর তার উপস্থিতি যেন অনুভব করা যায়–জেদি আর উদাসীন।

আর বোধহয় দশ-বারোজন ভিজিটর ধীর পায়ে ঘুরে ঘুরে প্রদর্শনীটা দেখছে, বেশিরভাগই ইউরোপ-আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ–নিশ্চয় ট্যুরিস্টই হবে।

না, তাদের মধ্যে সিআইএ আর বিআইবি-র সেই দু'জন নেই।

কেসটার সামনে থেকে সরে যেতে হলো রানাকে। ধরেই নিতে হয় কারও না কারও নজর আছে ওর উপর। তাদেরকে বুঝতে

দেওয়া উচিত নয় ডেথ সুটটার প্রতি বিশেষ দুর্বলতা আছে ওর।

দূরে কোথাও গেল না, কাছেই থাকল রানা। এদিক-ওদিক হাঁটা-চলার ফাঁকে ভালো করে দেখছে সুটটাকে।

প্রমাণ সাইজের ওই জেড আর্মার সুটের ভিতর কোথাও, রানা নিশ্চিত, হয় মিন ভাইরা বা তাদের বিশ্বস্ত কোন লোক ফিল্মের একটা রোল লুকিয়ে রেখেছে। ওই রোলটা উদ্ধার করতে হবে রানাকে। উদ্ধার করতে হবে ওর ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার আগেই, অর্থাৎ সাতদিনের মধ্যে।

গার্ড আর লোকজনের সামনে কেসটা সার্চ করা সম্ভব নয়। ওকে অপেক্ষা করতে হবে মিউজিয়াম খালি না হওয়া পর্যন্ত।

ঘোরাফেরা করার সময় চোখ-কান খোলা রেখেছে রানা। এখন পর্যন্ত কাউকে সন্দেহজনক চরিত্র বলে মনে হয়নি। তবে গার্ড লোকটা বারকয়েক তাকিয়েছে ওর দিকে।

এবার রানাও তার দিকে সরাসরি তাকাল। জানত চোখাচোখি হবে, হলোও। আর চোখাচোখি হতেই অমায়িক হাসল রানা, জিজ্ঞেস করল, কিউরেটরের সঙ্গে কি আলাপ করা সম্ভব, যিনি এই প্রদর্শনীর চার্জে আছেন?'

'নো ইংলিশ,' বলে মাথা নাড়ল গার্ড।

'ওন নে পার দে,' আবার শুরু করল রানা, এবার স্থানীয় ভাষায়। 'চায়া-জু পায়ু-পাহ...'

কী জানতে চায় বোঝাতে খানিক সময় লাগল রানার, তবে বোঝার পর বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল গার্ড। 'আপনি আমাদের ভাষা শিখেছেন, সেজন্যে ধন্যবাদ, সার!' বলল সে। তারপর হাত তুলে গ্যালারির শেষ মাথাটা দেখিয়ে দিল রানাকে। ওদিকে সরু একটা করিডর দেখা যাচ্ছে। পাশাপাশি অনেকগুলো

অফিস কামরা।

'মিস্টার থাইগন লোবাংকে চাইবেন।'

কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজ হলো না। এগজিবিট হলের শেষ মাথায় পৌঁছানোর পর ইউনিফর্ম পরা আরেকজন সশস্ত্র গার্ড ওর পথ আগলে দাঁড়াল। চিনারা, কিংবা হয়তো বার্মিজরা কোন ঝুঁকি নিচ্ছে না; আয়োজন দেখে মনে হবে বিখ্যাত হীরে কোহিনুরকে পাহারা দিচ্ছে।

'নো অ্যালাওয়িং,' বলল গার্ড, কোমরের হোলস্টারে হাত। 'ফুটওয়্যারিঙ নট অ্যালাওয়িং।'

'মিস্টার থাইগন লোবাং,' বলল রানা।

'নো অ্যালাওয়িং,' মুখস্থ বুলি আওড়াচ্ছে গার্ড। 'নো অ্যালাওয়িং।'

'আমি ব্যাটা তোর চাকরি খাওয়িং।' সকৌতুকে ভয় দেখাল রানা। 'ভালো চাস তো থাইগন সাহেবকে জলদি খবর দেয়িং।'

কী বুঝল আল্লাহ মালুম, পথ ছেড়ে দিল গার্ড, হাত তুলে দেখাল কোনদিকে যেতে হবে।

করিডর ধরে কিছু দূর আসার পর কিউরেটরের অফিসটা খুঁজে পেল রানা।

নক করল রানা। দরজা খুলল সুট-টাই পরা মধ্য বয়স্ক এক ভদ্রলোক। পেঁচার মত বড়বড় চোখ তাঁর। মোটা কাঁচের চশমার ভিতর দিয়ে চোখ মিটমিট করে ভালো করে দেখছেন আগন্তুককে। 'আমি আপনার কোন সাহায্যে আসতে পারি?' জানতে চাইলেন থাইগন লোবাং, পরিষ্কার ইংরেজিতে।

'আশা করি,' বলল রানা, তারপর নিজের পরিচয় দিল। 'আপনার প্রদর্শনী আমাকে মুগ্ধ করেছে, মিস্টার লোবাং।

ওরিয়েন্টাল আর্ট আমার প্রথম দুর্বলতা, বিশেষ করে হান সাম্রাজ্যের মেয়াদ কালের। স্বীকার না করলে অন্যায় হবে–এক ছাদের নীচে এত সমৃদ্ধ কালেকশান অন্য কোথাও আমি দেখিনি।'

'আপনি এগজিবিট উপভোগ করছেন, সেজন্যে আমি খুশি।' ভদ্রলোক হাসছেন।

'দারুণ উপভোগ করছি, বড্ড ভালো লাগছে। তোউ ওয়ান-এর বেরিয়াল সুট উজ্জ্বল একটা অর্জন–বিস্মিত করে।' মাথা দোলাল রানা, পণ্ডিত বা সমঝদাররা যেমন দোলান। 'আর যদি তা'য়াং ঘোড়সওয়ার-এর প্রসঙ্গ তোলেন–আমার জানামতে চ'য়েনসেন থেকে পাওয়া গেছে ওটা–ফর্ম আর মুভমেন্টের এমন সুষ্ঠু সংশ্লেষণ খুব কমই চোখে পড়ে,' হোমওঅর্কে ফাঁকি না দেওয়ায় গড় গড় করে বলে যাচ্ছে রানা।

'প্লিজ,' বললেন থাইগন লোবাং, হাত তুলে অফিস কামরার ভিতরটা দেখালেন। 'একটু বসবেন না? আপনার মত একজন বোদ্ধার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ খুব কমই জোটে ভাগ্যে। তারমানে এই নয় যে পণ্ডিতের অভাব, অভাব আসলে সফিসটিকেশনের।'

'নিজেকে আমি সম্মানিত বোধ করছি, মিস্টার লোবাং।'

ওদের পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

আধঘণ্টা পর কিউরেটর মহোদয়ের অফিস থেকে সহাস্যে বেরিয়ে এল রানা। থাইগন লোবাং আজ রাতে ওর সঙ্গে ডিনার খাচ্ছেন। সত্যি কথা বলতে কি, ওর অতিথি হবার প্রস্তাব পেয়ে ভদ্রলোক রীতিমত সম্মানিত বোধ করছেন।

এখন রানার কাজ হবে, নিজের উদ্দেশ্য বুঝতে না দিয়ে

প্রদর্শনী সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকে যত বেশি সম্ভব তথ্য আদায় করা। ডিটেইল্ড্ ফ্লোর প্ল্যান থেকে শুরু করে মিউজিয়ামের সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্টের সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় জানতে হবে ওকে।

পরিস্থিতি বেশ অনুকূল হয়ে উঠছে।

তারপর, সন্ধ্যার প্রথম লগ্নে ডিনারে বসে, আরও আশাবাদী হয়ে ওঠার কারণ দেখতে পেল রানা। শেরাটন ইন্টারন্যাশনালের রেস্তোরাঁ ফ্যান্টাসিতে বসে ইরাবতী নদীতে নৌকার আসা-যাওয়া দেখল ওরা, সুস্বাদু চিনা রেসিপির স্বাদ নিল, আর স্থানীয় এক গায়িকার সুরেলা কণ্ঠের গান শুনল। আরও একটা কাজ খুব মন দিয়ে করল রানা—থাইগন লোবাং কথা বলে গেলেন, ও শুনল।

ভদ্রলোক সারাক্ষণ হাসলেন আর নিজেকে প্রকাশ করার তাগিদে সাড়া দিলেন।

'কী জানেন,' বললেন তিনি, খাওয়াদাওয়া শেষ হতে রানার কাছ থেকে বার্মার সবচেয়ে দামী চুরুট আর ব্র্যান্ডি গ্রহণ করার পর, 'সব মিলিয়ে বলতে হয় মিউজিয়ামের জন্য ব্যাপারটা স্রেফ একটা কালচারাল কু। চিন বন্ধু রাষ্ট্র হলেও, এতদিন আমাদের রক্ষণশীলতা এ-ধরনের সাংস্কৃতিক বিনিময় অনুমোদন করেনি। এরকম একটা পরিস্থিতিতে ধার পাওয়া হান আর্টিফ্যাক্ট দু'দেশের জনগণের মধ্যে শুভেচ্ছা আর সৌহার্দ্যের আবহ তৈরি করবে। খুবই দুঃখের বিষয় ইয়াঙ্গুনের এত কম লোককে টানতে পারছে প্রদর্শনীটা...'

'রাজধানীর লোকেরা হয়তো মিউজিয়ামে চিনা গার্ড পছন্দ করছে না,' বলল রানা।

'চিনা গার্ড? অসম্ভব, মিস্টার সম্ভব! এগজিবিটের সঙ্গে

পাঠাতে চেয়েছিল ওরা, কিন্তু আমরা রাজি হইনি। সিকিউরিটির দিকটা আমরা নিজেরাই দেখছি…'

ইতিমধ্যে রানার জানা হয়ে গেছে মিউজিয়াম কখন খোলে, কখন বন্ধ হয়, অ্যালার্ম নেটওঅর্ক কীভাবে কাজ করে, ভিতরে ঢোকার সম্ভাব্য পথ ইত্যাদি। 'সেক্ষেত্রে আপনাদের দায়িত্ব অনেক বেড়েছে,' বলল ও। 'কিছু চুরি হলে…'

'চুরি যাতে না হয় তার জন্য কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে, মিস্টার সম্ভব,' আশ্বস্ত করার সুরে বললেন কিউরেটর ভদ্রলোক।

'কিছু মনে করবেন না, মিস্টার লোবাং, আমি কিন্তু কোথাও কড়া পাহারা দেখিনি। গার্ড আছে ঠিকই, কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। তবে রাতে যদি তাদের সংখ্যা বাড়ানো হয় তা হলে আলাদা কথা।'

হেসে ফেললেন থাইগন লোবাং। 'আপনি আসলে ভুলে যাচ্ছেন, মিস্টার সম্ভব, মায়ানমার শাসন করছে একটা সামরিক জান্তা। এরা অত্যন্ত দক্ষ, অত্যন্ত বিচক্ষণ আর ক্রিমিন্যালদের ব্যাপারে নিষ্ঠুর…'

'আচ্ছা!'

'কে চুরি করবে, বলুন, ধরা পড়লে যদি তার বাপ-ভাইকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়? এ-ধরনের বেশ কিছু বিধি চালু করায় আমাদের ক্রাইম খুবই কমে গেছে। আপনি বলছেন গার্ডের সংখ্যা কম, আসলে বেশি–হারটা হলো–একজন হলেই যেখানে কাজ চলে সেখানে আমরা তিনজনকে রেখেছি।'

'জানা কথা রাতে নিশ্চয়ই আরও বাড়ানো হয়।'

মাথা নাড়লেন কিউরেটর। 'রাত একটার পর থেকে সকাল

ছ'টা পর্যন্ত রাজধানীর সব রাস্তাতেই পুলিশের টহল থাকে, ওই সময় মিউজিয়ামের গার্ডদের ছুটি, তারা ঘুমাতে চলে যায়।' গর্বের হাসি হাসলেন তিনি। 'এত কথা বলে আপনাকে আমি শুধু বোঝাতে চাইছি, আমাদের সমাজে চোর এখন প্রায় না থাকারই মত। তবে বাদ দিন, আসুন সাম্প্রতিক আবিষ্কার চ'য়াংশা সম্পর্কে আলাপ করি।'

আবারও, হোমওঅর্ক ভালো করে শেখা ছিল বলে, কঠিন একটা পরীক্ষায় উতরে গেল রানা। 'আপনি আসলে লেডি সিন চুই-এর সমাধির কথা বলছেন।'

'ঠিক ধরেছেন,' বলে চওড়া হাসি উপহার দিলেন কিউরেটর ভদ্রলোক, রানার জ্ঞান দেখে খুশি।

'আমাকে সবচেয়ে উত্তেজিত করেছে ফেই আই, ফ্লাইং গারমেন্ট—চ'য়াং ও-র অবিশ্বাস্য কীর্তির বর্ণনা আছে যাতে।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' সন্তুষ্টচিত্তে সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকালেন লোবাং। 'খুবই বিস্ময়কর একটা আর্টিফ্যাক্ট। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে চ'য়া ও-ই অমরত্ব লাভের জন্যে অমৃত চুরি করেছিলেন, তারপর একটা ড্রাগনের ডানায় চড়ে পালিয়ে...'

'ড্রাগনের ডানার কথা যখন উঠলই, এদিকে একটা ক্ষুধার্ত মেয়েকে খাওয়ানোর জন্যে গরম ডিনার পাওয়া যাবে কি?'

ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। ভুরু কোঁচকাল, পরক্ষণে হাসল। তারপর দেখা গেল চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

নন্দিনী অপরূপা তার পেলব বাহু বাড়িয়ে দিল ওর দিকে। 'সারপ্রাইজ, সম্ভব মহাশয়, সারপ্রাইজ!' শিশুসুলভ সরল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে মুখ, রানার বিস্ময় মন ভরে উপভোগ করছে।

নয়

মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নিজেকে সামলে নিল রানা। 'মিস্টার থাইগন লোবাং, মিস নন্দিনী অপরূপা—আমার একজন বন্ধু।'

'আই অ্যাম অনারড্,' বললেন লোবাং, চেয়ার ছেড়ে মাথাটা সামান্য নোয়ালেন।

নন্দিনী না বসা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকল ওরা। হেড ওয়েটারকে ডেকে তার জন্য অর্ডার দিল রানা। এরই ফাঁকে ওদের দু'জনের জন্য কফি পরিবেশন শুরু হলো। নিজের চেয়ারে বসে হেলান দিল রানা, কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখছে নন্দিনীকে।

খাকি সাফারি সুট পরেছে সে, রাশি রাশি কালো রেশমি চুল বেণী করেনি আজ। শেষবার যেমন দেখেছিল, চব্বিশ ঘণ্টাও পেরোয়নি, এখন তারচেয়েও সুন্দর লাগছে তাকে।

'গলায় আস্ত মাছ আটকানো বিড়ালের মত লাগছে তোমাকে, সম্ভব,' আরেক দফা সংক্রামক হাসির সঙ্গে বলল নন্দিনী। তারপর কিউরেটরের দিকে ফিরল। 'সম্ভবের সঙ্গে হংকঙে পরিচয় হয় আমার, মিস্টার লোবাং। কিছু ফিল্ড ওঅর্ক করার জন্যে পেগানের

পথে রয়েছি আমি, কিন্তু ভাবতে আশ্চর্য লাগছে—ও যে মায়ানমারে আসবে, এ-কথা ভুলেও আমাকে জানায়নি।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'ওর বোধহয় জানা নেই যে দুনিয়াটা বেশি বড় নয়।'

'খুবই ছোট,' বললেন লোবাং, প্রথমে রানার দিকে ফিরে হাসলেন, তারপর নন্দিনীর দিকে। 'তবে আপনাদের জন্যে সারপ্রাইজটা নিশ্চয়ই খুব মধুর।'

'তা আর বলতে।' একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা। হাসির আড়ালে উদ্বেগ লুকাচ্ছে। নিজের আশপাশে নন্দিনীকে চায় না ও। তার উপস্থিতি ওর জন্য নানা ধরনের জটিলতা সৃষ্টি করবে।

বিশেষ করে জটিল আর বিপজ্জনক অ্যাসাইনমেন্টে থাকার সময় কোন মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে নেই। তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে রানার জানা আছে, শত্রুপক্ষ ব্যাপারটাকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে প্রলুব্ধ হয়। বছরখানেক আগে এরকম একটা মেয়ের সঙ্গ এড়াতে পারেনি ও। তার পরিণতি মোটেও শুভ হয়নি। হঠাৎ যখন গোলাগুলি শুরু হলো, তার কথা মনেই ছিল না রানার। পরিবেশ শান্ত হতে দেখা গেল মেয়েটা আহত হয়েছে। ফলে ইনটেনসিভ কেয়ারে মাসখানেক থাকতে বাধ্য হলো সে। রানা একই বোকামির পুনরাবৃত্তি চায় না।

'তবে, সম্ভব,' বলল নন্দিনী, রানার আগ্রহের অভাব দেখে পরোক্ষভাবে প্রতিবাদ করছে, 'ব্যাপারটা আবার অত বড় সারপ্রাইজ নয়ও। সবাই জানে ইয়াঙ্গুনে প্রথম শ্রেণীর হোটেল খুবই কম...'

'কে বলল? তাজমহল আছে, ইরাবতী ইন্টারন্যাশনাল আছে...'

'ওগুলো আমার পথে পড়ে না,' হেসে উঠে বলল নন্দিনী।

'শেরাটন থেকে শয়ে ডাগন প্যাগোডা একদম কাছে, হেঁটে গেলে তিন মিনিটে পৌঁছে যাব। আউটডোর মার্কেটও কাছে। তবে জানি না এখানে বসে কী কারণে আমি একের পর এক অজুহাত তৈরি করছি। প্রথমবার যখন দেখা হলো তখনই তোমাকে জানিয়েছি, মায়ানমারে আসছি আমি। কিন্তু আমাকে কেউ জানায়নি যে তুমিও এখানে আসছ।'

'আমাকে এবার যেতে হয়,' হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে বললেন থাইগন লোবাং। দুই তরুণ-তরুণীর মান-অভিমানের পালা শুরু হয়েছে, কাজেই বুঝতে পারছেন তাঁর উপস্থিতি বেমানান হয়ে পড়েছে। 'মিস্টার সম্ভব, আপনার সান্নিধ্যে ভারি আনন্দময় একটা সন্ধ্যা কাটালাম। আন্তরিক ধন্যবাদ। আবার যদি মিউজিয়াম ভিজিট করেন, আমার সঙ্গে দেখা না করলে হতাশ হব।'

'মনে থাকবে,' আশ্বস্ত করল রানা। 'আমার বেড়ানোটা স্মরণীয় করে রাখতে সাহায্য করেছেন আপনি। আপনার মত জ্ঞানী মানুষের দেখা খুব কমই পাই আজকাল।'

ওদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে দ্রুত বিদায় নিলেন থাইগন লোবাং।

'সত্যি আমি দুঃখিত,' নিজের প্লেটের দিকে চোখ রেখে বলল নন্দিনী, যেন বাচ্চা মেয়ের মত অভিমানে ঠোঁট ফোলাবে। 'তুমি এরকম রেগে যাবে জানলে...'

'আমি রাগিনি,' প্রতিবাদ করল রানা। 'আমি...অবাক হয়েছি, খুশি হয়েছি, একটু ঘাবড়েও গেছি। এবার বলো, আমার এই সততা, এই সরল স্বীকারোক্তি কেমন লাগছে তোমার।' নন্দিনীর হাতটা ধরল ও, চাপ দিল মৃদু, আড়ষ্ট ভাবটুকু আড়াল করতে চাইছে।

না, ইয়াঙ্গুন শেরাটনে নন্দিনীর আগমন মোটেও অবাক করার মত কিছু নয়। বরং ইয়াঙ্গুনে রানার উপস্থিতিই খানিকটা অপ্রত্যাশিত।

'তুমি আমাকে বলোনি কেন এখানে আসছ?' জানতে চাইল নন্দিনী, অবশেষে নিজেকে সামলে নিয়ে প্লেট থেকে মুখ তুলে তাকাল।

'আমাদের শেডিউল বদলে নতুন করে সাজানো সম্ভব বলে মনে হয়নি, তাই,' মিথ্যেকথা বলল রানা। 'কাজেই মুখ বুজে ছিলাম আমি। কে জানত সময়ের আগেই চলে আসবে তুমি...'

'তুমি নেই, হংকং আর ভালো লাগে কী করে!' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল নন্দিনী। 'আমার কী করেছ, তুমি বোধহয় জানোও না!'

'কী করেছি?'

'তুমি বোধহয় খুব নিষ্ঠুর মানুষ, তা না হলে এ-প্রশ্ন করতে না!'

'আশ্চর্য তো!'

'সত্যি জানো না?' শিরদাঁড়া একটু খাড়া করে সরাসরি রানার চোখে তাকাল নন্দিনী। 'জানো না, নিজের কত বড় সর্বনাশ করে ফেলেছি আমি?'

'একবার নিজেকে দুষছ, আরেকবার আমাকে।' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কী করে জানব, বলো? আমি কি অন্তর্যামী?'

'তুমি কে? তোমাকে আমি চিনি?' মাথা নাড়ল নন্দিনী। 'কিছুই জানলাম না, অথচ পাগল হয়ে সব দিয়ে বসলাম।'

'এটাকে তুমি নিজের সর্বনাশ বলছ?'

'বলছি। কিন্তু আমাকে নিয়ে মূল সমস্যা হলো,' হেসে ফেলল

নন্দিনী, 'নিজের ওই সর্বনাশ আমি আবার করব। বারবার করব। যতবার দেখা হবে। যেখানে দেখা হবে।'

কোন মেয়ের এরকম আত্মসমর্পণ কার না ভালো লাগে।

ব্যাপারটা আরও উপভোগ্য হয়ে উঠল এক ঘণ্টা পর, নন্দিনীর হোটেল স্যুইটে। নিষ্প্রভ নীল আলো গায়ে মেখে আনন্দে অবগাহন।

নন্দিনীর ফর্সা ত্বকে একটা উজ্জ্বলতা ফুটে উঠেছে। রিবন-এর দিকে হাত বাড়াল রানা, ওটা ধরে টান দিলেই খুলে যাবে নাইটগাউন।

কিন্তু সরে গেল নন্দিনী, ঠোঁটে দুষ্টামি ভরা হাসি, রানাকে নিয়ে যেন খেলছে। 'তুমি অদ্ভুত, আশ্চর্য একজন মানুষ, সম্ভব। খুবই…খুবই…কী বলব? খুবই রহস্যময়।'

'সেটা কি তোমার জন্যে উত্তেজক?'

মাথা ঝাঁকাল অর্ধনগ্ন নারী। 'হ্যাঁ। ব্যাপারটা…ব্যাপারটা আমার ভেতর যেন একটা চাবি ঘোরায়। আমি যেন অন হয়ে যাই। ঠিক বলে বোঝাতে পারব না। বিচ্ছিরি, না?'

মাথা নাড়ল রানা। 'তোমার ভালো লাগলে বিচ্ছিরি হতে যাবে কেন।'

'না, মানে, মেয়েরা নিজেদের এই সব অনুভূতির কথা মুখ ফুটে বলে না। সত্যি তুমি কিছু মনে করছ না?'

'না, করছি না,' সত্যি কথাই বলল রানা। 'আমার ভালো লাগছে, কারণ তুমি আর দশজনের মত নও। ছেলে হোক আর মেয়ে, এরকম ঘনিষ্ঠ সময়ে সে তার অনুভূতির কথা কেন বলবে না।'

হঠাৎ রানার বুকে চলে এল নন্দিনী। তার আলিঙ্গন হয়ে উঠল

খামচি, চুম্বনকে বলতে হবে কামড়।

তাকে নির্যাতন করার সুযোগ দিচ্ছে রানা। কারণ জানে একটু পর সে নির্যাতিতা হবে।

তারপর কয়েক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। হাতঘড়িতে এখন রাত ১২:১৫।

নিঃশব্দে বিছানা থেকে নেমে অন্ধকারেই কাপড় পরতে শুরু করল রানা। কাজ আছে ওর, যে কাজ ফেলে রাখা যায় না। থাইগন লোবাং বলেছেন, রাত একটার পর মিউজিয়ামে গার্ড থাকে না বললেই চলে। নন্দিনীর ঘুম না ভাঙিয়ে ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ করার জন্য নিজের স্যুইটে ফিরে এল রানা, যতটা সম্ভব বদলে চেহারায় বার্মিজ বৈশিষ্ট্যও আনতে হবে। ইকুইপমেন্টের মধ্যে ধুতরার ফল মেশানো এক প্যাকেট সিগারেটও আছে। সার্ভিস এন্ট্রান্সটা আগেই দেখে রেখেছিল, হোটেলের বাইরে বেরুবার সময় কারও চোখে ধরা পড়ল না।

স্ট্রিট ল্যাম্পের নীচে ঝাঁক ঝাঁক পতঙ্গ আলোড়িত মেঘ তৈরি করেছে। মালা স্ট্রিট ধরে নিজের গন্তব্যে যাবার পথে ওর চুলের সঙ্গে জড়িয়ে গেল কিছু পোকা।

ফুটপাথে প্রচুর লোকজন শুয়ে আছে। এটা-সেটা নিয়ে গোলযোগ লেগেই আছে। এতরাতে বিদেশী একজন লোককে দেখামাত্র চুপ করে যাচ্ছে তারা। মালা রোড থেকে উত্তরে রওনা হলো রানা। এদিকের রাস্তায় কোথাও আলো আছে, কোথাও নেই। একে একে পেরিয়ে এল মার্চেন্ট, ডালহৌসি, বগিওক, ডাবল প্যাগোডা আর ড্রাগন স্ট্রিট। প্রতিটি রাস্তায় ছায়ার ভিতর থেমেছে ও, পিছনে তাকিয়ে দেখেছে কেউ পিছু নিয়ে আসছে

কিনা।

বিশ কি বাইশ মিনিট হন-হন করে হেঁটে শয়ে দাগুন প্যাগোডা রোড আর পেয়ারে স্ট্রিটের মোড়ে পৌঁছাল রানা। দম নেওয়ার জন্য এখানে একটু থামল রানা, পিছন দিকটা আরেকবার ভালো করে দেখে নিশ্চিত হতে চাইল কেউ ওর পিছু নিয়ে আসেনি। তারপর পেয়ারে স্ট্রিট ধরে নিঃশব্দ পায়ে মিনিস্ট্রি অভ কালচার-এর সামনে চলে এল।

বিশাল আয়তনের দালানটাকে পাশ কাটাবার সময় আশপাশে কোন পাহারা বা লোকজন চোখে পড়ল না। তবে সামনের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ দেখা গেল।

কিছুদূর এগিয়ে গাঢ় ছায়ায় দাঁড়াল রানা। ফেলে আসা পথে কিছুই নড়ছে না। পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে আবার দালানটার দিকে এগোল ও। সদর দরজার সামনে থেকে কবাটে ঠেলা দিতে একচুল নড়ল না সেটা, একবার চোখ বুলাতেই বোঝা গেল, দরজার কবাটে কোন কী হোল নেই। তারমানে ভিতর দিক থেকে বোল্ট আর তালা লাগানো হয়েছে।

এত সহজে হাল ছাড়তে রাজি নয় রানা, বিশেষ করে এই তথ্য জানার পর যে তো ওয়ানের ডেথ সুটে মাইক্রোফিল্মটা লুকানো আছে।

সাবধানে দালানটার পিছন দিকে চলে এল রানা। এটা সরু একটা কাঁচা গলি, পায়ের নীচে ঢাকা নর্দমা, আবর্জনার স্তূপে পা ফেলে এগোতে হচ্ছে।

মন্ত্রণালয় বা আশপাশের অন্যান্য দালান নিস্তব্ধ হয়ে আছে। পকেট ফ্ল্যাশলাইট বের করে সরু অথচ শক্তিশালী আলো ফেলল রানা, কালচারাল ইনস্টিটিউটের ভিত বরাবর বেশ খানিক দূর

আলোকিত হয়ে উঠল। মাত্র দু'সেকেন্ড জ্বলল ওটা, তারমধ্যেই অনেক কিছু দেখে নিয়েছে রানা।

নিচু একটা পাঁচিল টপকালেই ইন্সটিটিউটের পিছনের উঠানে নামা যায়। তারপর সামনে পড়বে এক সারিতে কয়েকটা জানালা। ওগুলো বেযমেন্টের জানালা, প্রতিটি লোহার জাল দিয়ে মোড়া।

পাঁচিল টপকাতে কোন সমস্যা হলো না। চারটে জানালা, প্রথমটার সামনে থেমে লোহার জাল পরীক্ষা করল।

পাতলা জাল, পকেট নাইফ কাজে লাগিয়ে কাঠের ফ্রেম থেকে ওটাকে খুলে ফেলতে তিন মিনিটের বেশি সময় লাগল না। অন্ধকারে হাতড়ে উইন্ডো ল্যাচ খুঁজছে রানা। নেই।

জানালাটা ভিতর থেকে বন্ধ করা। তারমানে ভিতরে ঢুকতে হলে কাঁচ ভাঙতে হবে।

মিউজিয়ামটা আরও তিন ফ্লোর উপরে, হাতে রুমাল জড়াবার সময় রানা ভাবছে, সেখানে পৌঁছাবার আগে আরও কত রকমের বাধার সামনে পড়তে হয় কে জানে।

দম আটকে কাঁচে ঘুসি মারল রানা। লিনেন রুমাল ব্যথা পেতে দেয়নি, আওয়াজও খানিকটা দমিয়ে রাখল। মৃদু ঝন ঝন শব্দে ভেঙে গেল কাঁচটা।

ভিতরে হাত গলাতেই ল্যাচ বা ছিটকিনি পেয়ে গেল রানা। সেটা সাবধানে নামাল ও, খেয়াল রাখছে ভাঙা কাঁচ লেগে হাত না কেটে যায়। বহু বছর এই জানালা খোলা হয় না, তাই উপরে উঠে যাবার সময় ক্যাচক্যাচ করে উঠল।

জানালা দিয়ে গলে ভিতরে ঢুকল, তারপর ধীরে ধীরে সিধে হয়ে দাঁড়াল রানা। অন্ধকার এখনও গাঢ় আর দুর্ভেদ্য। জানালাটা ধরে সাবধানে নামাল ও, যাতে কোন শব্দ না হয়। তারপর

ফ্ল্যাশলাইটটা জ্বালল।

কিউরেটর ভদ্রলোক মিউজিয়ামের বাইরে টহল গার্ড থাকবে কিনা রানাকে বলেননি। যদি থাকে তা হলে তাদের চোখে ধরা পড়বে যে জানালাটা ভাঙা হয়েছে।

গুমোট, ভ্যাপসা একটা গন্ধ পাচ্ছে রানা। টর্চের আলোয় দেখল, এটা একটা স্টোররুম। মৃৎশিল্প, চিনামাটির কাজ, শ্বেতপাথরের সিংহ, অসংখ্য বুদ্ধমূর্তি দেখা যাচ্ছে–তবে সবই ভাঙা।

এ-সবের মাঝখানে হিনথা গঙ-ও রয়েছে–পৌরাণিক সেই পাখি, উঠে আসছে সমুদ্র থেকে।

কাঠের স্ট্যাচুর পিছনে সিলিং ছুঁয়েছে একটা র‍্যাক, তাতে সাজানো রয়েছে প্রাচীন মৃৎশিল্পের অসংখ্য নিদর্শন।

আর্কিওলজিক্যাল আবর্জনার ভিতর দিয়ে পথ করে নিয়ে এগোচ্ছে রানা। সামনে একটা দরজা পড়ল, স্টোররুম থেকে বেরুবার পথ।

কিন্তু সেটা বাইরে থেকে বন্ধ।

'সিসেম খুল্ যা' বললেই দরজা খুলে যাবে, এরকম কিছু আশা করেনি রানা। তবে এ-ধরনের বাধা ওর কাজটাকে আরও জটিল করে তুলছে, বিশেষ করে ও যেখানে কোন শব্দ করতে চাইছে না। যাই হোক, সম্ভাব্য বাধার কথা মনে রেখে তৈরি হয়েই এসেছে ও।

ব্রেস্ট পকেট থেকে লম্বা, চৌকো একটুকরো অ্যাসিটেইট বের করল রানা। জিনিসটা কাগজের মত পাতলা। এটা সিঁধেল চোরদের অতি পুরানো একটা কৌশল, রানা এখন দ্রুত কাজে লাগাচ্ছে। দরজার ফাঁকে প্লাস্টিকের টুকরোটা ঢুকিয়ে নীচের

কালো নকশা

দিকে, তালার দিকে, ধীরে ধীরে নামিয়ে আনছে ও। তালাটাকে পাশ কাটিয়ে আরও নামল ওটা।

তার মানে প্রথমবারে কাজ হয়নি। তবে এত তাড়াতাড়ি হাল ছাড়বে না রানা।

আকেরবার চৌকো অ্যাসিটেইট দরজার ফ্রেম আর দরজার কবাটের মাঝখানে ঢোকাল রানা, অনুভব করল মরচে ধরা ধাতব তালায় লাগল ওটা; তারপর, আগের বারের চেয়ে একটু বেশি জোরে চাপ দিল নীচের দিকে। পুরস্কার হিসাবে কপালে জুটল মৃদু ক্লিক।

তারপর ডোরনব ধরে মোচড় দিল রানা, আরেকটা ক্লিক করে সেটাও সবটুকু ঘুরে গেল। নিঃশব্দ পায়ে, সতর্ক চোখে, কান খাড়া করে স্টোররুম থেকে বেরিয়ে এল ও।

চওড়া একটা করিডর এটা, সিলিঙের ঠিক নীচেই কয়েক সারি গরম আর ঠাণ্ডা পানির পাইপ দেখা যাচ্ছে, সমান্তরাল এগিয়ে বেযমেন্ট স্টোরেজ রুমের দিকে চলে গেছে। দরজাটা সাবধানে বন্ধ করে ডান দিকে এগোল রানা। এখন পর্যন্ত সব ঠিক আছে।

পঞ্চাশ ফুট পর হঠাৎ করে শেষ হয়েছে হলওয়ে। এখানে বেযমেন্ট করিডরে এসে মিলিত হয়েছে পুরানো, প্রতিবাদমুখর কাঠের সিঁড়ি। এক হাতে রেইলিং ধরে প্রতিবার একটা করে ধাপ টপকাচ্ছে রানা, গলাটা বকের মত উঁচু করে দেখতে চেষ্টা করছে ল্যান্ডিঙের মাথায় ওর জন্য কেউ অপেক্ষা করছে কিনা।

কেউ নেই। ইঁদুরের চেয়ে বড় আর কিছু না দেখে দোতলা পার হয়ে এল রানা, অন্ধকারে ওটা ওকে পাশ কাটাবার সময় চোখ থেকে লালচে আভা বেরুতে দেখা গেল।

আরেক প্রস্থ সিঁড়ি পেরোল রানা, এখন আগের চেয়েও সতর্ক।

এবারও কেউ ওকে বাধা দিচ্ছে না। কয়েক মুহূর্ত পর একটা ল্যান্ডিঙে পৌঁছাল রানা। এখান থেকেই চারতলার ফ্লোরে যাওয়া যায়। কালচারাল ইন্সটিটিউট আর ন্যাশনাল মিউজিয়ামটা এই ফ্লোরেই।

মিউজিয়ামে হান সাম্রাজ্যের প্রদর্শনী চলছে।

মেটাল সেফটি ডোরটা আধুনিক, তবে তালা দেওয়া নয়। বার-এ চাপ দিতেই কাঁপতে কাঁপতে ভারী দরজা সামান্য খুলে গেল, কোন রকমে ভিতরে ঢুকতে পারল রানা। ল্যান্ডিঙে কংক্রিট ছিল, তার বদলে পায়ের নীচে প্রথমে কাঠ মোড়া মেঝে দেখা গেল, তারপরই মার্বেল।

নিঃশব্দে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, ক্ষীণ আলোর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে চোখ দুটোকে। সামনে, উপর দিকে, রাজকীয় আলখেল্লা ঝুলছে, শিরস্ত্রাণসহ; পথ নির্দেশ পেতে সাহায্য করল রানাকে।

ওই গ্যালারি পার হয়ে হল-এ যেতে হবে রানাকে। ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী ওই হলেই দেখানো হচ্ছে। প্রচুর মিউজিয়াম কেস রয়েছে, আড়াল হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু প্রদর্শনী বা তু ওয়ানের ডেথ সুটের এত কাছাকাছি এসে কোন রকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না রানা। খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার, অবিশ্বাস্যই বলতে হবে, এখন পর্যন্ত কোন গার্ডই ওর চোখে পড়েনি। কিন্তু এতক্ষণ তাদেরকে দেখেনি বলে এটা ধরে নেওয়া বোকামি হবে এখানেও তারা নেই।

কাজেই এক ঘর থেকে আরেক ঘরে হেঁটে গেলেই চলবে না। রানাকে এগোতে হবে যথাসম্ভব সাবধানে আর সময় নিয়ে।

জায়গাটা স্টোররুমের মত অন্ধকার নয়। করিডরের উল্টোদিকের দেয়ালে খানিক পর পর একটা করে লো-ওয়াটের

বালব জ্বলছে। ছায়ায় দাঁড়িয়ে রানা এই মুহূর্তে ধৈর্যের প্রতিমূর্তি। রোলেক্সের আলো জ্বেলে সময় দেখল ৩–১:০৯। সময়ের চেয়ে যেহেতু পিছিয়ে নেই, তাই অপেক্ষা করতেও আপত্তি নেই।

তিন মিনিট পর, অবশেষে, পা বাড়াল রানা। কিছুই ঘটল না, মান্দালয় গ্যালারির প্রবেশ পথে পৌঁছে গেল। কিন্তু ওখানে থামতে না থামতে ছলকে উঠল বুকের রক্ত। পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে সরে এল।

পায়ের আওয়াজ!

কোত্থেকে আসছে বোঝার জন্য কান পাততে হলো রানাকে। সন্দেহ হলো, হল-এর শেষ মাথার দিকে হাঁটছে কেউ।

দ্রুত সরে এসে একটা মিউজিয়াম কেসের আড়ালে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়েছে রানা। আওয়াজটা বাড়ছে–মার্বেলের সঙ্গে লেদারের ঘর্ষণ–ক্রমশ এগিয়ে আসছে ওর দিকে, নিয়মিত একটা ছন্দে।

কান পেতে শুনছে রানা, আওয়াজটা অস্থির বলে মনে হচ্ছে না। তারমানে এখনও কিছু সন্দেহ করেনি সে।

লোকটা রোগা; সরু মুখ, প্রায় ছ'ফুট লম্বা, বয়স হবে ত্রিশ-বত্রিশ। কাঁচ আর কাঠের তৈরি কেসগুলোর মাঝখান দিয়ে হেঁটে আসছে সে–এটাকে একটা প্যাসেজই বলা উচিত, দু'পাশে আরও একটা করে, একই মাপের কেস।

উঁকি দিয়ে তাকিয়ে ছিল রানা, লোকটা পনেরো ফুট দূরে থাকতে পুরোপুরি আড়ালে সরে এল। ইতিমধ্যে হিপ-এ পরা হোলস্টারটা দেখা হয়ে গেছে ওর, গোল আকৃতির বাঁটের শেষ প্রান্ত দেখে কোল্ট .৩৮ পিস্তলটাও চিনতে পেরেছে।

ওটা একটা পুলিশ পজিটিভ স্পেশাল, এমন একটা হ্যান্ডগান যার ডাবল-অ্যাকশন মেকানিজমের কারণে হাঁটার ছন্দে এতটুকু

বিঘ্ন সৃষ্টি না করে ছয় রাউন্ড গুলি করতে পারবে গার্ড, হ্যামার ম্যানুয়ালি কক করারও দরকার হবে না।

রানা ধারণা করল, গোটা মিউজিয়ামে এত রাতে খুব বেশি হলে ছয় থেকে আটজন গার্ড আছে। এত বড় একটা জায়গার তুলনায় কমই বলতে হবে। তবে সেটা পুষিয়ে নিচ্ছে প্রহরীদের অস্ত্র। পিস্তল ছাড়াও তাদের কাঁধে একটা করে অটোমেটিক কারবাইন ঝুলতে দেখেছে রানা, দেখেছে কোমরে গোঁজা বড় আকৃতির ছোরা।

গার্ড গ্যালারি থেকে না বেরুনো পর্যন্ত ছায়ায় অপেক্ষা করল রানা। পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে যাবার পরও বেশ কয়েক মুহূর্ত নড়ল না। তারপর ধীরে ধীরে সরু প্যাসেজটায় ঢুকে হল-এর দিকে পা বাড়াল।

সামনে মার্বেল পাথরের একটা খিলান পড়ল। তার পাশে কোন রকমে খাড়া করা একটা টিকিট স্ট্যান্ড, আর তারপরই, অবশেষে...

হঠাৎ ভূত দেখার মত চমকে উঠল রানা। সাদা একজোড়া মূর্তি! তারপর পরিষ্কার হলো, সারা গায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধেছে—এটা ওদের ছদ্মবেশ!

কুত্তার বাচ্চা! দাঁতে দাঁত চেপে গালি দিল রানা। সেই সঙ্গে স্যাঁৎ করে পিছিয়ে এল।

সেই সিআইএ বক্সার আর বিআইবি বাচাল—সাদা কোট আর লাল টাই—ওকে হারিয়ে দিয়ে ওর আগে পৌঁছে গেছে এখানে!

কঠোর পরিশ্রম করছে লোক দু'জন। একটা মিউজিয়াম কেসের মাথা থেকে ভারী কাঁচের ঢাকনিটা সরাবার চেষ্টা করছে। রানা জানে, ওই কেসটাতেই রয়েছে তো ওয়ানের ডেথ সুট—জেড পাথর, সোনার পাত আর সোনার তার দিয়ে তৈরি।

কেসটার কয়েক ফুট দূরে, মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে দু'জন গার্ড। পড়ে থাকার ভঙ্গিটাই বলে দিচ্ছে জ্ঞান নেই ওদের।

রানার চিন্তা-ভাবনায় একটা পরিবর্তন আসছে। সিআইএ আর বিআইবি-কে নিয়ে এখন তেমন উদ্বিগ্ন নয় ও। ভাবছে, খাটনির কাজগুলো করছে করুক ওরা। সঙ্গে পিস্তল আছে, কাজেই চিন্তার কিছু নেই।

সন্দেহ নেই এইমাত্র এখানে পৌঁছেছে ওরা, কারণ শেষ যে গার্ডটাকে দেখেছে ও সে এদিক থেকেই গেছে।

এই মুহূর্তে নিঃশব্দে কাজ করছে ওরা। কাছাকাছি থাকায় রানা শুধু ওদের নিঃশ্বাসের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। কাঁচের ঢাকনিটা খুব ভোগাচ্ছে ওদেরকে। ছোট আকৃতির অনেকগুলো টুল-এর সাহায্যে পালিশ করা কাঠের বেইস বা ভিত থেকে ওটাকে আলাদা করতে ঘেমে নেয়ে উঠছে ওরা। কাঠের ভিতটা এক ধরনের প্লাটফর্ম, যেটার গায়ে ফিউনেরারির আর্মার বিছিয়ে রাখা হয়েছে।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা, দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে গোটা মান্দালয় গ্যালারি দেখে নিল। কিছুই নড়ছে না। আবার যখন ঘাড় সোজা করল, দেখল লোক দু'জন ঢাকনিটার একটা দিক খুলতে পেরেছে।

'ধীরে ধীরে, সাবধানে,' সাদা সুটকে ফিসফিস করতে শুনল রানা।

তার সঙ্গী মাথা ঝাঁকাল, কাঁচের পাশ দিয়ে নীচে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার ঢুকিয়ে চাপ দিল। কাঠ ককাচ্ছে, কাঁচের ঢাকনি ঝাঁকি খেয়ে আগুপিছু করছে, তারপর হঠাৎ কেসের ভিত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে এল।

‘সাবধান!’ আবার বিড়বিড় করল সাদা সুট। ঢাকনির একটা প্রান্ত ধরে আছে সে, এবার সাদা টাই অপরপ্রান্তটা ধরল। দু’জন মিলে ধরাধরি করে স্বচ্ছ ঢাকনিটা মিউজিয়াম কেসের উপর থেকে তুলল, ডেথ সুট থেকে উঁচু করল আরও ফুট খানেক। তারপর ধীরে ধীরে একপাশে সরাল ওটাকে, বেরিয়াল আর্মারকে ছাড়িয়ে না যাওয়া পর্যন্ত থামল না।

‘এবার নামাও,’ সাদা কোট বলল, ঢাকনিটা মার্বেল মেঝেতে নামাতে সাহায্য করছে। এক মুহূর্ত পরই আর্মারটা হাতড়াতে শুরু করল সে, একের পর এক সেকশনগুলো তুলে মাইক্রেফিল্মটা খুঁজছে।

নাক গলাবার কোন কারণ দেখছে না রানা। আগে জিনিসটা পাক ওরা, তারপর ছিনিয়ে নিতে কতক্ষণ।

ডেথ সুটে মাইক্রোফিল্মটা যদি থাকেও, নিশ্চয়ই খুব ভালোভাবে লুকানো আছে, যত্ন করে আর সময় নিয়ে খুঁজতে হবে। কিন্তু তার সুযোগ পাওয়া গেল না, কারণ মান্দালয় গ্যালারির অপর প্রান্ত থেকে জোরাল প্রতিধ্বনি ভেসে এল–সন্দেহ নেই কয়েক জোড়া পায়ের আওয়াজ ওগুলোর উৎস।

মাথা নিচু করে পিছিয়ে এল রানা, গার্ডরা ওকে যাতে দেখতে না পায়। ওদিকে সাদা সুট আর ভাঙা আঙুল ক্ষিপ্র বেগে আবার জায়গা মত বসাচ্ছে কাঁচের ঢাকনিটা। কাজটা শেষ হতেই পাশের একটা ডিসপ্লের পিছনে গা ঢাকা দিল তারা।

পায়ের আওয়াজ জোরাল হচ্ছে, তবে ছন্দে একটা অনিশ্চয়তার সুর; যেন হান প্রদর্শনীতে ফেরার পথে লোকগুলোর মনে কোন কারণে সন্দেহ জেগেছে। হয়তো দু’জন গার্ডের অনুপস্থিতিটাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারছে না। ফিরে

আসার কারণ যাই হোক, ব্যস্ততার মধ্যে উদ্বেগ টের পাওয়া যাচ্ছে।

খিলান আর টিকিট কাউন্টার-এর কাছাকাছি চলে এসেছে তারা। কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। তারপর থমকে দাঁড়াল। রানার কাছ থেকে ছয় ফুট দূরেও নয়। একজোড়া হাত একযোগে পুলিশ পজিটিভ স্পেশাল ছুঁতে যাচ্ছে।

তারপরই অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকা গার্ড দু'জনকে দেখতে পেল তারা। একজনকে খানিক আগে দেখেছে রানা—মুখটা সরু, প্রায় ছ'ফুট লম্বা। সে-ই অজ্ঞান সঙ্গীদের দিকে ছুটে এল। দ্বিতীয় গার্ড পিস্তল বের করে অন্ধকার এগজিবিট হলে পা রাখল।

এখন যদি রানা কিছু না করে, অপরাধ যে লাভজনক তার জ্যান্ত প্রমাণ হয়ে থাকবে সাদা কোট আর সাদা টাই। সেটা ঘটতে দিতে চায় না ও। এমন কিছু করতে হবে যাতে নিজের উপস্থিতি গোপন রেখে ওদের পালানোর পথ বন্ধ হয়ে যায়।

পকেটে হাত ভরে এক মুঠো কিয়াত বের করল রানা। সাদা ব্যান্ডেজে মোড়া ব্রিটিশ আর আমেরিকা কোথায় লুকিয়েছে জানে ও। কয়েনগুলো ছুঁড়ে দিল সেদিকে।

নিস্তব্ধতার ভিতর মার্বেল পাথরের মেঝেতে ঝনঝন শব্দ তুলে গড়িয়ে গেল ওগুলো। গার্ড দু'জনের গলা থেকে একযোগে আঁতকে ওঠার আওয়াজ বেরুল। পরমুহূর্তে চিৎকার জুড়ে দিল, অন্যান্য সঙ্গীদের সাবধান করছে।

গার্ডদের চিৎকার শুনে সিআইএ আর বিআইবি ভয়ানক নার্ভাস হয়ে পড়ল। প্রথমে ভাঙা আঙুল, তার পিছু নিয়ে সাদা কোট আড়াল থেকে বেরিয়ে খিঁচে দৌড় দিল—গ্যালারির শেষ মাথার দিকে যাচ্ছে।

কিন্তু ইউনিফর্ম পরা দুই গার্ড এত সহজে চোরদের পালাতে দেবে না, পিছু নিয়ে তারাও ছুটছে।

একটা গুলি করল তাদের একজন। দেখাদেখি দ্বিতীয় লোকটাও। প্রথম গার্ড আরেকবার টার্গেট প্র্যাকটিস করল। তার এই দ্বিতীয় বুলেটটাই লাগল ভাঙা আঙুলকে।

লোকটা প্রথমে খোঁড়াল। তারপর দেখা গেল পা দুটো তার ভার বইতে একদমই রাজি নয়। ব্যথায় ঘড়ঘড় করে তরল একটা আওয়াজ করল মুখ দিয়ে, তারপর কাশল, কাশির সঙ্গে হড়হড় করে বেরিয়ে এল তাজা রক্ত, পর মুহূর্তে ঢলে পড়ল মেঝেতে।

মৃত্যু যন্ত্রণায় মেঝেতে ছটফট করছে সে, সেটা দেখার জন্য ওখানে দাঁড়িয়ে থাকার বান্দা সাদা কোট নয়। হাজার হোক বেনিয়ার জাত; নিজের লাভ ভালোই বোঝে। সরু করিডরে বেরিয়ে পড়ল সে, থাইগন লোবাঙের খোঁজে কাল যে করিডরে পা পড়েছিল রানার।

তবে গার্ড দু'জন একজন চোরকে ফেলে দিয়ে সন্তুষ্ট নয়। নিজেদের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে সাদা কোটকে ধাওয়া করল তারা। আরও দুটো গুলির আওয়াজ শুনল রানা।

তিনটে পড়ে থাকা দেহ ছাড়া হল আবার খালি হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে শুধু ভাঙা আঙুলের অবস্থাই করুণ।

ফার্স্ট এইড দেবার মত সময় বা ইচ্ছে, কোনটাই নেই রানার। তা ছাড়া, অনেক দেরিও হয়ে গেছে। ভাঙা আঙুলের কপাল অবশেষে সত্যি পুড়েছে।

আবারও গুলির আওয়াজ শুনল রানা, তবে আরও দূরে, কাজেই ইতস্তত না করে মিউজিয়াম কেসটার দিকে এগোল ও। সময় কম, দ্রুত শেষ করতে হবে কাজ। মেঝেতে পড়ে থাকা গার্ড

দু'জন যে-কোন মুহূর্তে জ্ঞান ফিরে পেতে পারে। যে-দু'জন বিআইবি-র পিছু নিয়েছে, এখুনি আবার গ্যালারিতে ফিরে আসার কথা তাদের। এমনকী গার্ডদের তৃতীয় জোড়া, যারা মিউজিয়ামের অন্য কোথাও ডিউটি দিচ্ছে, সঙ্গীদের বিপদে সাহায্য করতে চলে এলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

রানার ইচ্ছে নয় ক্রস ফায়ারে মারা পড়ে।

এতক্ষণে মিউজিয়ামের চারদিকে অ্যালার্ম বেজে উঠল। রানা তাড়াহুড়ো করছে ঠিকই, কিন্তু আরেক জোড়া হাতের সাহায্য ছাড়া কাঁচের ঢাকনিটা ভালো করে ধরতেই পারছে না। অনেক কষ্টে একটা প্রান্তের দুই কোণ ধরে উঁচু করল, তারপর বার কয়েক সামনের দিকে ঠেলে আর পিছনদিকে টেনে আসা-যাওয়ার পথটা যথাসম্ভব সাবলীল করে নিল, সবশেষে নিচু করল মেঝের দিকে। কাঁচটা যদি ভাঙে, ছুটে এসে মৌমাছির মত ছেঁকে ধরবে ওকে গার্ডরা। কাজেই সময় দ্রুত ফুরিয়ে এলেও অত্যন্ত সাবধানে কাজ করতে হচ্ছে ওকে।

কাঠের প্ল্যাটফর্মের পাশে ঢালু করে রাখল রানা ঢাকনিটাকে, ঠেক দেওয়ার ভঙ্গিতে; তারপর কাজ শুরু করল।

যতটুকু ভেবেছিল জেড আর্মার তারচেয়েও বেশি ভারী। প্রতিবার বেরিয়াল সুটের শুধু একটা অংশ মাত্র তোলা সম্ভব। প্রথমে ডান পা ধরে তুলল রানা, তারপর বাম পা। এভাবে হাত দুটোও। সবশেষে মাথাটা উঁচু করল, ধড়টা সামনে ঠেলে বাঁকা করল। জেড অর্ধচন্দ্র আর চাকতিটাও নাড়াচাড়া করল ও, তোউ ওয়ান-এর ফিউনারারি সুটের পাশে সাজানো রয়েছে।

কিন্তু মাইক্রোফিল্মের রোলটা কোথাও পাচ্ছে না।

অন্য কেউ হলে আর কিছু দেখার নেই ভেবে হাল ছেড়ে দিয়ে

চলে যেত। কিন্তু মাসুদ রানার কাজের পদ্ধতি আলাদা।

ঠিক আছে, ভাবল ও, জিনিসটা কোথায় লুকানো হয়েছে? আরে, মাথা ঘামাও! আর কোথায় লুকানো সম্ভব?

জেড পাথর পরস্পরের সঙ্গে জোড়া লেগে আছে সোনার তারের সাহায্যে। সুটটা ফাঁপা হলেও, তার ভেঙে ভিতরে ফিল্ম ঢুকিয়ে রাখার মত উদ্ভট চিন্তা চৌ মিন বা তার অনুগত কোন লোকের মাথায় আসবে না। সুটের এ-ধরনের ক্ষতি কারও না কারও চোখে পড়তই, হয়তো আর্মারটা বেইজিং থেকে রওনা হবার আগেই। সুটের ভিতর, ফাঁপা জায়গাটায়, আঙুল বুলাল রানা। কিছু নেই। কয়েকটা পাথর নাকের ব্রিজ তৈরি করেছে, ব্রিজের ভিতর আঙুল ঢুকিয়েও কিছু পেল না।

লাইনিংটা দেখা দরকার, ভাবল রানা।

মেরুন রঙের ফেল্ট শয্যায় বিছিয়ে রাখা হয়েছে ডেথ সুটটাকে, ফলে জেডের নীল-সবুজ রঙটা ভালোভাবে ফুটেছে। ফেল্ট-এর একটা প্রান্ত ধরে টানতে শুরু করল রানা। নগ্ন, অসমাপ্ত সারফেসের সঙ্গে আঠা দিয়ে আটকানো জিনিসটা। প্লাটফর্মের পাশগুলো পালিশ করা ঝকঝকে, কিন্তু মেঝেটা কাঁচা কাঠ। রানা আশা করছে, ফেল্টের নীচে কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে রোলটা। লুকাবার পর জায়গাটার উপর আঠা লাগানো ফেল্ট ফেলা হয়েছে।

ওর দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, কাজটা শেষ করতে পারল না।

দশ

বিরতিহীন অ্যালার্মের শব্দকে ছাপিয়ে উঠল গার্ডদের ছুটে আসার আওয়াজ।

ঝট করে ফেল্ট ছেড়ে দিয়ে ঢাকনির কিনারা ধরল রানা, তো ওয়ানের ডেথ সুটের উপর টেনে আনল ওটাকে। অন্তত প্রথমদর্শনে কারও মনে হবে না এখানে কিছু নাড়াচাড়া করা হয়েছে।

তারপর ছুটল রানা। খিলান আর টিকিট ঘর পার হয়ে এল। ওর চারদিক থেকে ভেসে আসছে উত্তেজিত, উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর–বোঝা যাচ্ছে না কোন্‌টা ধ্বনি আর কোন্‌টা প্রতিধ্বনি।

একটা থামের আড়ালে একবার থামল রানা। কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে চারজন গার্ডকে ছুটে যেতে দেখল ও। এদের মধ্যে দু'জনকে আগেও দেখেছে।

গ্যালারির আরেক প্রান্তে ঝাপসা মত নড়াচড়ার আভাস পাওয়া গেল, তার মানে পাশের কালচারাল ইন্সটিটিউট থেকেও গার্ডরা ছুটে আসছে।

মিউজিয়ামটা দ্রুত একটা পাগলাগারদ হয়ে উঠছে। এরপর

নিশ্চয়ই কিউরেটর থাইগন লোবাংকে ডাকা হবে।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, কারও চোখে না পড়ে, মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছে রানা। দেয়াল ঘেঁষে এগোচ্ছে ও, আড়াল হিসাবে পাচ্ছে কেসগুলো, সারাক্ষণ খেয়াল রাখছে কেউ ওকে পালাতে দেখছে কিনা। আগেই ঠিক করেছে–যে পথ দিয়ে ঢুকেছে বেরুবার জন্য সেটাই সবদিক থেকে ভালো, স্টোর রুমে ফিরে ভাঙা জানালাটা ব্যবহার করবে।

তবে ব্যাপারটা অত সহজ হলো না।

হলের শেষ মাথা পর্যন্ত নির্বিঘ্নেই পৌঁছাল রানা, তারপর দেখল সিঁড়িতে যাবার পথ বন্ধ। তাই বলে ঘাবড়াল না। সাদা কোট যদি গার্ডদের ফাঁকি দিতে পারে, ওরও না পারার কোন কারণ নেই। অবশ্য ফাঁকি দিতে গিয়ে লোকটা ধরা বা গুলি খেয়েছে কিনা জানা নেই রানার। জানার কোন উপায়ও নেই। তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত ও–মিউজিয়াম থেকে বেরুতে না পারলে ডালে বসা পাখির মত অনায়াসে গুলি করে মারা হবে ওকে।

মেটাল সেফটি ডোরের সামনে পায়চারি করার ভঙ্গিতে টহল দিচ্ছে প্রকাণ্ডদেহী একজন গার্ড, .৩৮ কোল্টটা হাতে। স্নায়ুর জন্য ভয়ানক পীড়ন, আরেকটা অ্যালার্ম বেজে উঠল। কী চিন্তা করছে না করছে, নিজেরই অসুবিধে হচ্ছে বুঝতে। হয়তো অমূলকই, একটা ভয় ঢুকল মনে।

এভাবে অ্যালার্ম বাজতে থাকলে সামরিক জান্তার নির্দেশে মায়ানমার আর্মি না ছুটে আসে।

গার্ডটাকে গুলি করে ফেলে দিল রানা–ব্যস, ঝামেলা শেষ; এবার নির্বিঘ্নে নিজের হোটেলে ফিরে নরম বিছানায় ঘুম দাও। এটা স্রেফ কল্পনা, অবশ্য রানার জায়গায় অন্য কেউ হলে হয়তো

এই কল্পনাই বাস্তবে রূপ নিত, কিন্তু নির্দোষ একজনকে মেরে ফেলা ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

এখন পর্যন্ত গার্ডরা দু'জন চোর সম্পর্কে সচেতন—সাদা কোট আর সাদা টাই সম্পর্কে। আরও একজন বিনা অনুমতিতে মিউজিয়ামে ঢুকেছে, ভিতরেই লুকিয়ে আছে কোথাও, এটা তাদেরকে জানাবার কোন মানে হয় না।

শোল্ডার হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে একটা গুলি করল রানা। গরম সীসা বাতাস চিরে ছুটল, গার্ডের কাছ থেকে পঞ্চাশ ফুট দূরের একটা মার্বেল পিলারে লেগে বাঁক নিল আরেকদিকে। কয়েনের মত, গুলিটাও ছোঁড়া হয়েছে দৃষ্টি আর মনোযোগ সরাবার জন্য।

গুলির আওয়াজ হয়েছে, অমনি ডাইভ দিয়ে মেঝেতে পড়ল গার্ড, যেন আহত হয়েছে। তারপর যখন বুঝল অক্ষত আছে সে, যেদিক থেকে গুলি হয়েছে ক্রল করে সেদিকে এগোল, খেয়াল নেই যে সিঁড়ির মাথাটা কয়েক সেকেন্ডের জন্য হলেও অরক্ষিত পড়ে থাকবে।

মাত্র ওই কয়েক সেকেন্ডই দরকার ছিল রানার।

ত্রিশ ফুটও সরেনি গার্ড, ধাতব দরজা লক্ষ্য করে ছুটল রানা। ধাক্কা দিতেই খুলে গেল ওটা, বেরিয়ে যাবার সময় গার্ডের আঁতকে ওঠার আওয়াজ শুনতে পেল। প্রতিবার দু'তিনটে করে ধাপ টপকে নীচে নামার সময় সিকিউরিটি সাইরেন এখন ভোঁতা লাগছে কানে। ওর পিছু নিয়েছে ছুটন্ত একজোড়া পা। গার্ড ওকে পালাতে দেখেছে, এই পা নিশ্চয় তারই। রানা স্টোররুমে ঢোকার আগে সে বা তার কোল্টের গুলি ওর নাগাল না পেলেই হয় এখন।

ভাগ্যক্রমে স্টোররুমের দরজার তালা এখনও খোলা রয়েছে।

ভিতরে ঢুকে বোল্ট টেনে দিল রানা। গাঢ় অন্ধকার, টর্চ না জ্বাললে দেখতে পাবে না নিজের সামনে কী আছে। আলোর টানেলটা নিচু করে রাখল রানা, ধুলো ঢাকা মেঝের দিকে তাক করে। ক্যাটালগে তোলা হয়নি, কিংবা মেরামত করতে হবে, এরকম প্রচুর আর্টিফ্যাক্ট পড়ে আছে মেঝেতে; সেগুলোর ভিতর দিয়ে পথ করে নিয়ে এগোচ্ছে রানা। জানালার কাছে পৌঁছে টর্চ নিভিয়ে পকেটে রেখে দিল। ওয়ালথারটাও ফিরে গেল শোল্ডার হোলস্টারে। জানালা গলে বাইরে বেরুতে খানিকটা শারীরিক কসরৎ করার দরকার হলো। বেরিয়ে এসে তারের জালটা জায়গা মত আটকে দিল ও। তারপর রওনা হলো পিয়ারে স্ট্রিটের দিকে।

কী কপাল, এবারও বেশি দূর যেতে পারল না।

গলিটার সরাসরি মুখে আর্মির একটা জিপ দাঁড়িয়ে আছে, সামনেটা ভাসিয়ে দিচ্ছে হলুদ আলোর বন্যায়।

পিছিয়ে এল রানা। তারপর একটা দালানের পাঁচিলে পিঠ ঠেকিয়ে উল্টোদিকে এগোল। ওর কোন ধারণা নেই কোনদিকে যাচ্ছে বা কোন্ রাস্তা ধরলে তাড়াতাড়ি এলাকাটা ত্যাগ করা সম্ভব।

মিউজিয়ামে চোর বা ডাকাত যাই ঢুকে থাকুক, বোঝা গেল কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটাকে অত্যন্ত সিরিয়াসলি নিয়েছে। পুলিশকে না ডেকে, সরাসরি সামরিক বাহিনীকে খবর দিয়েছে। সন্দেহ নেই, তারা ভয় পাচ্ছে আন্তর্জাতিক মহলে না দুর্নাম রটে যায়। অমূল্য চাইনিজ আর্টিফ্যাক্ট-এর নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে মায়ানমারের সামরিক জান্তা, এ-ধরনের একটা খবর বিশ্ব মিডিয়া লুফে নেবে।

তারা যতই ভয় পাক, তাদের চেয়ে বেশি ভয় পাচ্ছে রানা। ওর মাথায় ঢুকছে না কীভাবে হোটেলে ফিরবে, বিশেষ করে

যেখানে মনে হচ্ছে কালচারাল ইন্সটিটিউটে গিজগিজ করছে আর্মি।

নর্দমার উপর দিয়ে হেঁটে একটা মেথর প্যাসেজের শেষ মাথায় চলে এল রানা। উঁকি দিয়ে মন্ত্রণালয়-এর ভবনটার একটা পাশ দেখতে পাচ্ছে এখান থেকে।

হতাশায় ছেয়ে গেল মনটা।

ভবনটার পাশে বড়সড় মাঠ আর বাগান, কাঁটাতারের উঁচু বেড়া দিয়ে ঘেরা। দ্বিতীয়টা আসলে স্কাল্পচার গার্ডেন, পাথর খোদাই করে বানানো প্রাচীন স্ট্যাচু দাঁড়িয়ে আছে চারদিকে। চেহারায় জ্ঞানী মহামানবের ছাপ, চোখে সবজান্তার দৃষ্টি, প্রকাণ্ড একটা বুদ্ধমূর্তি রানার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ওটার পিছনে তিন-তিনটে মাথা নিয়ে একটা হাতি আর স্মার্ট চালবাজ টাইপের একটা সিংহ দেখা যাচ্ছে, দুটোই যুদ্ধের প্রতীক। স্কাল্পচার গার্ডেন কয়েকটা ফ্লাডলাইটের আলোয় ভেসে যাচ্ছে। বাগানের আরেক দিকে মাঠ, সেখানে পুলিশের চার-পাঁচটা জিপ আর মাইক্রোবাস দেখা যাচ্ছে। ওগুলোর হেডলাইট জ্বলছে। সশস্ত্র পুলিশদের দেখা গেল গাড়ি থেকে নেমে লাইন ধরে কালচারাল ইন্সটিটিউটের ভিতর ঢুকছে। তাদের সবাই ইউনিফর্ম পরা নয়।

ছায়ায় সরে এসে কাঁধের উপর দিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। গলির মুখ বন্ধ করে এখনও সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে সেনাবাহিনীর জিপটা।

চিন্তা করছে রানা। ওর সামনে দুটো রাস্তা খোলা আছে, কোনটাই তেমন উৎসাহব্যঞ্জক নয়।

কাঁটাতারের বেড়া কেটে স্কাল্পচার গার্ডেনে ঢুকতে পারে, তারপর মাঠে। চার-পাঁচজন ড্রাইভার ছাড়াও দু'চারজন পুলিশ

থাকবে ওখানে, ওকে দেখে তাদের কী প্রতিক্রিয়া হবে বলা মুশকিল। চোর-ডাকাতদের সদস্য মনে করে গুলি চালালেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আরেকটা উপায় হলো, নিঃসঙ্গ জিপ লক্ষ্য করে সোজা হাঁটা। আশা করা যায় ড্রাইভার ছাড়া আর হয়তো একজন লোক আছে ওটায়। ভাগ্য প্রসন্ন হলে একা শুধু ড্রাইভার। ওর হাতে যদি পিস্তল থাকে, আর ভাব দেখে মনে হয় চোর-ডাকাতদের ধাওয়া করছে, ড্রাইভারকে বোকা বানানো সম্ভব হলেও হতে পারে।

দেখা যাক।

কোন রকম দ্বিধা না করে সোজা জিপটার দিকে রওনা হয়ে গেল রানা। প্রতিপক্ষ হিসাবে আট-দশজনকে কে চায়, এক-দু'জনকে মেনে নেওয়ার সুযোগ থাকলে?

হনহন করে হাঁটা ধরলেও, জিপটার আড়াল থেকে কর্তৃত্বের সুরে একজনকে কথা বলতে শুনে গতি কমাল রানা, দেয়াল ঘেঁষে এগোল।

'এই যে, তুমি, ঘুরে পিছনদিকে চলে যাও,' অনুবাদ করল রানা। তারপর শুনতে পেল, 'শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থেকো না। আমি চাই ফ্লোরগুলোর প্রতি ইঞ্চি সার্চ করবে তোমরা। আরেকটা কথা, সন্দেহ হলে পুলিশকেও সার্চ করতে পারবে তোমরা।'

আরেকটু এগোতে লোকটাকে দেখতে পেল রানা, নেহাতই বোকার মত হেডলাইটের আলোয় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ইউনিফর্ম বলে দিল ক্যাপটেন। সঙ্গের লোকজন এইমাত্র চলে গেছে, ক্যাপটেন কথা বলছে ওয়াকি-টকিতে।

ইতিমধ্যে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে রানা, হন্তদন্ত একটা ভাব নিয়ে ক্যাপটেনের দিকে এগোচ্ছে, হাতে পিস্তল। নির্দেশ

দেবার মাঝপথে ওকে দেখতে পেয়ে সন্দেহ নয়, রাগ হলো তার। ওয়াকি-টকি বন্ধ করে এগিয়ে এল, খেয়াল নেই হেডলাইটের তৈরি আলোর টানেল থেকে বেরিয়ে আসছে। 'দল ছেড়ে এদিকে কী?' খেঁকিয়ে উঠল সে। 'থামুন! আপনাকে সার্চ করব আমি!'

প্রথমে দুই হাত মাথার উপর তুলল রানা, থামল একটু পরে–ক্যাপটেনের একেবারে সামনে পৌঁছে। 'কয়েকজনকে ধাওয়া করছি আমরা,' বার্মিজ ভাষায় বলল ও, 'ফলে দলটা ভেঙে গেছে...'

'পিছন ফিরে দাঁড়ান!' নির্দেশ দিল ক্যাপটেন।

'তোমার কথা আমি শুনব কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'বিশেষ করে তোমার অস্ত্র যখন হিপে, আর আমারটা হাতে?'

বিদ্যুৎ খেলে গেল ক্যাপটেনের শরীরে। হিপ হোলস্টার থেকে পিস্তলটা প্রায় বের করে এনেছে। রানার উঁচু করা হাতটা এবারও দ্রুত নেমে এল সরাসরি তার চাঁদির মাঝখানে। কত জোরে মারতে হবে, দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা থেকে মাপটা জানা আছে; ফলে মাত্র ঘণ্টাখানেকের জন্য জ্ঞান হারাল ক্যাপটেন। খপ করে ধরে ফেলায় সটান আছাড় খেয়ে আহতও হলো না।

দেয়াল ঘেঁষে তাকে শুইয়ে দিল রানা, পকেট হাতড়ে চাবিটা বের করল, তারপর স্টার্ট দিয়ে ছেড়ে দিল জিপ।

গুলি হলো পরমুহূর্তেই, তবে জিপের পিছন থেকে। নিশ্চয়ই কেউ কিছু দেখে বুঝে ফেলেছে কী ঘটে গেছে এদিকে। স্পিড বাড়িয়ে গলি থেকে বেরিয়ে এল রানা। আরেকটা গুলি হলো, তবে এটাও টায়ার ছুঁতে পারেনি।

এগারো

মায়ানমারে আজ রানার দ্বিতীয় দিন।

মড়ার মত ঘুমাচ্ছিল ও, ঘন ঘন নক হওয়ায় ভেঙে গেল সেটা।

'সম্ভব? আমি নন্দিনী!' করিডর থেকে চিৎকার করছে মেয়েটা। 'তোমার ঘুম ভেঙেছে?'

'এক সেকেন্ড,' বিড়বিড় করল রানা। চোখে রাজ্যের ঘুম নিয়ে বিছানা থেকে নামল। নাগালের মধ্যে যা পেল তাই পরে সিটিং রুমে এসে দরজা খুলছে।

'সত্যি দুঃখিত,' বলল নন্দিনী, রানাকে শুধু একজোড়া শর্টস পরে থাকতে দেখে এতটুকু বিব্রত নয়। 'আমি ঠিক তোমার ঘুম ভাঙাতে চাইনি।'

তাকে ভিতরে টেনে নিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। 'না, ঠিক আছে,' ঘুম জড়ানো গলায় বলল ও। 'ক'মিনিট সময় দাও, মাথাটা ভার হয়ে আছে।'

'হ্যাঙওভার?' জিজ্ঞেস করল নন্দিনী। 'কিন্তু তুমি কি কাল রাতে খুব বেশি ড্রিঙ্ক করেছিলে?' বাথরুমের দরজা পর্যন্ত রানাকে

অনুসরণ করছে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

'হ্যাঁ, একটু বেশিই হয়ে গেছে,' মিথ্যে বলল রানা। ভাগ্যই বলতে হবে যে জানতে চাইছে না রাত দুপুরে তার কামরা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল কেন। কথাটা রাখতে পারল, নিজেকে পুরোপুরি সচেতন করে তুলতে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় নিল না ও। বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখল বেডরুমের একটা চেয়ারে বসেছে নন্দিনী, তার রূপের আলোয় ঝলমল করছে কামরাটা।

'পোর্টাররা কি বলাবলি করছে শুনবে? শুনলে তুমি বিশ্বাস করবে না!' বলল নন্দিনী, রানাকে কাপড় পরতে দেখছে।

'কী?'

'ন্যাশনাল মিউজিয়ামে ডাকাত ঢুকেছিল।'

'তুমি সিরিয়াস?'

'তাই তো শুনলাম। তুমি তো কাল প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলে, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল রানা, যতটা সম্ভব কম কথা বলতে চায়।

'আমিও তাই ভেবেছি,' ক্ষোভ মেশানো সুরে বলল নন্দিনী। 'মানে প্রদর্শনী দেখলে, কিউরেটরের সঙ্গে ডিনার খেলে। শুধু হতাশ নই, সম্ভব, মনে হচ্ছে আমাকে যেন ঠকানো হয়েছে।'

'তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না,' বলল রানা, শার্টের বোতাম লাগাচ্ছে।

'শোনো, ইয়াঙ্গুনে আমার আসার পিছনে অন্যতম কারণ ছিল হান সাম্রাজ্যের ওই প্রদর্শনীটা দেখা।'

'কে তোমাকে দেখতে বারণ করেছে?' আয়নার দিকে পিছন ফিরে নন্দিনীর সামনে দাঁড়াল রানা, কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখছে তাকে।

‘কে আমাকে দেখতে বারণ করেছে?’ রানার প্রশ্নটাই পুনরাবৃত্তি করল নন্দিনী। ‘আমার সন্দেহ হচ্ছে, এখনও তুমি ঘুমিয়ে আছ। কিংবা আমি হয়তো কথাটা বলিনি।’

‘বলোনি…কী?’ প্রায় একই নিঃশ্বাসের সঙ্গে আরও একটা প্রশ্ন করল রানা, যেন ব্যাপারটায় ওর তেমন আগ্রহ নেই, ‘খিদে পেয়েছে?’

‘ভীষণ।’ চেয়ার ছেড়ে সিধে হলো নন্দিনী। ‘দুঃখের বিষয়টা হচ্ছে, প্রদর্শনী বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে চিনারা। সমস্ত কিছু বেইজিঙে ফেরত যাচ্ছে।’

‘সত্যি? কেন?’ জিজ্ঞেস করল রানা, চেষ্টা করল উদ্বেগ আর উত্তেজনা চেপে রাখতে।

‘সম্ভব, তুমি কি সত্যি ঘুমাচ্ছ?’

মুখের সামনে হাত রেখে হাই তুলল রানা।

‘কেন আবার,’ ব্যাখ্যা করল নন্দিনী, ‘ডাকাত পড়েছিল, তাই।’

‘খারাপ কথা,’ বলল রানা, ভাব দেখাল সামান্য একটু হতাশ হয়েছে। তবে ঘুম ঘুম আধবোজা চোখের পিছনে পুরোপুরি সজাগ ও। সত্যি যদি আর্টিফ্যাক্টগুলো চিনে ফেরত নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে, যা করার দ্রুত করতে হবে ওকে।

নন্দিনীকে নিয়ে স্যুইট থেকে বেরুল রানা, দরজায় তালা দিল, এলিভেটরে চড়ে নেমে এল নীচের রেস্তোরাঁয়।

ব্রেকফাস্ট শুরু করে নন্দিনী জানাল, কাল ইয়াঙ্গুন ত্যাগ করছে সে। ‘এবার আমাকে পেগানে গিয়ে কাজে হাত দিতে হয়,’ বলল সে, চামচ দিয়ে প্লেটের মার্মালেড নাড়াচাড়া করছে। তারপর মুখ তুলে সরাসরি রানার চোখে তাকাল। ‘ক’টা দিন আমার সঙ্গে

বেড়াতে পারো না, সম্ভব? তোমার কী...আমার সান্নিধ্য তোমার ভালো লাগবে?'

'এ কী কথা বলছ! অবশ্যই তোমার সান্নিধ্য ভালো লাগবে। আসলে, বিলিভ মি, আমি নন্দিনী ফিভারে আক্রান্ত। তবে...'

'তবে?'

'তবে, মুশকিল হলো...'

'মুশকিল?' যেন বোমার মত বিস্ফোরিত হতে না পেরে ফুলছে মেয়েটা।

'মুশকিল হলো,' আবার বলল রানা, 'সত্যি আমার হাতে সময় নেই এবার। পরে...'

'ওহ্! স্টপ ইট!' ক্লান্ত আর পরিত্যক্ত লাগছে নন্দিনীকে।

'অনেস্ট টু গড। যদি সময় করতে পারতাম আমার চেয়ে খুশি বা ভাগ্যবান কেউ হত না।'

'যাক, নিজেকে অন্তত বলতে পারব যে চেষ্টার কোন ত্রুটি করিনি। আসলে মন দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে এখনও আমি নাবালিকাই রয়ে গেছি।'

'তুমি শুধু শুধু অভিমান করছ।' হাতছানি দিয়ে ওয়েটারকে ডাকল রানা, চেক সই করে বিল মেটাল, তারপর চেয়ার ছাড়ল। 'খেয়েই এভাবে দৌড়াতে পছন্দ করি না, নন্দিনী, কিন্তু...'

'না, ঠিক আছে; যাও তুমি, কাজ করো।' অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাকাল নন্দিনী, মৃদু শব্দ করে একটু হাসল, তারপর নিজের প্লেটের দিকে চোখ নামাল।

'তা হলে পরে দেখা হবে। হ্যাভ আ গুড ডে,' বলে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এল রানা। নন্দিনীর জন্য দুঃখ হচ্ছে ওর। দুঃখ নিজের জন্যও কম হচ্ছে না। সময় না থাকায় এভাবে বঞ্চিত হতে

কারই বা ভালো লাগে।

'হ্যালো, মিস্টার থাইগন লোবাং? আমি কুমার সম্ভব বলছি। এইমাত্র শুনলাম...হ্যাঁ, কী একটা জঘন্য কাজ। আশা করি কিছু চুরি যায়নি।'

'জঘন্য!' কিউরেটর ভদ্রলোক রানার কথাই পুনরাবৃত্তি করছেন। 'অতি জঘন্য! কারও কল্পনাতেও ছিল না ইয়াঙ্গুনে এ-ধরনের কিছু ঘটতে পারে। সবচেয়ে খারাপ কী হলো, জানেন? চিনারা ব্যাপারটাকে অত্যন্ত সিরিয়াসলি নিয়েছে।'

'শুনলাম ওরা নাকি প্রদর্শনী বন্ধ করে দিতে চাইছে,' বলল রানা, কণ্ঠস্বরে সহানুভূতি।

'ঠিকই শুনেছেন,' লোবাং বললেন। 'চাইছে মানে কী, বন্ধ করে দিয়েছে। এই মুহূর্তে প্রদর্শনীর আর্টিফ্যাক্ট বাক্সে ভরার কাজ সুপারভাইজ করছেন ওদের কালচারাল অ্যাটাশে।'

'ও।'

'ভাগ্য ভালো যে কোন কিছু চুরি যায়নি, তবে একটা বাক্সের কিছু ক্ষতি হয়েছে। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, চোরেরা জেড ফিউনেরারি আর্মারটার জন্য এসেছিল...'

'যেটা রাজকুমারী তো ওয়ানের জন্য তৈরি করা হয়?'

'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন, ওটার কথাই বলছি আমি। ভাবা যায় না!' ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কিউরেটর, কল্পনার চোখে রানা দেখল বাষ্প লেগে ঝাপসা হয়ে এল তাঁর চশমার কাঁচ। 'সারা রাত জেগে বসে ছিলাম আমি। গার্ডরা কেউ বলছে, লোক এসেছিল তিনজন। আবার কেউ বলছে চারজন।'

'চারজন?' জিজ্ঞেস না করে পারল না রানা।

‘হ্যাঁ। সন্দেহ নেই ডাকাতদের একটা গ্যাঙ।’

তা হলে মিস্টার এক্স এখনও পিছনে লেগে আছে, ভাবল রানা। অজ্ঞাতপরিচয় এবং রহস্যময় তৃতীয় পক্ষকে যদিও এখন পর্যন্ত দেখেনি ও, তবে সে নিশ্চয়ই দেখেছে ওকে। ‘কেউ হতাহত হয়নি তো?’ রানা আসলে জানতে চায় বিআইবি এজেন্ট সাদা কোটের কী পরিণতি হয়েছে।

‘হতাহত হয়নি মানে?’ রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কিউরেটর ভদ্রলোক। ‘বুঝতে পারছি, সমস্ত বিবরণ আপনি পাননি। দরকার নেই, বিকেলের কাগজে সব দেখতে পাবেন।’

‘বিকেলের কাগজে কেন?’

‘সরকারের কিছু বিধিনিষেধ আছে, মিস্টার সম্ভব, ফলে কী ছাপা যাবে না যাবে তা তথ্য মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে জেনে নিতে হয়।’ তারমানে মায়ানমারে সেন্সরশিপ চালু আছে, প্রেস-এর স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই।

‘ও, আচ্ছা, তা হলে হতাহতের ঘটনা...’

‘হ্যাঁ, ঘটেছে। আমাদের গার্ড গুলি করে মেরে ফেলেছে একজনকে। তবে তার পরিচয় জানা যায়নি। লোকটা বিদেশী, শ্বেতাঙ্গ। একটা হোটেলে আরেকজন শ্বেতাঙ্গের লাশ পাওয়া গেছে। সম্ভবত সে-ও আমাদের গুলিতে মারা গেছে। তবে আমাদের কেউ মারা যায়নি, শুধু দু’তিনজন আহত হয়েছে। আর একটা জিপ চুরি হয়েছে।’

‘বলেন কী! জিপ চুরি হয়েছে?’ কিছুটা স্বস্তি বোধ করছে রানা–যাক, সিআইএ আর বিআইবি-র অন্তত দু’জন এজেন্ট ওকে বিরক্ত করবে না।

‘হ্যাঁ। তবে পরে সেটা পাওয়াও গেছে ইরাবতী নদীর কাছে।’

‘যাক, তবু ভালো। তবে দুঃখ কি জানেন, ভেবেছিলাম আর্টিফ্যাক্টগুলো আরেকবার দেখব, কিন্তু তা আর হলো না। আপনি নিশ্চিত, মিস্টার লোবাং, সিদ্ধান্তটা ওরা বদলাবে না?’

‘নাহ্, প্রশ্নই ওঠে না। বললাম না, আর্টিফ্যাক্ট সব বাক্সে ভরে ফেলছে ওরা।’

‘তারমানে দু’একদিনের মধ্যেই প্লেনে তুলে বেইজিঙে পাঠিয়ে দেবে।’

‘তাই তো দেবার কথা, কিন্তু সম্ভব হচ্ছে না। কারণ বেইজিং আর ইয়াঙ্গুনের মাঝখানে মাসে মাত্র দুটো কার্গো প্লেন আসা-যাওয়া করে। পরবর্তী প্লেন ছাড়তে এখনও আটদিন বাকি, তাই আর্টিফ্যাক্টগুলো ট্রেনে তুলছে ওরা।’

‘আশ্চর্য তো! ট্রেনে তুলে কীভাবে...’ থেমে গেল রানা, ওর খেপে ওঠা উচিত হচ্ছে না।

‘ট্রেনে করে ওগুলো মান্দালয়ে নিয়ে যাওয়া হবে,’ বললেন থাইগন লোবাং। ‘মান্দালয় সম্পর্কে আপনার ধারণা আছে, মিস্টার সম্ভব? ইরাবতীর কিনারায় ওটা আমাদের একটা বন্দর নগরী, একসময় বার্মার রাজধানী ছিল।’

‘কিন্তু মান্দালয়ে কী?’

‘মায়ানমারের মান্দালয় আর চিনের কুমিং-এর মধ্যেও কার্গো প্লেন আসা-যাওয়া করে, সেটা ধরার জন্যে কাল সকালে আর্টিফ্যাক্টগুলো ওখানে পাঠানো হচ্ছে।’

‘আপনার এবার খানিক বিশ্রাম নেয়া দরকার, মিস্টার লোবাং,’ সহানুভূতির সুরে বলল রানা। ‘আপনার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হচ্ছে, খুব টেনশানের মধ্যে আছেন।’

‘হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। শুধু বোধহয় বিশ্রাম নয়, এবার বোধহয়

অবসর নেয়াই উচিত হবে।’

পরিচ্ছদের নীচে অতি বিশ্বস্ত পুরানো দুই বন্ধু লুকিয়ে আছে, ফোনের যোগাযোগ কেটে দিয়েই নিজের স্যুইট থেকে বেরিয়ে পড়ল রানা।

হোটেলের ভিতরই ব্যাঙ্ক থেকে কিছু ডলার ভাঙিয়ে কিয়াত করল ও। বাইরে বেরিয়ে এসে লাইনে দাঁড়ানো ট্যাক্সি না নিয়ে চড়ে বসল একটা থ্রি-হুইলারে। ড্রাইভারকে বলল, ‘রেল স্টেশন।’

মান্দালয়ের উদ্দেশে কাল মাত্র একটাই ট্রেন ছেড়ে যাবে, কাজেই রানা ধরে নিল চিনা আর্টিফ্যাক্টগুলো ওটাতেই থাকবে। ৪৩০ মাইল রেল জার্নিতে সময় লাগবে কমবেশি ছাব্বিশ ঘণ্টা।

জেড ডেথ সুটের কোথাও মাইক্রোফিল্মের রোলটা লুকানো আছে, এটা ধরে নিয়েই কাল ট্রেনটায় চড়তে যাচ্ছে রানা। তোউ ওয়ান-এর আর্মারটা দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করার সুযোগ চায় ও।

ট্রেনটার শেষ গন্তব্য পর্যন্ত টিকিট কেটে ট্যাক্সি নিল রানা, হোটেলে ফিরছে।

যা করার আর্টিফ্যাক্টগুলো ট্রেনে থাকতেই করতে হবে রানাকে। কারণ মান্দালয়ে পৌঁছানোর পর ওগুলো ওর নাগালের বাইরে চলে যাবে।

থাইগন লোবাং চারজন ডাকাতের কথা বললেন।

চার নম্বর লোকটা তা হলে কে? কালো নকশা চুরি হয়েছে বেইজিং-এর মার্কিন দূতাবাস থেকে, তাদের কোন স্পাই?

কাল রাতে সেই রহস্যময় ব্যক্তি কি ডেথ সুটটা পরীক্ষা করার সুযোগ পেয়েছিল? তা যদি পেয়ে থাকে, এতক্ষণে মাইক্রোফিল্মটা নিয়ে ওয়াশিংটনের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে সে।

তবে না, সে বোধহয় দেরি করে পৌঁছেছিল–সাদা কোট, সাদা টাই আর রানার পরে। ওদেরকে সে আর্মারটা নিয়ে কাজ করতে দেখেছে বলেও মনে হয় না। তারমানে ধরে নিতে হয় এখনও সে জানে না মাইক্রোফিল্মটা কোথায় লুকানো আছে।

আর সেজন্যই বাঁচিয়ে রাখা দরকার মাসুদ রানাকে। আসল কথাটা জানে সে, তাই মিন ভাই বা তাদের ম্যানেজারের মত এখনই ওকে মারা যাচ্ছে না–তার আগে পিছু নিয়ে জেনে নিতে হবে কোথায় আছে মাইক্রোফিল্মটা।

আর্কিওলজির ছাত্রী, ভারতীয় বাঙালী, নন্দিনী অপরূপার চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল রানা, 'আরেকটু ওয়াইন?'

'মাত্র কয়েক ফোঁটা,' বলল মেয়েটা। 'কিন্তু তোমার ব্যাপারটা কী বলো তো? ডিনার তো ছুঁয়েও দেখছ না।'

'মন খারাপ, তাই খিদে নেই।'

কী যেন বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল নন্দিনী। ওদের ডিনার টেবিলের পরিবেশ বিষণ্ন হয়ে উঠল। হঠাৎ পরিচয়, হঠাৎই বিচ্ছেদ। ওদের ধর্ম আলাদা, দেশ আলাদা, পেশা আলাদা; আলাদা রুচি, অভ্যাস, নীতিবোধ, আদর্শ আর লক্ষ্যও; তা সত্ত্বেও পরস্পরকে ভালো লাগাটা খুব সত্যি। আবার সত্যি এই বিচ্ছেদটাও। রানা ভাবছে–শেষ পর্যন্ত কোন লাভ নেই, সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী করা সম্ভব নয়, এ-কথা জানে বলেই বোধহয় নন্দিনী একবারও জানতে চায়নি কী করে ও, কী কাজে মায়ানমারে এসেছে।

'এটা কিন্তু ঠিক নয়, সম্ভব!' মুখ তুলে বলল নন্দিনী। 'কিছু না খেলে দুর্বল হয়ে পড়বে তুমি।'

‘তোমার ভেতর একজন মা লুকিয়ে আছে,’ হেসে উঠে বলল রানা। ‘সব মেয়ের মধ্যেই যেমন থাকে আর কী।’

হঠাৎ নন্দিনীর চোখ-মুখ অন্যরকম হয়ে উঠল। ‘এই জিনিসটা আমি সবচেয়ে অপছন্দ করি—কারও সঙ্গে তুলনা।’

‘সব সন্তোষজনক তো, সার?’ হঠাৎ কোত্থেকে ওয়েটার এসে জিজ্ঞেস করল রানাকে।

‘হ্যাঁ, ঠিক আছে সব,’ জবাব দিল রানা। ‘কফি, নন্দিনী?’

‘চা,’ বলল নন্দিনী।

‘লেডি চা খাবেন, আমি কফি।’

‘ইয়েস, সার!’

ওয়েটার চলে যাবার পর অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটল। তারপর নন্দিনী জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি কি সিদ্ধান্তটা সত্যি বদলাবে না?’

‘কোন্ সিদ্ধান্ত?’ পাল্টা প্রশ্ন করল রানা, নন্দিনীর মুখটা খুঁটিয়ে দেখছে। শুধু বোধহয় চোখ দুটো আরও একটু সুন্দর হওয়ার অবকাশ ছিল—এতটা ঠাণ্ডা আর সরু না হলেই যেন ভালো হত। তার বাকি সব কিছু একেবারে নিখুঁত।

‘সত্যি তুমি আমার সঙ্গে পেগানে যাচ্ছ না?’ এবার সরাসরি জিজ্ঞেস করল নন্দিনী।

এই সময় ফিরে এল ওয়েটার।

তার বিদায় না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা, তারপর নিজের কাপে কফি ঢালার সময় বলল, ‘আমি আসলে কাল সকালে মান্দালয়ে যাচ্ছি।’

‘মান্দালয়?’ আগ্রহে বড় বড় হয়ে উঠল নন্দিনীর চোখ।

মাথা ঝাঁকাল রানা। ‘হ্যাঁ। শুনলাম ট্রেন জার্নিটা নাকি দারুণ রোমাঞ্চকর, ট্রপিক্যাল সিনারিও ভীষণ শ্বাসরুদ্ধকর ইত্যাদি

ইত্যাদি।' কাজে ব্যস্ত থাকবে, তাই তার সঙ্গে পেগানে যাওয়া সম্ভব নয়, একবার এ-কথা বলার পর এখন বলছে মান্দালয়ে বেড়াতে যাবে, উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, নন্দিনীর কী প্রতিক্রিয়া হয় দেখা।

কিন্তু রানার কথা শুনে নন্দিনীর কোন প্রতিক্রিয়াই হলো না। রানাকে বিস্ময়ের একটা ধাক্কা দিয়ে সে বলল, 'ও, আচ্ছা, তা হলে তো ভালোই হলো। তারমানে তুমি কাল সকাল সাড়ে দশটার ট্রেন ধরছ, তাই না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু...'

'এর মধ্যে শুধু হ্যাঁ আছে, মশাই, কোন কিন্তু নেই–বুঝলেন? ওই ট্রেনে আমিও যাচ্ছি।' চেহারাই বলে দিচ্ছে, এত খুশি জীবনে খুব কমই হয়েছে সে।

'তাই?' রানা চেষ্টা করছে ওকেও যাতে খুশি দেখায়। তবে মেয়েটা সত্যি বিস্মিত করেছে ওকে। কাউকে ভ্রমণ সঙ্গী হিসাবে পাবে বলে ভাবেনি ও; যদিও এ-ব্যাপারে এখন আর কিছু করারও নেই ওর।

মাথা ঝাঁকাল নন্দিনী, ছোট্ট প্রাণচঞ্চল বাচ্চার মত ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। 'মান্দালয়ের ট্রেনে উঠলেও, শেষ মাথা পর্যন্ত যাচ্ছি না আমি। অর্ধেকের কিছু বেশি যাব, তারপর নামব–' কথার মাঝখানে থেমে টেবিলের কিনারায় আঙুল দিয়ে টোকা মারল। 'থাজি...হ্যাঁ, শহরটার নাম থাজি। এখান থেকে কত দূরে জানো?'

আপাতত রানা বোবা। শুধু মাথা নাড়তে পারল।

'তিনশো মাইল!' বলল নন্দিনী, আনন্দে টগবগ করছে। 'তিনশো মাইল উত্তরে। স্টেশন থেকে আমাকে ওরা বলল,

পনেরো থেকে আঠারো ঘণ্টার জার্নি। কাজেই, সম্ভব, আমরা চুটিয়ে...তুমি জানো।'

'তোমার মুখ রাঙা হয়ে উঠছে।'

'সত্যি?'

'আয়না বের করো।'

কাঁধ ঝাঁকাল নন্দিনী। 'আমি অসহায়, সম্ভব!' লালচে রঙটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল তার সারা মুখে।

'সত্যি মুগ্ধ হবার মত,' বিড় বিড় করল রানা। 'এটা কীসের লক্ষণ জানো? এটা...'

'নিষ্পাপ? সরলতা?'

'একেবারে আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়েছ।' হাসিটা জায়গা মত ধরে রেখে নন্দিনীকে নিয়ে ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে এল রানা। কিন্তু হাসির আড়ালে ভুরু কুঁচকে আছে ও। হঠাৎ করে সব কিছু খুব জটিল লাগছে ওর। এখন এই পরিস্থিতিতে ওর প্ল্যানে নন্দিনীকে না রেখে কোন উপায় নেই, ব্যাপারটা ভালো লাগুক আর নাই লাগুক।

বারো

মায়ানমারে আজ রানার তৃতীয় দিন।

স্টেশনের পরিবেশ গ্রামীণ হাটের চেয়েও খারাপ। ট্রেন এসে পৌঁছানোর আগেই নরক গুলজার হয়ে উঠল। সারং আর লুঙ্গি পরা মানুষ গিজগিজ করছে প্ল্যাটফর্মে। পুলিশের তাড়া খেয়ে তাদের ভিতর দিয়ে ছুটোছুটি করছে হকাররা।

ভিড় ঠেলে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে রানা, জানে নন্দিনীর হাত ছেড়ে দিলে তাকে আর খুঁজে বের করা যাবে না।

'ভুল হয়ে গেছে!' রানার কানের কাছে মুখ তুলে চেঁচাল মেয়েটা। 'প্লেনে করে যাওয়া উচিত ছিল।'

'এখন আর বলে লাভ কী। তা ছাড়া, মায়ানমারের গ্রাম্য পরিবেশ আর বনভূমি দেখতে হলে ট্রেনে তোমাকে চড়তেই হবে। ঠিক?'

নন্দিনী মাথা ঝাঁকালেও, চেহারা থেকে বিরক্তির ছাপটুকু দূর হলো না।

ট্রেনে একটাই পুলম্যান কার আছে, রানার মত নন্দিনীও ওই কারের একটা স্লিপার বুক করেছে।

আরও একটা স্পেশাল কার আছে ট্রেনে, আর্মি অফিসারদের জন্য রিজার্ভড।

নন্দিনীকে তার কমপার্টমেন্টে তুলে দিয়ে জনারণ্যে ফিরে এল রানা, আগেই তাকে বলে রেখেছে কিছু ফল কিনতে হবে। তবে নারকেল বা আপেল নয়, এই মুহূর্তে শুধু কার্গোর কথা ভাবছে ও।

ট্রেনের পাশ ঘেঁষে, প্ল্যাটফর্ম ধরে হাঁটছে রানা। ব্যাগেজ কারটাকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে হাঁটার গতি কমাল, তারপর এক সময় দাঁড়িয়ে পড়ল।

হান সাম্রাজ্যের আর্টিফ্যাক্ট তোলা হচ্ছে ট্রেনে। কাজটা সুপারভাইজ করছেন চিনা দূতাবাসের কালচারাল অ্যাটাশে। কাছাকাছি পাহারায় দাঁড়িয়ে আছে বার্মিজ সেনাবাহিনীর একটা সশস্ত্র ডিটাচমেন্ট। ওখান থেকে খানিকটা সরে এল রানা, চাইছে না কেউ ওকে দেখে ফেলুক–কে জানে, কালেকশানকে বিদায় জানাবার জন্য থাইগন লোবাং হয়তো স্টেশনে চলে এসেছেন। আর্টিফ্যাক্টের সঙ্গে একই ট্রেনে রানাকে উঠতে দেখলে ব্যাপারটাকে তিনি কাকতালীয় হিসাবে না-ও দেখতে পারেন।

দূরে দাঁড়িয়ে কার্গো লোড করার কাজটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা। চিনা বলতে একা শুধু কালচারাল অ্যাটাশেই উপস্থিত।

চার নম্বর লোকটা কি এরই মধ্যে ট্রেনে উঠে পড়েছে? নাকি চিনা আর্টিফ্যাক্ট সার্চ করা হয়ে গেছে তার, মাইক্রোফিল্ম নিয়ে এই মুহূর্তে নাগালের বাইরে কোন প্লেনে রয়েছে?

হয়তো সার্চ করেছে ঠিকই, কিন্তু মাইক্রোফিল্মটা পায়নি। অর্থাৎ রানাকে এখনও দরকার বলে ভাবছে সে।

এক ঝুড়ি তাজা ফল নিয়ে ট্রেনের সামনের দিকে ফিরে এল

রানা।

'এ তো আমরা সারা জীবন খেয়েও শেষ করতে পারব না।' ঝুড়িটা দেখে হেসে ফেলল নন্দিনী।

'সেক্ষেত্রে লোকজন ডেকে একটা পার্টির আয়োজন করব,' এমন অভিনয় করছে রানা, যেন কোন কিছুই বিরক্ত করছে না ওকে, বিশেষ করে নন্দিনীর উপস্থিতি। জানে না ভালো করছে না খারাপ, তবে নন্দিনী কিছু খেয়াল করছে বলে মনে হলো না।

কী কারণে দেরি তার কোন ব্যাখ্যা নেই, অবশেষে বেলা প্রায় বারোটার দিকে ট্রেন ছাড়ল। অবশ্য দেরি হওয়াটা রানার জন্য কোন সমস্যা নয়, কারণ রাতের আগে সার্চ শুরু করার কোন ইচ্ছে নেই ওর। একটাই সম্ভাব্য সংকট দেখতে পাচ্ছে ও–আগামী কাল খুব ভোরে ট্রেন ছেড়ে নেমে যাবার সময় হবে নন্দিনীর। তার ঘুমাবার সময়টায় রানাকে তল্লাশি চালাতে হবে। এটাকে এড়াবার স্রেফ কোন উপায় নেই।

বেশ কিছুক্ষণ প্রচুর কথা বলে সময়টা উপভোগ্য করে তুলল নন্দিনী। তারচেয়ে এক বছরের বড় একটা ভাই আছে, শান্তি নিকেতনে পারফর্মিং আর্টসে মাস্টার্স করেছে, পরস্পরকে 'তুই' বলে ওরা–সেই ভাইই নন্দিনীর রক্তে একা একা ঘুরে বেড়ানোর নেশাটা সংক্রমিত করেছে। তার পাল্লায় পড়ে গোটা ভারতবর্ষ দেখা শেষ করেছে সে। তবে শুধু যে বেড়ানোর উদ্দেশ্যে বাড়ি ছেড়েছিল, তা নয়; তার প্রতিটি ভ্রমণই আসলে শিক্ষা সফর।

এক সময় সব কথা ফুরিয়ে গেল নন্দিনীর। রানা তাকে পেগান সর্ম্পকে প্রশ্ন করলে হাই তুলতে শুরু করে ক্ষমা চাইল সে, বলল অল্প একটু ঘুমাবে। হাতঘড়ি দেখল রানা। ১:৫২। ওর সামনে দীর্ঘ প্রতীক্ষা, কেউ জানে না কীভাবে সেটার অবসান হবে।

হয়তো হিসাব আর অনুমানে ভুল হয়ে গেছে, খালি হাতে ফিরতে হবে ওকে।

ট্রেনটাকে এক্সপ্রেস না বলে গরুর গাড়ি বললেই যেন বেশি মানাত। সারাটা বিকেল বারবার সামনের গ্রামগুলোয় থেমে প্যাসেঞ্জার তোলা হলো। তরুণী হকারদের ছুটোছুটি দেখে কে, কে কার আগে কমপার্টমেন্টের জানালায় পৌঁছাবে। তাদের পিঠে বাঁধা ঝুড়ি থেকে উপচে পড়ছে দুনিয়ার জিনিস-পত্র–চুলের কাঁটা থেকে শুরু করে ঘরে তৈরি আচার, কী নেই।

আগের কেনা ফল পড়ে আছে, তা সত্ত্বেও আম সহ চেনা-অচেনা আরও কিছু ফল কিনল, শুধু যে কিনল তা নয়, চেখেও দেখল। নন্দিনী ওর দিকে এমনভাবে তাকাল, ও যেন পাগল হয়ে গেছে।

আসলে তা হয়নি রানা। ওর এই অদ্ভুত আচরণের পিছনে একটা উদ্দেশ্য আছে। নন্দিনীর সঙ্গে রাত–শেষ রাতটা–না কাটানোর একটা গ্রহণযোগ্য অজুহাত দরকার হবে, সেই অজুহাত তৈরির প্রস্তুতি নিচ্ছে ও। পেটে গোলমাল দেখা দিয়েছে বললে সে যাতে বিশ্বাস করে।

তবে সব কিছুরই একটা সীমা আছে। রানা যখন ঠিক করেছে আর নয়, এই সময় এক বার্মিজ তরুণী টকটকে লাল একটা ফল ধরল ওর সামনে, দেখতে অনেকটা আতার মত, তবে আকারে আরও অনেক বড়। রানা মাথা নেড়ে বলল, খাবে না।

'ইজ গুড, ইজ গুড,' মেয়েটা নাছোড়বান্দা। প্রথমে ইংরেজিতে অনুরোধ করল, তারপর শুরু করল বার্মিজ ভাষায়। 'আহ্ লুঙ কাউং পা দা।' ঠোঁট নেড়ে খাওয়ার ভঙ্গি নকল করে পেটে হাত চাপড়াল–আবেদনে নাটকীয়তা আনার জন্য।

কিন্তু রানা সিদ্ধান্ত বদলাতে রাজি নয়।

‘কী বলছে ও?’ জানতে চাইল নন্দিনী।

নন্দিনী বার্মিজ ভাষা জানে না দেখে বিস্মিত হলো রানা। অন্তত দু’চারটে শব্দ না জানাটা কেমন দেখায়! স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে তাকে না পাঁচ হপ্তা পেগানে কাটাতে হবে? ‘বলছে–ভেরি গুড,’ মেয়েটার কথা ভাষান্তর করে শোনাল ও।

‘ইয়েস–হাকি কেত,’ সায় দিল বার্মিজ তরুণী। ‘ভে-দি গুড।’

‘নাও, খেয়ে দেখো,’ হেসে উঠে বলল নন্দিনী।

মাথা নাড়ল রানা, তারপর তরুণীকে ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইল ওর পেটে জায়গা নেই।

অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেল হকার মেয়েটি।

‘সামান্য একটু খেতে,’ বলল নন্দিনী। ‘এত করে বলছিল যখন।’

‘খাই, তারপর আরও অসুস্থ হই, না?’

‘আরও অসুস্থ...তোমার শরীর খারাপ?’

পেট খামচে ধরে কোটরের ভিতর চোখের তারা ঘোরাল রানা, যতক্ষণ না হি-হি করে হেসে উঠল নন্দিনী। ‘শুধু শুনে রাখো, এরচেয়ে সুস্থ থাকার অভিজ্ঞতা আমার আছে, এর বেশি কিছু জানতে চেয়ো না।’

ইয়াঙ্গুন থেকে প্রায় দেড়শো মাইল দূরে, নয়াউঙ্গলিবিন শহরে তিন ঘণ্টা দেরি করল ট্রেন। রানার ইচ্ছে ছিল প্ল্যাটফর্মে নেমে কার্গোর খোঁজ-খবর নেবে, অন্যান্য কমপার্টমেন্টে উঠে দেখবে রহস্যময় চার নম্বরকে পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াল পুলিশ আর কাস্টমস। স্টেশন থেকে যারা বেরুতে চায় তাদেরকে সার্চ করা হচ্ছে, অন্যদের প্ল্যাটফর্মে নামতেই দেওয়া হচ্ছে না।

তবে খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে দূর থেকে ব্যাগেজ কারটা দেখতে পেল রানা। প্ল্যাটফর্মে নেমে এসে পাঁচ-সাতজন মায়ানমার সৈনিক টহল দিচ্ছে ওটার সামনে, হাতে বাগিয়ে ধরা কারবাইন।

রানার ইচ্ছে ছিল রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু করবে। ট্রেন জার্নি ক্লান্তিকর, নন্দিনী নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়তে দেরি করবে না। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল রাত এগারোটার দিকে স্লিপারে ওঠার জন্য রানার সাহায্য চাইছে সে।

নন্দিনীকে স্লিপারে তুলে দিয়ে পরদাটা টেনে দিল রানা, তারপর পিছু হটল। আলো জ্বলছে, ফলে পরদার গায়ে ছায়া পড়েছে নন্দিনীর–চাদরের নীচে আশ্রয় নেওয়ার আগে সে তার ব্লাউজ খুলল, তারপর স্কার্টের চেইন ধরে টান দেবার সময় স্থির হয়ে গেল হাত।

পরদা সরিয়ে তাকাল নন্দিনী। 'কিছু ঘটেছে, সম্ভব?' জানতে চাইল সে, চোখে একাধারে বিস্ময় আর উদ্বেগ।

'বলো কী ঘটেনি।'

'মানে?'

'আমার সত্যি অসুস্থ লাগছে। আজ রাতে আমি বোধহয় কারও কোন কাজে লাগব না, নন্দিনী। দুঃখিত, ভাই।' বিষণ্ন সুরে দুঃসংবাদটা দিয়ে হঠাৎ এক হাতে নিজের মুখ চেপে ধরল রানা, আরেক হাতে স্লাইডিং ডোর-এর নব হাতড়াচ্ছে। বমি আটকাবার চেষ্টা চলছে, বিড় বিড় করে বলল, 'কথা বলতে পারছি না, কথা বলতে পারছি না!'

'ইস্, তখনই মনে হয়েছে এতসব অচেনা ফল খাওয়া কি উচিত হচ্ছে!' এগিয়ে এসে দরজাটা খুলে দিল নন্দিনী। 'বেচারিকে নিয়ে এখন আমি কী করি!'

সেন্ট্রাল আইল ধরে ছুটল বেচারি, বাথরুমের দিকে যাচ্ছে।

এরকম কয়েকবারই ছুটতে হলো রানাকে, অর্থাৎ অভিনয় করে নন্দিনীকে দেখাতে হলো যে ওর অবস্থা সত্যি করুণ। এক সময় পরদা টেনে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সে। ঘুমিয়ে পড়ল অন্যান্য আরোহীরাও। আরেকবার কমপার্টমেন্ট থেকে বেরুবার জন্য দরজা খুলল রানা।

ওর রোলেক্সে সময় এখন রাত ১২:১৭। নিজের পিছনে দরজাটা বন্ধ করে সেন্ট্রাল আইল ধরে এগোল ও, পুলম্যান থেকে পাশের কারে যাচ্ছে।

প্রতিটি কমপার্টমেন্টেই ঘুমে ঢুলছে আরোহীরা। কিছু তরুণকে দেখা গেল এক কোণে তাস নিয়ে বসেছে। আইল ধরে রানাকে হাঁটতে দেখে খেলা ছেড়ে তাকিয়ে থাকল তারা–কৌতূহলী, তবে চুপচাপ। বন্ধুসুলভ অমায়িক হাসি উপহার দিল রানা।

একে একে পাঁচটা কমপার্টমেন্টকে পাশ কাটিয়ে এল রানা। কেউ ওর পিছু নেয়নি–না মিস্টার এক্স, না ওয়াই বা জেড।

আরও তিনটে কারকে পিছনে ফেলার পর সামনে পড়ল ব্যাগেজ কমপার্টমেন্ট। বড় করে শ্বাস টেনে বুকটা ভরে নিল রানা, তারপর হাতল ধরে টান দিল। ভারী ধাতব দরজা গুঙিয়ে উঠে খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তন্দ্রাচ্ছন্ন তিনটে মুখ উঁচু হলো, কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে।

'নো অ্যালাওয়িং,' সৈনিকদের একজন বলল, হাত ইশারায় পিছাতে বলছে–এমনকী ভিতরে পা রেখে রানা নিজের পিছনে দরজাটা বন্ধ করে দিচ্ছে দেখেও।

'হোয়াট?' ইংরেজি বলছে রানা।

তিন সৈনিকই যান্ত্রিক পুতুলের মত একযোগে দাঁড়িয়ে পড়ল।

‘নো অ্যালাওয়িং,’ দ্বিতীয় গার্ড বলল।

সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল তৃতীয় গার্ড। ‘নট…পারমিটেড,’ বলল সে, শব্দটা পেট থেকে বের করতে যেন হিমশিম খেয়ে গেল।

তাদের পিছনে স্তূপ করা বাক্সগুলো দেখতে পাচ্ছে রানা, গায়ে চিনা হরফে লেখা ‘হান সাম্রাজ্যের আর্টিফ্যাক্ট’।

সামনে এগোল একজন সৈনিক, পিঠের ঝুলন্ত কারবাইন ঝাঁকি খাচ্ছে। বার্মিজ ভাষায় কথা বলল রানা। সঙ্গে সঙ্গে অনুকূল প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। একজনকে দাঁত বের করে হাসতেও দেখল ও।

‘সবাই ঘুমাচ্ছে,’ বলল রানা, ইঙ্গিতে নিজের পিছন দিকটা দেখাল, যেন গোটা ট্রেনের সমস্ত আরোহীর কথা বলতে চাইছে। ‘তাই ভাবলাম দেখি কাউকে সিগারেট খাইয়ে প্রাচীন বার্মার কিছু গল্প শোনা যায় কিনা।’ জ্যাকেটের পকেট থেকে সোনালি সিগারেট কেসটা বের করল। ‘চলবে?’

‘ধন্যবাদ,’ একের পর এক এগিয়ে এসে জবাব দিল, রানার বাড়ানো হাতের প্যাকেট থেকে বের করে নিল একটা করে ফাইভ-ফিফটি-ফাইভ।

লাইটারটাও তৈরি রেখেছিল রানা, সেটার কাঁপা কাঁপা শিখার আলোয় সৈনিকদের মুখগুলো কচি আর নিষ্পাপ দেখাচ্ছে।

ওদের পিছনে নিঃসঙ্গ একটা সেফটি ল্যাম্প নরম আলো ছড়াচ্ছে। নিজের সিগারেটটা ধরিয়ে মেঝেতে প্রথমে উবু হলো রানা, তারপর যেন আরও আরাম পাবার জন্য পায়ের উল্টে করা পাতার উপর নিতম্ব দিয়ে বসল; অপেক্ষা করছে সৈনিকরাও কখন ওকে অনুকরণ করে। ধীরে ধীরে নিচু হলো তারা, মন্তব্য করছে–দামী সিগারেটের স্বাদই আলাদা।

‘আমি একজন রিপোর্টার, শ্রীলঙ্কার একটা দৈনিক পত্রিকায় লেখালেখি করি।’

‘লেখক?’ হাই তুলে জানতে চাইল একজন সৈনিক, ঘুম পাচ্ছে তার।

‘হ্যাঁ। চাইনিজ প্রদর্শনীর ওপর একটা ফিচার লিখছিলাম,’ ইঙ্গিতে ওদের পিছনের কাঠের বাক্সগুলো দেখাল রানা, যেগুলোর একটার ভিতর তো ওয়ানের জেড সুট আছে।

‘আপনি মায়ানমারে থাকেন, ইয়াঙ্গুনে?’ আরেকজন সৈনিক জানতে চাইল, ইংরেজি জানে বলে রীতিমত গর্বিত দেখাচ্ছে তাকে।

মাথা ঝাঁকাল রানা। ‘দা ইরাবতী প্লাস ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে। আমার নাম সিংঘে—রানা সিংঘে।’ করমর্দনের জন্য হাত বাড়াল রানা, কিন্তু তিনজনই ঢলে পড়ল গভীর ঘুমে। অন্তত ঘণ্টখানেকের আগে জাগবে না।

জ্যাকেটের পকেট থেকে তুলো আর নাইলন কর্ড বের করল রানা। সৈনিকদের মুখে তুলো গুঁজে দিয়ে পিছমোড়া করে হাত বাঁধল। তারপর পাগুলো এক করে বাঁধল। অজ্ঞান শরীরগুলো টেনে সরিয়ে রাখল একপাশে।

কাজ শুরু করল রানা রোলেক্সে চোখ রেখে—১২:৫১। বাক্সের গায়ে লেখাই আছে তো ওয়ানের ডেথ সুট, কাজেই খুঁজে বের করতে কোন সমস্যা হলো না। আকার-আকৃতিতে কফিনের মত, ব্যাগেজ কারের একেবারে পিছন দিকে পাওয়া গেল সেটাকে। কয়েকটা বাক্স সরিয়ে ওখানে পৌঁছাল রানা। জ্যাকেটের পকেট থেকে এক সেট মিনিয়েচার টুলস বের করল।

বাক্সের ঢাকনিটা খুলে একপাশে নামাতে প্রচুর সময় লাগল। কাঁচের ভিতর দিয়ে নীল-সবুজ জেডের দিকে মুগ্ধ চোখে কিছুক্ষণ

তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর দেখল নকশা করা সোনার তার দিয়ে তৈরি রেখাগুলো পরস্পরের উপর দিয়ে কত বিচিত্র ভঙ্গিতে আসা-যাওয়া করেছে, যাবার পথে জড়িয়ে নিয়েছে হাজার হাজার আলাদা পাথরকে।

কার্গো কমপার্টমেন্টের ওপাশেই রয়েছে আর্মির লোকজন ভর্তি একটা কোচ। তাদের কেউ, হয়তো কমান্ডারই, ব্যাগেজ কারে ঢুকতে চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু দরজা ভিতর থেকে বন্ধ দেখবে সে। তারপর কী ঘটবে সেটা নির্ভর করে রানার ভাগ্যের উপর।

কাঁচের ঢাকনিটা খুলতে দশ মিনিট সময় লাগল। ইতিমধ্যে বদ্ধ জায়গার ভিতর উত্তেজনায় ঘেমে নেয়ে উঠেছে রানা। কেসের ভিতর হাত গলিয়ে সুটটা নয়, মেরুন রঙের ফেল্টটা ধরল রানা, যেটার গায়ে শোয়ানো রয়েছে ওটা। ডেথ সুটের চারধারে আর কাঠের বাক্সের পাশে বা কিনারায় ফালি করে কাটা কাপড় গুঁজে রাখা হয়েছে, বহন করার সময় আর্মার যাতে ঝনঝন শব্দ না করে। ছোট পকেট নাইফের সাহায্যে কাপড়গুলো কেটে ফেল্ট লাইনার ছাড়িয়ে আনল ও। কাপড়ের কাভার পুরোপুরি সরাবার জন্য সুটটাকে এক পাশে কাত করতে হলো ওকে।

কিন্তু বাক্সটার পুরো সারফেস উন্মুক্ত করার পরও মাইক্রোফিল্মটা কোথাও পাওয়া গেল না।

কয়েক সেকেন্ড স্থির হয়ে থাকল রানা। হাত-পা বাঁধা, অজ্ঞান সৈনিকদের দিকে তাকাল একবার। নিজেকে বলছে—এখানেই কোথাও আছে জিনিসটা, না থেকে পারে না। মাথা ঘামাও, রানা! চিন্তা করো, কোথায় লুকিয়ে রাখা হতে পারে।

জিনিসটা ফেল্টের নীচে নেই।

সুটের নীচেও নেই।

অর্ধচন্দ্র আর চাকতিটা আগেই পরীক্ষা করেছে ও, ওগুলোতেও নেই।

তা হলে আর কোথায়?

ফিউনারারি আর্মার-এর মাথাটা উঁচু করল রানা, আরেক হাতে ধরল তো ওয়ানের বালিশটা। গিল্ড করা, জেড বসানো ব্রোঞ্জের হেডরেস্টটা আশ্চর্য রকম হালকা। নিরেট এক টুকরো ব্রোঞ্জ যথেষ্ট ভারী হওয়ার কথা। কিন্তু অলঙ্কৃত মেটাল হেডরেস্ট মোটেও ভারী নয়।

জিনিসটা ফাঁপা, বুঝতে পারল রানা।

আর্টিফ্যাক্টটার সারফেসে আঙুল বুলিয়ে আলগা কোন পাথর খুঁজছে রানা, হয়তো মেকানিক্যাল ডিভাইস হিসাবে কাজ করে, যার সাহায্যে জিনিসটার ভিতরের অংশ খোলা যায়।

ফাঁপা একটা হেডরেস্টের অর্থ, চৌ মিন বা বেইজিং মিউজিয়ামে দায়িত্ব পালনরত তার কোন বিশ্বস্ত সহকারী আসল ব্রোঞ্জ বালিশটা সরিয়ে সেটার জায়গায় হুবহু একই রকম দেখতে একটা ইমিটেশন রেখেছিল।

কাঠের বাক্সের গায়ে ওটা ঠুকল রানা। বালিশের একটা কোণ ভেঙে গেল। জিনিসটা ব্রোঞ্জ নয়। এমন কী এটাতে জেডও ব্যবহার করা হয়নি। স্রেফ প্লাস্টার অভ প্যারিস, কৌশলে পেইন্ট করা হয়েছে।

আরেকবার ঠুকল রানা। এবার একটু জোরে। প্লাস্টার হেডরেস্ট একেবারে মাঝখান থেকে দু'ভাগ হয়ে গেল। সেই সঙ্গে দেখতে পেল রানা-রাইস পেপারে মোড়া একটা প্যাকেজ। জানা কথা এটাই খুঁজছে ও। মোড়কের ভিতর কালো নকশার মাইক্রোফিল্ম আছে।

মিস্টার এক্স-এর চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে আছে রানা—এই মুহূর্তে যেখানেই সে থাকুক না কেন।

মোড়ক ছিঁড়ে মাইক্রোফিল্মের খুদে রোলটা বের করল রানা। স্ক্রু খুলে রোলেক্সের পিছনটা সরাল, রোলটা লুকিয়ে রাখল ঘড়ির ভিতর।

১:২১। তবে এখানকার কাজ এখনও শেষ হয়নি রানার।

এতক্ষণ যা করেছে, এবার তা উল্টো ভাবে শুরু করল রানা। প্রথমে ফেল্ট ব্যাকিং জায়গা মত বিছাল, তার উপর আর্মারটা রাখল। ছেঁড়া কাপড়গুলো জোড়া লাগিয়ে চারদিকে গুঁজে দিল, কেসের ভিতর যাতে বেরিয়াল সুট নড়াচড়া না করে। ভারী কাঁচের ঢাকনিটা জায়গা মত বসাল। সবশেষে পেরেক মেরে আটকাতে হলো কাঠের ঢাকনি।

১:৩৫। হিসাবে যদি ভুল না হয় রানার, আগামী পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে থাজিতে থামছে না ট্রেন।

সবশেষে আরেকটা কাজ করল রানা। সঙ্গে অতিরিক্ত একটা পাসপোর্ট আছে, অন্য লোকের ফটো আর পরিচয়ে—সেটা একজোড়া বাক্সের মাঝখানে ফেলে রাখল।

অবশেষে বোল্ট সরিয়ে ভারী মেটাল ডোরটা একপাশে সরাল রানা। সামনে বিস্ফারিত একজোড়া চোখ দেখতে পেল ও। চোখ দুটো ওর পিছনের দৃশ্য দেখে ফেলেছে—হাত-পা বাঁধা তিনজন সৈনিক ব্যাগেজ কারের মেঝেতে পড়ে রয়েছে।

নিজের পিছনে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল রানা। তারপর হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেলল—ছুটে পালিয়ে যাবার আগেই।

নন্দিনী অপরূপা এমন ভাবে তাকিয়ে আছে, সে যেন একটা ভূত দেখতে পেয়েছে।

তেরো

‘তুমি এখানে কী করছ?’ হিসহিস করে উঠল রানা, গলার আওয়াজ চড়তে দিচ্ছে না।

‘কী করছি...আমি? এ প্রশ্ন তুমি আমাকে করছ?’ নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য ধস্তাধস্তি করছে নন্দিনী, কিন্তু রানার সঙ্গে সুবিধে করতে পারছে না।

‘কী বলব ভালো করে শুনবে,’ বলল রানা। এক হাতের ভিতর নন্দিনীর চিবুকটা ভরে নিল ও, সে যাতে ওর প্রতিটি কথা মেনে নিতে বাধ্য হয়। ‘তোমাকে এখন আমার নির্দেশ মত চলতে হবে, ঠিক আছে?’

‘না, ঠিক নেই!’ নন্দিনীও হিসহিস করে উঠল। তার কণ্ঠস্বরে জেদ, চোখের দৃষ্টিতে মরিয়া ভাব।

নন্দিনীকে যা বলার পরে বলবে রানা, তার আগে জরুরি একটা কাজ শেষ করতে হচ্ছে ওকে।

কাল কিনেছে, আজ সঙ্গে আনতে ভোলেনি, মাঝারি আকারের ইয়েল লকটা পকেট থেকে বের করল ও। স্লাইডিং ডোরের

বাইরের দিকে ঝুলিয়ে দিল ওটা। বিলম্ব মাত্রই ওর অনুকূলে যাবে। তালাটা খুলতে বা ভাঙতে পাঁচ থেকে দশ মিনিট লাগবে। যেখানে এক মিনিটেই অনেক দূর চলে যাওয়া যায়, সেখানে পাঁচ বা দশ মিনিট নিঃসন্দেহে রানাকে পালাতে বিরাট সাহায্য করবে।

নন্দিনীকে ছাড়েনি রানা, এক হাতে ধরে রেখেছে। কাজটা শেষ হতে তাকে নিয়ে দরজার কাছ থেকে সরে এল ও, দাঁড়াল ব্যাগেজ কার আর সংলগ্ন কোচ-এর মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটায়।

ওদের পায়ের তলায় লোহার মেঝে কাঁপছে। রাতের বাতাস চাবুক কষছে নন্দিনীর মুখে, চারদিকে উড়ছে তার রেশমি কালো চুল। এক হাতে সেগুলো সরাতে ব্যস্ত সে, তবে নিজেকে ছাড়াবার জন্য এখনও ধস্তাধস্তি করছে।

এবার তাকে আরও শক্ত করে ধরল রানা। 'তুমি আমার পিছু নিয়েছ,' বলল ও। 'আমি জানতে চাই কেন।'

'পিছু নিয়েছি?' নন্দিনী অবাক। রুদ্ধশ্বাস মনে হলো তাকে, ভয়টা যেন আগের চেয়ে কমেছে। 'না, অসম্ভব, আমি কেন তোমার পিছু নিতে যাব?'

'অস্বীকার করলে লাভ হবে না,' চাপা গলায় ধমক দিল রানা। 'নাই যদি পিছু নেবে, তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলে কেন?'

'আমি ভাবতেই পারছি না, তুমি আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলছ,' নন্দিনীর কথায় আর চেহারায় বিস্ময়ের সঙ্গে অভিমান ফুটে উঠল। 'তোমার যে এরকম একটা রূপ আছে, আমি কল্পনাও করতে পারিনি।'

নন্দিনীর পিছনে তাকাল রানা। লোকজন ঠাসা কার-এর ভিতর কেউ নড়াচড়া করছে না। 'আমি জানতে চাই তুমি আমার পিছু নিয়েছিলে কেন,' আবার বলল রানা।

এবারও অভিযোগটা অস্বীকার করল নন্দিনী। 'তোমার অসুস্থতা দেখে খুব...চিন্তায় পড়ে যাই আমি,' উত্তেজনায় হোক বা আবেগে মুখে কথা বেধে যাচ্ছে। 'ফলে আমি ঘুমাতে পারিনি। মশাগুলোও পাগল বানিয়ে ছাড়ছিল। তাই এক সময় কেমন আছ দেখার জন্যে তোমার কমপার্টমেন্টে গেলাম। ওটা খালি দেখে নার্ভাস হয়ে পড়লাম। কী করব, কাকে বলব—মাথাটা কাজ করছিল না। মায়ানমার অদ্ভুত এক দেশ, জানোই তো—অনেক বিদেশী ট্যুরিস্ট এখানে গায়েব হয়ে যায়...'

কেউ ওদেরকে দেখছে না, নিশ্চিত হয়ে নন্দিনীকে নিয়ে অন্ধকার কার-এর ভিতর দিয়ে এগোল রানা। ব্যাগেজ কার থেকে যত দূরে সরে আসছে, ততই স্বস্তি বোধ করছে।

'আমাকে প্রশ্ন না করে, দয়া করে এবার আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও,' বলল নন্দিনী। 'ওখানে কী করছিলে তুমি, ব্যাগেজ কারের ভেতরে?'

'স্রেফ বোবা হয়ে থাকো, নন্দিনী,' ফিসফিস করল রানা। 'মানে, যদি না চাও যে আমরা দু'জনেই খুন হয়ে যাই।'

'খুন হয়ে যাব?'

'তবে আর বলছি কী, সুইট হার্ট। আমি কোন খেলা খেলছি না। এটা প্রাণ রক্ষার বাজি। কাজেই আমি যা বলব তাই তোমাকে মেনে চলতে হবে, ঠিক আছে? বিশ্বাস করো, একেবারে বাধ্য না হলে আমি চাইব না তোমার কোন ক্ষতি হোক।'

এরপর শান্ত হয়ে গেল নন্দিনী, ওরা স্লিপিং কমপার্টমেন্টে না ফেরা পর্যন্ত একটা শব্দও করল না।

ভিতরে ঢুকে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল রানা।

'চিনাদের আর্টিফ্যাক্ট থেকে কিছু একটা সরিয়েছ তুমি, তাই

না? তারমানে তুমি একটা চোর!’ আহত, সেই সঙ্গে কাতর দেখাল নন্দিনীকে। ‘সেজন্যেই শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্তটা বদলাও তুমি, তাই না?’

‘কোন্ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত বদলাই?’

‘মান্দালয়ে যাবার ব্যাপারটায়। বললে কাজে ব্যস্ত থাকবে, সময় নেই, তাই আমার সঙ্গে পেগানে যেতে পারবে না। তারপর হঠাৎ জানালে মান্দালয়ে যাবে।’ মুখে হাত বুলাল নন্দিনী, যেন অদৃশ্য ক্ষত আর চোখের পানি আড়াল করার চেষ্টায়। ‘ঈশ্বর, আমি জানি না কী বিশ্বাস করা উচিত, কী নয়। আমি ভেবেছিলাম...ভেবেছিলাম তুমি...’

‘কী?’ জিজ্ঞেস করল রানা, তারপরই প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, ‘তার আগে বলো, তুমি জানলে কীভাবে চিনা আর্টিফ্যাক্ট এই ট্রেনে যাচ্ছে?’

‘আমাকে তুমি বোকা মনে করো, না?’ জবাব দিল নন্দিনী। ‘আজ সকালের কাগজে খবরটা ছিল, বুঝলে মশাই!’

‘থাকলেই বা কী,’ বলল রানা, ‘তুমি তো বার্মিজ পড়তে পারো না।’

‘বার্মায় অন্তত হাফ ডজন ইংরেজি দৈনিক আছে, সে খবর রাখো? আশ্চর্য! অপরাধ করেছ তুমি, অথচ চোটপাটও দেখাচ্ছ সেই তুমিই। সন্দেহ নেই, এরকম চোর সহজে দেখা যায় না।’

‘আমি চোর নই, নন্দিনী,’ বলল রানা, হঠাৎ নিজের কাভার নষ্ট না করে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার একটা তাগাদা অনুভব করল ও। ‘শোনো, আমি আসলে সত্যি কিছু চুরি করিনি...’ নিজেকে সামলে নিল রানা, ভাবল, কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো। ‘আমাকে দেখে তোমার কি মনে হচ্ছে, আমার সঙ্গে হান

সাম্রাজ্যের কোন আর্টিফ্যাক্ট আছে? দু'হাজার বছরের পুরানো একটা পাত্র কোথায় আমি লুকিয়ে রেখেছি দেখাও...'

হঠাৎ থেমে ঠোঁটে একটা আঙুল রাখল রানা, শব্দ করতে নিষেধ করল নন্দিনীকে। তালা দেওয়া দরজার বাইরে থেকে ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ ভেসে আসছে। লোকজন চেঁচিয়ে কথা বলছে–বিস্মিত আর উদ্বিগ্ন।

সানঅভআ বিচ! মনে মনে গালি দিচ্ছে রানা। কী ঘটেছে বুঝে ফেলেছে এরই মধ্যে। শালার কপাল!

এখন কী হবে?

কর্তৃপক্ষকে বিভ্রান্ত করার জন্য অতিরিক্ত পাসপোর্টটা ফেলে রেখে এলেও, রানা উপলব্ধি করছে তাতে খুব একটা কাজ হবে না। জ্ঞান ফেরার পর সৈনিকরা পাসপোর্টের ফটো দেখে মাথা নেড়েছে, জানিয়েছে–এই লোক ব্যাগেজ কারে ঢোকেনি।

এই মুহূর্তে রানার আকার-আকৃতি আর চেহারার সঙ্গে মেলে, এমন একজন বিদেশীকে খুঁজছে ওরা।

সময় পাওয়া গেল না, নক হলো দরজায়। ঠক-ঠক, ঠক-ঠক-ঠক! যে-ই নক করুক, রেগে আছে, যেন ধৈর্য ধরতে রাজি নয়।

রানা দিশেহারা, নন্দিনীর দিকে তাকাল। এই মুহূর্তে একমাত্র সে-ই ওকে বাঁচাতে পারে। তার সাহায্য ছাড়া এখনই সব শেষ হয়ে যাবে।

'হেই! হেই!' বাইরে থেকে কেউ একজন অমার্জিত সুরে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে। 'হ্যালো, মিস...অপরূপা? ওপেনিং প্লিজ। আমরা এখানে পোর্টার, মিস অপরূপা। আমাদের সঙ্গে কাস্টমসের একজন অফিসার রয়েছেন। ওপেনিং প্লিজ।'

আরেকবার নন্দিনীর দিকে তাকাল রানা। মুখের ভাব আর

চোখের দৃষ্টির সাহায্যে বোঝাতে চেষ্টা করছে—ও নিরপরাধ।

‘কী?’ বলল নন্দিনী, ঘুমে জড়ানো কণ্ঠস্বর। দ্রুত হাতে ব্লাউজ আর স্কার্ট খুলে ফেলছে। ওগুলো বদলে স্বচ্ছ নাইলনের তৈরি বাথরোব পরল। ‘এক সেকেন্ড, প্লিজ। আমি ঘুমাচ্ছিলাম।’

রানার দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করল সে।

স্লিপার-এর নীচে ঢুকে মেঝেতে শুয়ে পড়ল রানা। তবে কমপার্টমেন্ট সার্চ করলে ধরা পড়ে যাবে ও।

সুইচ অফ করে কামরাটা অন্ধকার করে দিল নন্দিনী। তাকে দরজার ছিটকিনি খুলতে দেখে দম আটকাল রানা।

দরজাটা অবশেষে খুলে গেল। তবে মাত্র এক কি দেড় ইঞ্চি, যেন নিজের আবরু বা শ্লীলতা রক্ষার চেষ্টা করছে নন্দিনী। ‘ইয়েস? কী ব্যাপার?’ জানতে চাইল সে, তারপরই মস্ত একটা হাই তুলল।

‘আমরা আপনার কমপার্টমেন্ট সার্চ করতে চাইছি,’ কাস্টমস ইন্সপেক্টর কর্তৃত্বের সুরে বলল।

‘কেন?’ খানিকটা লাজুক, কিশোরীসুলভ হাসির সঙ্গে জিজ্ঞেস করল নন্দিনী। ‘আমি একটা মেয়ে, সময়টা গভীর রাত, দরজা খুলতে বাধ্য করে বলছেন আমার জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করবেন—ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝছি না, মিস্টার। ইয়াঙ্গুনে একবার তো কাস্টমস সব দেখেইছে।’

‘অসুবিধের জন্য দুঃখিত, ম্যাডাম,’ বলল অফিসার। ‘কিন্তু পোর্টার বলছিল, আপনাকে আজ বিকেলে শ্রীলঙ্কান লোকটার সঙ্গে দেখা গেছে। কথাটা কি সত্যি?’

‘আপনি সম্ভবত মিস্টার কুমার সম্ভবের কথা বলছেন, ধরে নিচ্ছি,’ বলল নন্দিনী। ‘হ্যাঁ, পোর্টার ঠিকই দেখেছে। আপনি

জানতে চাওয়ায় অদ্ভুত লাগছে আমার।'

'কেন, ম্যাডাম, অদ্ভুত লাগছে কেন?' জিজ্ঞেস করল পোর্টার।

'কারণ ওই ভদ্রলোক বড়ই আশ্চর্য একজন মানুষ। সন্দেহ নেই, বিচিত্র একটা টাইপ-এদেরকেই বোধহয় খামখেয়ালী বলা হয়। বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ তিনি নেমে গেলেন...কী যেন নাম জায়গাটার-নয়াঙ্গুলি বিনের আগে...'

'তাউঙ্গো?'

'হ্যাঁ,' আরেকটা মস্ত হাই তুলে বলল নন্দিনী। 'নিশ্চয়ই তাই হবে। ট্রেন থেকে নেমে গেলেন। কেন, তিনি কী করেছেন?'

'ট্রেন থেকে নামেনি সে,' কাস্টমস অফিসার জানাল।

'নামেননি?' নন্দিনী এক সেকেন্ডে বোধহয় দশবার চোখের পাতা ফেলল। 'কী বলেন নামেননি! আমি তাঁকে নিজের চোখে নেমে যেতে দেখেছি...'

পোর্টার জানতে চাইল, 'তাউঙ্গোর পর তাকে আপনি আর ট্রেনে দেখেননি?'

'না।'

'এ তো দেখছি অদ্ভুত ব্যাপার,' বলল পোর্টার। 'কারণ ওই বিদেশী লোক ব্যাগেজ কারে ঢুকে সৈনিকদের ক্ষতি করেছে, চুরি করেছে মূল্যবান আর্ট কালেকশন।'

'কাজেই,' কাস্টমস অফিসার বলল, 'তাকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।'

'কী আশ্চর্য! ভদ্রলোক চোর? ছি-ছি, তা হলে তো সে মোটেও ভদ্রলোক নয়। ইস্, বড় বাঁচা বেঁচি গেছি! আমার জিনিস-পত্রও তো চুরি করতে পারত, তাই না? মায়ানমার নিরাপদ দেশ বলেই জানতাম, কিন্তু...'

'মায়ানমার নিরাপদই, আপনার চিন্তার কিছু নেই। প্রতিটি কারে এখন আমরা সৈনিক পাঠাচ্ছি...'

'এত সৈনিক রয়েছে ট্রেনে, অথচ এখনও তাকে ধরা যাচ্ছে না?' নন্দিনী বিস্মিত।

'ধরা তাকে পড়তেই হবে,' জবাব দিল কাস্টমস ইন্সপেক্টর। 'সামনে থাজিতে থামছে ট্রেন। থাজি থেকে সেই মান্দালয় পর্যন্ত লাইনের দু'ধারে ব্যারিকেড দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। তবে এই মুহূর্তে আমরা আপনার কমপার্টমেন্টটা দেখতে চাইছি, মিস নন্দিনী।'

'বেশ, ঠিক আছে,' বলল নন্দিনী। 'কিন্তু তবু না বলে পারছি না যে এর কোন যুক্তি নেই। গত কয়েক ঘণ্টা গভীর ঘুমে ছিলাম আমি।'

দরজা খুলে যেতে মেঝেতে চৌকো আলো পড়ল, একপাশে সরে দাঁড়িয়েছে নন্দিনী। স্লিপারের তলা থেকে একজোড়া স্যান্ডেল, একজোড়া রাবার সোল লাগানো ক্যানভাস শ্যু দেখতে পাচ্ছে রানা। পোর্টারের নীল ট্রাউজার ইউনিফর্মের অংশ।

স্লিপিং প্লাটফর্মের নীচে জায়গা খুব কম, তার পরও যতটা সম্ভব পিছিয়ে আনল রানা শরীরটাকে। ওর দৃষ্টিপথের এক কোণে এসে থামল পোর্টারের স্যান্ডেল জোড়া। বিছানাটাকে আড়াল করে রাখা পরদাগুলো সরিয়ে খোঁজাখুঁজি করছে সে।

রানা গা ঢাকা দিয়েছে নন্দিনীর লাগেজ-এর পিছনে। ওরা যদি এখন তার ওই লাগেজ সার্চ করতে চায়, নির্ঘাত ধরা পড়ে যাবে ও।

'ওখানে কী?' কাস্টমস অফিসারকে প্রশ্ন করতে শুনল রানা।

'ওগুলো আমার ব্যাগ,' বলল নন্দিনী। 'দাঁড়ান, একটা কথা

মনে পড়ে গেছে…’

রানা দেখল মেঝেতে হাঁটু ঠেকিয়ে একটা সুটকেসের ঢাকনি খুলল নন্দিনী, ফলে ওর সামনে পাঁচিলের মত একটা আড়াল তৈরি হলো। বাহ্, যেমন সাহস তেমনি বুদ্ধি আছে মেয়েটার।

‘আমার কাছে কিছু আমেরিকান সিগারেট আছে–এই যে। নিতে পারেন, ভালো লাগবে।’

‘আমেরিকান সিগারেট?’ পোর্টার গদ্গদ হয়ে বলল। ‘হ্যাঁ, দিলে নেব না কেন। ধন্যবাদ, ম্যাডাম, অসংখ্য ধন্যবাদ।’

দুই প্যাকেট সিগারেট নিয়ে চলে গেল ওরা। দরজাটা বন্ধ করে দিল নন্দিনী।

এক মিনিট অপেক্ষা করার পর স্লিপারের নীচ থেকে বেরিয়ে এল রানা। দেয়ালে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করছে নন্দিনী। ওর দিকে এমনভাবে তাকাল, ও যেন অচেনা কোন আগন্তুক।

‘তুমি কে আমি জানি না,’ বলল নন্দিনী, গলার আওয়াজ এত নিচু যে কোন রকমে শুনতে পেল রানা। ‘কিন্তু ইতিমধ্যে আমি তোমার দোসর বনে গেছি। তুমি অপরাধ করেছ, কিন্তু আমি তোমাকে লুকিয়ে রেখেছি। একেই বোধহয় নিজের সর্বনাশ করা বলে।’

‘ধন্যবাদ,’ বলল রানা। ‘এক সময় মনে হচ্ছিল আর এক মিনিটের মধ্যে খেলাটা শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তুমি ওদেরকে অত্যন্ত কৌশলে বোকা বানিয়েছ।’

‘এখন কী হবে, সম্ভব? চেহারা না দেখিয়ে ট্রেন থেকে তুমি নামতে পারবে না। আর দেখামাত্র ওরা তোমাকে অ্যারেস্ট করবে। যদি ছুটে পালাতে চেষ্টা করো, গুলি করে মারবে।’

‘হ্যাঁ, আমার খুব বিপদ। আমাকে একটু চিন্তা করতে দাও।’

‘ওরা কী বলল শুনেছ তুমিও। প্রতিটি কারে সৈনিক পাঠানো হয়েছে। থাজি স্টেশনের পর লাইনের দু’ধারে ব্যারিকেড দেয়া হবে।’ একটু দম নিল নন্দিনী। ‘সত্যি কথাটা বলবে আমাকে–এরকম একটা কাজ কেন তুমি করতে গেলে?’

‘শোনো, নন্দিনী, বিশ্বাস করো–সব কিছুরই গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা আছে আমার কাছে। চিনা আর্টিফ্যাক্ট থেকে কিছুই আমি চুরি করিনি...’

‘তা হলে কী ঘটেছে ওখানে?’ জিজ্ঞেস করল নন্দিনী, সন্তোষজনক একটা ব্যাখ্যা পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে। ‘বলছ ব্যাখ্যা আছে–কই, দাও! ঠিক আছে, প্রথমে বলো ব্যাগেজ কারে কী করছিলে তুমি। সৈনিকদের হাত-পা বাঁধা ছিল কেন? ওদের মুখে কাপড় গুঁজতে হয়েছে কেন?’

‘সবই তোমাকে বলব, নন্দিনী, তবে এখন নয়। যদি পারতাম এখনই বলতাম, কিন্তু তা সম্ভব নয়। আপাতত আমাকে তোমার বিশ্বাস করতে হবে।’

‘বিশ্বাস কি এরই মধ্যে তোমাকে আমি করিনি!’ জনান্তিকে করা প্রশ্ন, উত্তর দাবি করে না। নিস্তেজ একটু শব্দ করে হাসল মেয়েটা, উত্তেজনা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা। ‘অর্থাৎ পছন্দ করি বা না করি, সুদর্শন একটা চোরের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি। বাহ্, নন্দিনী, তোর প্রশংসা করতে হয়!’ রানার দিকে তাকাল সে। ‘এখন তা হলে কী করতে হবে আমাকে?’

রানা জানতে চাইল থাজিতে পৌঁছানোর পর নন্দিনীর কাজ কী।

‘থাজিতে ট্রেন বদলে মেকাটলা পর্যন্ত যাবার কথা আমার। ওখান থেকে বাকি পথ ট্যাক্সি করে যেতে হবে। পেগানে পৌঁছাতে

দু'তিন ঘণ্টা লেগে যাবে।'

বিছানার কিনারায় বসে সাবধানে চিন্তা করছে রানা। হিসাবে ভুল হলে চলবে না। আবার যখন মুখ তুলে তাকাল, দেখল নন্দিনীর চোখ জোড়া আধবোজা হয়ে আছে। 'তুমি শুচ্ছ না কেন?' জিজ্ঞেস করল ও। 'যতক্ষণ পারো ঘুমিয়ে নাও।'

'আমার কথা ভাবতে হবে না তোমাকে,' বলল নন্দিনী। 'নিজের বিপদের কথা ভাবো। কী করতে চাইছ?'

'গোটা ব্যাপারটা তোমার ওপর নির্ভর করে,' অবশেষে বলল রানা। তারপর যে প্ল্যানটা তৈরি করেছে সেটা ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করে শোনাল নন্দিনীকে, প্রতিটি অংশ আলাদাভাবে।

সমস্ত মন ঢেলে শুনল নন্দিনী।

সবশেষে জিজ্ঞেস করল রানা, 'পারবে বলে মনে করো?'

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল নন্দিনী। 'মনে হয়। কিন্তু ঠিক জানো তো, তুমি আহত হবে না?'

'সেটাই শুধু দেখা বাকি।' হাতঘড়িতে চোখ বুলাল রানা। ২:৩৯। তিন ঘণ্টা সময় আছে, ভাবল ও। স্লিপারের নীচে ঢুকে লাগেজগুলো জায়গামত টেনে নিল আবার; বলা তো যায় না, কাস্টমস ইন্সপেক্টরকে নিয়ে আবার ফিরে আসতে পারে পোর্টার।

'গুড নাইট,' অন্ধকারে ফিসফিস করল নন্দিনী।

'সুইট ড্রিমস।'

তিক্ত একটু হেসে চোখ বুজল রানা।

চোদ্দ

মায়ানমারে রানার আজ চারদিন।

কুউউ করে হুইসেল বাজিয়ে ছুটে চলেছে মান্দালয় এক্সপ্রেস। ঘুম ভাঙার পর চোখ মেলে রানা দেখল কমপার্টমেন্টে আলো জ্বলছে। তাড়াতাড়ি হাতঘড়িতে চোখ বুলাল। সাড়ে পাঁচটা।

তারমানে আর মাত্র আধঘণ্টা পর থাজিতে পৌঁছাবে ওরা। স্লিপারের নীচ থেকে ক্রল করে বেরিয়ে এল রানা, সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল।

চোখ বুজে বিছানায় শুয়ে রয়েছে নন্দিনী। হাত বাড়িয়ে তার কাঁধ ধরে মৃদু ধাক্কা দিল রানা। সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলল সে।

'ভোর,' বিড় বিড় করল রানা।

'গুড মর্নিং।' হাই তুলল নন্দিনী, হাত দুটো মাথার উপর তুলল। 'ক'টা বাজে?'

'সাড়ে পাঁচ। শোনো, আমার কমপার্টমেন্ট থেকে সুটকেস আনতে হবে। মানে, যদি এখনও ওখানে থাকে আর কী। আমি ফেরা মাত্র করিডরে বেরিয়ে যাবে তুমি, পোর্টারকে জিজ্ঞেস করবে ট্রেন কখন থাজিতে পৌঁছাবে। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল নন্দিনী। 'আমি তা হলে এখনই কাপড় পরে নিই।'

দরজার দিকে এগোল রানা।

পিছন থেকে নন্দিনী বলল, 'সাবধানে কিন্তু।'

স্লাইডিং ডোর টেনে সামান্য একটু খুলল রানা। তারপর ধীরে ধীরে মাথাটা বাইরে বের করল। পোর্টার যাই বলে যাক, করিডরে কোন সৈনিক বা কারবাইনের ছায়া পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। সাবধানে বেরিয়ে এল ও, নিঃশব্দ পায়ে এগোচ্ছে।

কোন বাধা ছাড়াই পৌঁছে গেল নিজের কমপার্টমেন্টের সামনে। টেনে স্লাইডিং ডোর খুলল, ভিতরে একবার তাকাল, পরমুহূর্তে প্রচণ্ড শক্তিতে একটা ফ্লাইং কিক মারল। সৈনিকটার হাত থেকে ছিটকে পড়ল কারবাইন, জোরাল ধাতব শব্দ হলো মেঝেতে। গুঙিয়ে উঠে কুঁজো হলো লোকটা, হারানো অস্ত্রটা কুড়ানোর চেষ্টা করছে।

এই কাজ কেউ করে না, ভাবল রানা।

যেই লোকটা সামনের দিকে ঝুঁকেছে, মেঝেতে পড়ে থাকা কারবাইনটার নাগাল পেতে যাচ্ছে, ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে তার পাঁজরে গুঁতো মারল রানা।

নিশ্চয় কিডনিটা ফাটিয়ে দিয়েছে। কারণ মুখ থুবড়ে পড়ার পর উঠতে পারছে না সে, মেঝেতে ক্রল করে দূরে সরে যাবার চেষ্টা করছে। পরমুহূর্তে রানা বুঝল, লোকটা পাকা অভিনেতা। গুরুতর আহত, এরকম একটা ভান করে কোমর থেকে ছুরিটা টেনে নিল সে, তারপর ছেড়ে দেওয়া স্প্রিঙের মত লাফ দিয়ে সিধে হলো, এক পাশ থেকে ফলাটা চালিয়ে দিয়েছে রানার গলা লক্ষ্য করে।

তৈরিই ছিল রানা। ঝপ করে বসে পড়ে হামলাটা এড়াল। ছুরির ফলা ওর মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। মেঝেতে বসেই গায়ের জোরে লাথি মারল লোকটার উরুসন্ধিতে। ও চাইছে–জ্ঞান হারিয়ে পড়ে থাকুক, তা হলে আর মেরে ফেলতে হয় না।

প্রায় উড়ে গেল লোকটা। স্লিপারের পাশের দেয়ালে মাথাটা খুব জোরে ঠুকে গেছে। অঁক-অঁক শব্দ করে বমি করল সে, তারপর জ্ঞান হারিয়ে অসাড় হয়ে গেল।

নিজের লাগেজ নিয়ে করিডরে বেরিয়ে এল রানা। কারও চোখে ধরা না পড়ে নন্দিনীর কমপার্টমেন্টেও ফিরে এল। সুটকেসটা হালকা লাগছে না, তারমানে ফলস বটমে রাখা জিনিসগুলোয় কারও হাত পড়েনি।

'করিডরে বেরিয়ে পোর্টারের সঙ্গে কথা বলব?' ফিসফিস করে জানতে চাইল নন্দিনী।

মাথা ঝাঁকাল রানা।

পাঁচ মিনিট পরই ফিরে এল নন্দিনী। বলতে হয়নি, যাবার সময় বাইরে থেকে দরজায় তালা দিয়ে গিয়েছিল। 'বলল থাজিতে ছ'টা দশে পৌঁছাবে ট্রেন। ভালো না খারাপ?'

'খারাপ নয়,' বলল রানা। 'তবে ঝুঁকি প্রচুর। তুমি নিশ্চিত–মানে, পারবে? বলতে চাইছি, আমার সঙ্গে এভাবে জড়াচ্ছ নিজেকে, পরে আবার পস্তাবে না তো? তুমি ফ্রি ল্যান্সার, স্বাধীন এজেন্ট। তোমাকে আমি কোন কাজে বাধ্য করতে পারি না।'

'একবার তো বলেছি–আছি আমি তোমার সঙ্গে,' জবাব দিল নন্দিনী, কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তার কোন অভাব নেই। 'একবার কাউকে কথা দিলে সেটা আমি রাখতে চেষ্টা করি। নিজেকে তুমি নির্দোষ বলেছ, মনে আছে তো?'

'তারমানে তুমি আমাকে বিশ্বাস করছ?'

'বিশ্বাস না করলে সাহায্য করতে রাজি হব কেন!'

হাতঘড়ি দেখল রানা। যাবার সময় হয়েছে। 'আবার দেখা না হওয়া পর্যন্ত–গুডবাই, মিস অপরূপা।'

স্থির দাঁড়িয়ে থাকল নন্দিনী, আড়ষ্ট আর ঋজু; চিবুক উঁচু করা, চোখে-মুখে গাম্ভীর্য। তার কপাল থেকে এক গোছা চুল সরাল রানা, চুমো খেল চোখে, তারপর ঠোঁটেও, সবশেষে পিছিয়ে এল।

'প্লিজ,' ফিসফিস করে বলল মেয়েটা। 'একটাই অনুরোধ: শুধু...শুধু আহত হয়ো না তুমি।'

'যথাসাধ্য চেষ্টা করব।' নিজের সুটকেস নন্দিনীর কাছে রেখে তার কমপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এল রানা, উঁকি দিয়ে আগেই দেখে নিয়েছে করিডরে কেউ নেই।

পুলম্যান কার-এর একেবারে শেষ মাথায় টয়লেটটা। ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল রানা। মেঝের গোলাকার গর্তের নীচে আড়াআড়িভাবে ফেলা কাঠগুলোকে ছুটে যেতে দেখল ও, দেখল রেললাইন থেকে আগুনের ফুলকি ছুটছে। ট্রেনের স্পিড এখনও কমছে না, যদিও থাজি ডিপোয় পৌঁছাতে আর বোধহয় দশ মিনিটও লাগবে না।

টেনে গরাদহীন জানালার কাঁচ নীচে নামাল রানা। ধুলো আর মাকড়সার জাল জমেছে জানালার ভিতর দিকের কারনিসে, ওই জায়গাটার কিনারায় উঠল রানা, তৈরি হয়ে বসে থাকল–দুই হাতে শক্ত করে জানালার ফ্রেম ধরে আছে, হাঁটু দুটো সেঁটে আছে বুকের সঙ্গে। ক্রমশ বাঁকা নিষ্প্রভ সবুজ দিগন্তরেখা, ওঠানামা করছে। কিছুক্ষণ পর পর সোনালি গম্বুজ নিয়ে একটা করে বৌদ্ধমন্দিরকে পিছনে ফেলে আসছে ট্রেন। ভোর হচ্ছে দেখে কোথায় বহুদূরে

একটা মোরগ বাঁক দিল। ভোরের আলো ভালো করে ফুটতে দেরি করছে, কারণ হালকা কুয়াশায় খেত আর পুকুর-ডোবা ঢাকা পড়ে আছে। সব মিলিয়ে একটা পিকচার-পোস্টকার্ড, একটা আকাঙ্ক্ষা–ইস্, কী ভালোই না হত এখানে যদি ক'টা দিন বেড়াতে পারতাম।

'থাজি! থাজি!' বন্ধ দরজার বাইরে পোর্টার চেঁচিয়ে উঠল।

জানালা দিয়ে আবার বাইরে তাকাল রানা। ধীরে ধীরে ট্রেনের গতি কমে আসছে। এইবার, রানা! এখন তোমার ছোট একটা পরীক্ষা। হয়তো কিছুই ঘটবে না, লাফ দিয়ে সরাসরি নরম মাটিতে পড়বে, আবার হয়তো লাফটা কায়দা মত দিতে না পারায় বা স্রেফ দুর্ভাগ্যবশত একটা পাথরে ঠুকে যাবে মাথাটা–মগজ বেরিয়ে আসবে, তবে তুমি মারা যাবে তার আগেই।

আঁটসাঁট স্প্রিঙের মত নিজেকে গুটিয়ে নিল রানা, তারপর লাফ দিল। ওর চারদিকে আকাশ আর জমিন যেন ডিগবাজি খেতে শুরু করল। ভাবছে, লাইন থেকে যদি সরে যেতে না পারি...বাঁশের তৈরি বাক্সে ভরে লাশটা শ্রীলঙ্কায় পাঠিয়ে দেবে ওরা, সেখান থেকে দেশে ফিরবে, সবাই স্মরণ করবে কত ভালো একজন লোক ছিলে তুমি।

ভালো লোকটা, সবার প্রিয় এমআরনাইন, নুড়ি পাথর ছড়ানো একটা জায়গার ঢালু কিনারায় নামল, রেললাইন থেকে মাত্র আধ হাত দূরে। তবে ওখানে থেমে থাকল না। যেভাবেই হোক শরীরটাকে গড়িয়ে দিয়েছে ও।

গড়াতে গড়াতে শুকনো একটা নালার মধ্যে এসে স্থির হলো রানা। ওর পিছনে সগর্জনে ছুটছে ট্রেন, তবে গতি কমে আসছে। শরীরের নীচে জমিন কাঁপতে শুরু করল। দশ-বারোটা পাথরকে

গড়িয়ে নেমে আসতে দেখল ও। সরে যাবার সময় পেল না, একটা পিঠে এসে লাগল। আরেকটা লাগল পায়ে। তৃতীয় পাথরটা একটুর জন্য মাথায় লাগল না। তারপর সব স্থির আর নীরব হয়ে গেল।

ট্রেনটাও চলে গেছে। এখন শুধু পাখির কিচিরমিচির শুনতে পাচ্ছে রানা। কিছু ভেঙেছে কিনা পরীক্ষা করে আপনমনে হাসল। পুরানো লোহা! কোথাও একটা আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি।

এতক্ষণে নিজের চারদিকে তাকাল রানা। সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে উঠল। চারদিকে ঘন জঙ্গল ছাড়া আর কিছু দেখার নেই।

ওর সঙ্গে একটা ম্যাপ আছে ঠিকই, কিন্তু একটা রাস্তা খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত সেটা খুব একটা কাজে আসবে না।

সিধে হয়ে গায়ের ধুলো ঝাড়ল রানা, তারপর নালা থেকে উঠে এসে ম্যাপটায় একবার চোখ বুলাল। উত্তর দিকে এগোতে হবে ওকে, মাইলখানেক হাঁটলে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটা সরু রাস্তার দেখা পাবে।

সাপের কথা মনে রেখে সাবধানে হাঁটছে রানা। সাপের মতই বিপজ্জনক আরেকজনের কথা মনে পড়ে গেল ওর। রহস্যময় সেই চতুর্থ ব্যক্তি।

এই যে এত কষ্ট করছে রানা, তার ফলও তো পাচ্ছে। আর কিছু না হোক, চার নম্বর লোকটাকে অবশেষে ফাঁকি দিতে পেরেছে ও।

লোকটা এমনকী যদি ট্রেনেও উঠে থাকে, রানার সঙ্গে সময়ের হিসাবে হেরে গেছে সে। জাতীয় মিউজিয়ামেও বোধহয় দেরি করে ফেলাতেই সুবিধে করতে পারেনি।

ইয়াঙ্গুনকে রানার মনে হচ্ছে তিনশো মাইল নয়, তিন হাজার

মাইল দূরে।

আরেকবার ম্যাপ দেখল রানা। উত্তর-পশ্চিমে লম্বা যে রাস্তাটাকে 'মেজর হাইওয়ে' বলা হচ্ছে, ওটা ধরে থাজি থেকে মেকটিলা যাবে, তারপর ইরাবতী পর হয়ে বিচ্ছিন্ন, খুদে একটা গ্রাম পেগানে পৌঁছাবে।

বিশ মিনিট হাঁটার পর ঝোপগুলো হালকা হয়ে এল, জঙ্গলও এখন আর তেমন ঘন মনে হচ্ছে না। তারপর একটা মেটো রাস্তায় উঠে এল রানা, তবে এটাই খুঁজছে কিনা আরেকবার ম্যাপ না দেখে বলা সম্ভব নয়।

সবজি ভর্তি একটা ট্রাক ধুলোর মেঘ উড়িয়ে ছুটে গেল উত্তর দিকে। ম্যাপ খুলে আরেকবার দেখল রানা। ট্রাকটার পিছু নিলে, অর্থাৎ ডানে এগোলে আরেকটা রাস্তা পাবে ও। ওই রাস্তাতেই ওর সঙ্গে দেখা করার কথা নন্দিনীর। তার সঙ্গে কথা হয়েছে, থাজি থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করবে সে, তারপর সেটাকে মেকটিলার দিকে ছোটাবে, মাঝপথ থেকে তুলে নেবে ওকে। ওখান থেকে পেগান পর্যন্ত যাবে ওরা, তারপর নিজের জন্য আলাদা একটা গাড়ির ব্যবস্থা করবে রানা, মায়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্তে পৌঁছানোর জন্য।

মায়ানমারের রাজধানী যে এখন নিরাপদ জায়গা নয়, এটা পরিষ্কার। কালো নকশা কোথায় আছে, দেরিতে হলেও এ তথ্য আগ্রহী ইন্টেলিজেন্সগুলো এতক্ষণে পেয়ে গেছে। তারমানে মায়ানমারে পিল পিল করে স্পাই ঢুকতে শুরু করেছে। কাজেই ইয়াঙ্গুন হয়ে চিনে যাবার আইডিয়াটা বাতিল করে দিয়েছে রানা। তবে মাইক্রোফিল্মটা সরাসরি চিনা সিক্রেট সার্ভিসের হাতে তুলে দিতে হবে, সম্ভব হলে চিফ লিউ ফু চুঙের হাতে। দেশে পৌঁছে

জরুরি মেসেজ পাঠিয়ে প্রিয় বন্ধুকে ঢাকায় ডেকে পাঠাতে পারে রানা।

দালিয়াকে নিয়েও কোন চিন্তা নেই রানার। আপাতত কিছুদিন সেফ হাউসেই থাকবে সে, তারপর তার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা যাবে। সেটা যে অসম্ভব উজ্জ্বল, তাতে আর সন্দেহ কী। কর্তৃপক্ষ খুব ভালো করেই উপলব্ধি করবে যে জিজিয়ানা দালিয়ানের দেশপ্রেম চিনকে কত বড় বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

অবশ্যই তার প্রতিদান পাবে দালিয়া। হয়তো তথ্য মন্ত্রণালয়ের বড় কোন পদ দেওয়া হবে তাকে। যে পদ পেলে আমেরিকানরাও তার গায়ে হাত দেওয়ার কথা ভাবতে সাহস পাবে না।

ডান দিকে হাঁটছে রানা। ওর রোলেক্সের সঙ্গে একটা কম্পাস আছে, সেটা দেখে উত্তর দিক চিনতে পারছে ও। মেটো হলেও, বেশ চওড়া রাস্তা, এক ধার ঘেঁষে এগোচ্ছে ও। তবে ওই একটাই ট্রাক গেছে, আর কোন গাড়ি বা লোকজন চোখে পড়ছে না।

সূর্য ধীরে ধীরে উপরে উঠছে। বহুদূর থেকে ঢংঢং করে ঘণ্টা পড়ল। এরকম মাঝে মধ্যেই শুনতে পাচ্ছে রানা। বোধহয় মন্দির থেকে আসছে।

পাত্তা না দিলেও কত রকমের ভয় জাগে মনে।

নন্দিনী যদি না আসে, খুব খারাপ অবস্থায় পড়ে যাবে ও। না, সেরকম কিছু ঘটবে না। মেয়েটা তাকে সাহায্য করেছে, কাজেই শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করার কোন মানে হয় না।

আচ্ছা, এ কেমন রাস্তা যে একটা গরুর গাড়িও চলে না?

নন্দিনী ঠিকই ওর জন্য অপেক্ষা করবে, নিজেকে বারবার

আশ্বস্ত করছে রানা।

পুলিশ নিয়ে?

আরে নাহ্!

ধ্যেত, তার কথা আর আমি ভাববই না।

চৌরাস্তায় পৌঁছাল রানা, ট্রেন থেকে পালাবার দুই ঘণ্টা পর। ধুলোয় প্রায় সাদা হয়ে গেছে কাপড়চোপড়। তার উপর দরদর করে ঘামছে। দেখে মনে হচ্ছে একটা ভূত, ভয় না পাবার কোন কারণ নেই। কিন্তু নন্দিনী অপরূপার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। পুরানো আর তোবড়ানো একটা জিপের ব্যাকসিটে বসে আছে সে। চোখা-চোখি হতেই লাফ দিয়ে নেমে এল জিপ থেকে, ঠিকই চিনতে পেরেছে।

রানার দিকে ছুটে আসছে নন্দিনী, চেঁচাচ্ছে। 'সম্ভব, সত্যি তুমি অসম্ভব! চিন্তায় আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। বুঝতে পারছিলাম না কী করব, কী ভাবব...'

'পানি আছে?' ফিসফিস করল রানা, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

মাথা ঝাঁকাল নন্দিনী। 'আমরা একটা ক্যানটিন এনেছি।'

'আমরা?'

'লবুয়াং লোবু আর আমি। আমাদের ড্রাইভার। গোটা থাজি খুঁজে ওকেই শুধু পেলাম, যে পেগান পর্যন্ত যেতে রাজি হয়েছে।' নিজের হাতটাকে হুক বানিয়ে রানার একটা হাত আটকে নিল নন্দিনী, জিপের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওকে।

ব্যাকসিটে বসে ক্যানটিন থেকে সরাসরি পানি খেল রানা। কৃতজ্ঞ বোধ করল ও। ধন্যবাদ দিল। কিন্তু নন্দিনী একনাগাড়ে বকে চলেছে, ধন্যবাদ গ্রহণ করার সময় কোথায় তার।

মায়ানমারের মফস্বলে ড্রাইভার যোগাড় করা আর বাঘের দুধ পাওয়া, একই কথা। আবার নিজের গাড়ি আছে, এমন ড্রাইভার পাওয়া তো আরও কঠিন।

'আপনারা রেডি?' লবুয়াং লোবু জানতে চাইল। 'গাড়ি ছাড়ব?'

লোকটা পিছন ফিরে ওদের দিকে তাকাল। ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়স হবে, ঘন ভুরু যেন ঝুলে আছে চোখের উপর। একটা চোখে তারা বলে কিছু নেই, সম্পূর্ণটাই দুধের মত ঘোলা আর মাত্র অর্ধেকটা খোলে, দুই কান পর্যন্ত বিস্তৃত হাসি থাকলেও, ওই চোখের কারণে নিষ্ঠুর আর নীচ বলে মনে হচ্ছে তাকে। প্রকৃতি কারও কারও বেলায় অবিচার করে বটে; এই লোকটা হয়তো সেই অবিচারের শিকার। 'উই গো নাও, হোকে?' আবার জিজ্ঞেস করল সে।

'হোকে,' বলল রানা। ওর উচ্চারণ শুনে হেসে উঠল নন্দিনী। শুধু হাসল না, রানার গায়ের সঙ্গে সেঁটে এল সে; হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে ফুর্তি যেন ধরে না। ব্যাগেজ কারের দরজায় দাঁড়ানো মেয়েটার ছবি ভেসে উঠল রানার চোখের সামনে, অবিশ্বাস আর বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে আছে চোখ জোড়া–সেই মেয়ে আর এই মেয়ে, পরিবর্তনটা নাটকীয়ই বলতে হবে।

সিটে হেলান দিয়ে আপনমনে মিটিমিটি হাসল রানা। ইগনিশনে চাবি ঘোরাল লোবু, ইমার্জেন্সি ব্রেক রিলিজ করল, তারপর পা রাখল গ্যাস পেডালে। রওনা হয়ে গেল ওরা।

নন্দিনীর দিকে ফিরল রানা, জানতে চাইল, 'এবার বলো। থাজিতে ট্রেন থেকে নামার পর কী ঘটল?'

'তুমি কল্পনাও করতে পারবে না কী ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে

পড়েছিলাম,' প্রবল উৎসাহে শুরু করল নন্দিনী। 'প্লাটফর্মে সশস্ত্র সৈনিকরা মহড়া দিচ্ছে। সারি সারি জিপ দাঁড়িয়ে আছে। ভাগ্য ভালো যে তারা আমার ব্যাগ চেক করেনি–আমি আসলে সেই কাস্টমস অফিসারকে ধরি, ওই যে, যাকে সিগারেট ঘুষ দিয়েছিলাম। সেই আমাকে ঝামেলা থেকে বাঁচায়।' ঘাড় ফিরিয়ে নিজেদের সুটকেসগুলো একবার দেখে নিল সে। 'তোমার ব্যাগ ওরা না খোলায় আমরা কী ভাগ্যবান?'

'ভাগ্যবান?' ভুরু কোঁচকাল রানা। ওর বুঝতে ভুল না হলে, মেয়েটার এখনও ধারণা চিনাদের কালেকশান থেকে কিছু চুরি করেছে ও।

'আমি কি বলতে চাইছি তুমি জানো,' বলল নন্দিনী।

'না, সত্যি বলছি, জানি না। আমার ব্যাগে কাপড়চোপড় ছাড়া আর কিছু নেই,' জবাব দিল রানা। 'তবে তুমি একজন পুরুষের ওয়ার্ড্রোব নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ দেখলে তাজ্জব হয়ে যেত ওরা।'

নার্ভাস ভঙ্গিতে একটু হাসল নন্দিনী।

'তুমি এখনও আমাকে একজন ক্রিমিন্যাল বলে মনে করো, তাই না, নন্দিনী?'

'না, কে বলল। সুটকেসটার কথা জিজ্ঞেস করেছি বলেই তুমি ধরে নেবে...'

'ঠিক আছে, এ প্রসঙ্গ বাদ দাও, নন্দিনী। তুমি পৌঁছেছ, এটাই আসল কথা। আমি সত্যি কৃতজ্ঞ।'

'ধন্যবাদ।' রানার চোখের দিকে তাকাচ্ছে না নন্দিনী। 'তবে গাড়ি সহ একজন ড্রাইভার পাওয়া, একা একটা মেয়ের পক্ষে, মোটেও সহজ কাজ ছিল না। থাজির বেশিরভাগ লোক ঘোড়ার গাড়ি চড়ে। লবুয়াং লোবুকে পাবার আগে চার জায়গায় ঢুঁ মারতে

হয়েছে আমাকে।’

ড্রাইভারের দিকে তাকাল রানা। নাক বরাবর সোজা তাকিয়ে আছে লোকটা, দুটো হাতই হুইলে। ‘ও কি ইংরেজি জানে?’ গলা খাদে নামিয়ে জানতে চাইল রানা।

‘বেশি না,’ জবাব দিল নন্দিনী। তারপর হাসতে লাগল। ‘ওর সামনে কথা বলতে বাধা নেই তোমার।’ রানার কাঁধে মাথা রাখল সে। ‘আমাকে দেখে খুশি হয়েছ?’

‘অসম্ভব।’

‘আমি সুখী।’ রানার কাঁধে আর গলায় মুখ ঘষল নন্দিনী। ‘আমি শুধু নিজের কথাই বলে যাচ্ছি, জানতে চাইছি না তোমার সময়টা কীভাবে কাটল।’

‘সব ঠিকঠাক মতই ঘটেছে। লাফ দিয়ে রেললাইন থেকে দূরে পড়াটাই ছিল সবচেয়ে কঠিন। তবে ও-সব এখন থাক।’ সামনের দিকে ঝুঁকে লবুয়াং লোবুর কাঁধে টোকা দিল রানা। রিয়ারভিউ মিররে ধরা পড়ে গেছে লোকটা–বারবার ওর দিকে তাকাচ্ছে। ‘পেগানে পৌঁছাতে কতক্ষণ লাগবে বলতে পারো?’

‘ভালো ইংলিশ স্পিকিং আমার হয় না, সার।’

প্রশ্নটা এরপর বার্মিজ ভাষায় করল রানা। সঙ্গে সঙ্গে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করা চওড়া হাসি দেখা গেল লোবুর মুখে।

‘হয়তো আরও সাত ঘণ্টার মত, সার।’ এক চোখ দিয়ে রিয়ারভিউ মিররে তাকিয়ে আছে লোবু ।

‘ধন্যবাদ।’ লোবু চোখটা সরিয়ে নিতে সিটে হেলান দিল রানা, তারপর পেশিতে ঢিল দেওয়ার চেষ্টা করল। কী কারণে বলা মুশকিল, স্নায়ুতে টান অনুভব করছে ও।

রাস্তার ধারে, চুলো থেকে উঠে আসা ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছে

রানা। ঘরগুলো বস্তির অংশ বলে মনে হলো–বাঁশ আর দরমার তৈরি কুঁড়ে।

‘তুমি কিন্তু এখনও আমাকে বলোনি পেগানে পৌঁছানোর পর কী করবে তুমি।’

নন্দিনীর দিকে তাকাল রানা। ‘দেখি লোবুকে পটাতে পারি কিনা। সে যদি সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, সবচেয়ে খুশি হই।’

‘সীমান্ত মানে–ইন্ডিয়া?’

মাথা নাড়ল রানা। ‘ইন্ডিয়ার চেয়ে বাংলাদেশ কিছুটা কাছে। পেগান থেকে সীমান্তে পৌঁছাতে হলে কয়েকশো মাইল পাহাড়ী এলাকা পেরুতে হবে। ক্লান্তিকর জার্নি। সীমান্তে একটু ঝুঁকিও আছে–দুই পক্ষই যার যার এলাকায় টহল দিচ্ছে। কী জানি, ড্রাইভার রাজি হবে কিনা। তার অবশ্য সীমান্ত না পেরুলেও চলবে। রাজাউন পাড়া হয়ে ফকিরা বাজার পর্যন্ত গেলেই হবে, ওখান থেকে চট্টগ্রামের গর্জানিয়া বা মোনাইচারা চলে যাব আমি।’

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল নন্দিনী। ‘বলছ তুমি নাকি নির্দোষ, অথচ এখনও পালিয়ে বেড়াচ্ছ। কিছু মনে করলে করবে, কিন্তু কথাটা না বলেও পারছি না–চিরকাল কেউ পালিয়ে বেড়াতে পারে না, সম্ভব।’

হেসে উঠল রানা। ‘চিরকাল পালিয়ে বেড়াতে যাব কেন? আমি শুধু একটা ভুল বোঝাবুঝির কারণে মায়ানমার থেকে পালাচ্ছি–ব্যস।’

‘ব্যস?’ নন্দিনী বিস্মিত। মাথাটা একটু কাত করে কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখছে রানাকে। ‘তুমি মানুষটা কেমন, এখনও আমি জানতে পারিনি। বোধহয় কোনদিন জানাও হবে না।’

এরপর নন্দিনী চুপচাপ হয়ে গেল, রানাও তাকে আর বিরক্ত

করল না।

বিকেল সাড়ে তিনটের দিকে ইরাবতীর ঘোলাটে পানি দেখতে পেল রানা। নদীটা এদিকে যথেষ্ট চওড়া, তবে স্রোতের গতি খুব ধীর, ওপারেই পেগান। থাজি আর মেকটিলার জঙ্গল আর ধান খেত অনেক আগেই হারিয়ে গেছে ওদের পিছনে, তার বদলে শুরু হয়েছে শুকনো খটখটে অনুর্বর মাঠ, যতদূর দৃষ্টি যায়।

'ওদিকে তাকাও,' বলল নন্দিনী। উত্তেজিত দেখাচ্ছে তাকে, হাত তুলে নদীর দিকটা দেখাচ্ছে।

দৃশ্যটা অদ্ভুত, পাঁচ হাজার পরিত্যক্ত প্রাচীন মন্দির, প্যাগোডা, মনুমেন্ট, আর ওগুলোর ধ্বংসাবশেষ দাবার ভাঙা ঘুঁটির মত সাজানো। পরিবেশটায় অলৌকিক কী যেন একটা আছে, আর আছে বিষণ্নতা; সময় এখানে স্থির।

'আমার গা ছমছম করছে,' ফিসফিস করল নন্দিনী, ওরা যেন নিষিদ্ধ বা পবিত্র কোন এলাকায় ঢুকছে।

একা শুধু লবুয়াং লোবু নির্বিকার, দৃশ্যটা দেখে তার কোন প্রতিক্রিয়াই হলো না। ধীরে ধীরে মোচড় নেওয়া রাস্তা ধরে সাবধানে জিপ চালিয়ে নদীর কিনারায় এসে থামল সে। এক ঝাঁক সরু জেলে নৌকা দেখা গেল, চারদিকে আসা-যাওয়া করছে।

'আশ্চর্য একটা ম্যাজিকাল জায়গা, তাই না?' বিড়বিড় করল নন্দিনী। 'আমি এখানকার কয়েকশো ফটো আর ডজন ডজন ড্রয়িং দেখেছি। তবে নিজের চোখে দেখা সম্পূর্ণ অন্যরকম অভিজ্ঞতা। এ-সবের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমার কল্পনা করতে ইচ্ছে করছে নয়শো বছর আগে কেমন দেখতে ছিল এই জায়গাটা, রাজা অনুরাধা কীভাবে তাঁর দেশ চালাতেন...' মাথাটা এদিক-ওদিক দোলাল সে, আবেগে এতই বিহ্বল হয়ে পড়েছে যে কী বলবে

বুঝতে পারছে না।

‘আর তারপরই, ১২৮৭ সালে কুবলাই খান এসে দখল করে নিল রাজধানী। রয়ে গেল শুধু এগুলো।’

‘তবে এর ইতিহাস সমৃদ্ধ। সব পরিত্যক্ত হলেও, ভেঙে পড়লেও, সত্যিকার অর্থে প্রাণহীন নয়।’

কথা আর না বাড়িয়ে ড্রাইভারের দিকে তাকাল রানা। ‘এরপর কী, লোবু?’

‘আমরা ফেরি ধরে নদী পার হব, সার,’ জবাব দিল ড্রাইভার, হাত তুলে ডকটা দেখাল, ওদের পার্ক করা জিপ থেকে কোন রকমে দেখা যাচ্ছে সেটা।

‘তারপর?’

কাঁধ ঝাঁকাল ড্রাইভার, এক চোখে তাকাল রানার দিকে। ‘তারপর আমি জানি না। পেগানে থাকার মত দুটো জায়গা আছে, তবে আপনারা কেউ আমাকে বলেননি কোনটায় যেতে হবে।’

‘নন্দিনী, তোমার কোন প্ল্যান আছে?’

‘কোন্ ব্যাপারে?’

‘থাকার ব্যবস্থা, ঘুমাবার জায়গা,’ ব্যাখ্যা করল রানা। ‘তোমাকে পাঁচ হপ্তা থাকতে হবে এখানে। লজিং-এর কথা সরকার কিছু জানায়নি?’

মাথা নাড়ল নন্দিনী। ‘না। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আমার নিজের। ভেবেছিলাম পৌঁছাবার পর যা হোক একটা কিছু করা যাবে। দেখতে দাও গাইড বুকে কী লেখা আছে।’ হাতব্যাগ হাতড়ে বইটা বের করল সে।

গাইড বুকের পাতা উল্টে আবার বলল, ‘আসলেও থাকার জন্যে মাত্র দুটো জায়গা আছে। প্রথমটা বড় একটা আধুনিক

হোটেল, পুরোপুরি এয়ারকন্ডিশনড–ওয়েলকাম বার্মা।'

'কত বড়?'

আবার বইটা পড়তে হলো নন্দিনীকে। 'কামরার সংখ্যা ছাব্বিশ।'

'দ্বিতীয়টা?'

'গেস্ট হাউস, খ্রিস্টানরা চালায়। খরচ খুব কম।'

গেস্ট হাউস সাধারণত নিরাপদও হয়, গা ঢাকা দিয়ে থাকার জন্যও ভালো। 'তোমার যদি আপত্তি না থাকে, গেস্ট হাউসে উঠতে চাই আমি।'

হেসে ফেলল নন্দিনী। 'আমিও তাই চাই।'

'গেস্ট হাউস?' জানতে চাইল লোবু।

'হ্যাঁ।'

দুটো আলাদা কামরা ভাড়া করল ওরা। ড্রাইভার লোবুর একই জিদ, সে জিপে ঘুমাবে, শুধু খাবে ওদের সঙ্গে।

গেস্ট হাউসে ওরা দু'জন ছাড়া আর কোন গেস্ট নেই, তা সত্ত্বেও স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস ফেলার জন্য যে স্বস্তিটুকু না থাকলে নয়, তা-ও পাচ্ছে না রানা। স্নায়ু টান টান হয়ে আছে। কোন কারণ ছাড়া তো এমন হবে না। কিন্তু সেই কারণটা রানা খুঁজে পাচ্ছে না।

এত দূরে মিলিটারি এসে খুঁজবে ওকে, এরকম মনে হয় না। তারা জানবে কীভাবে, যে-লোকটা ব্যাগেজ কার ঘাঁটাঘাঁটি করেছিল সে এখন পেগানের গেস্ট হাউসে ঠাঁই নিয়েছে?

দ্রুত শাওয়ার সেরে ফ্রেশ হয়ে নিল রানা। কাপড় পাল্টাবার পর নিজেকে আবার ভদ্রলোক বলে মনে হচ্ছে। নন্দিনী প্রস্তাব রাখল, দিনের আলো যেটুকুই থাকুক, নষ্ট না করে প্রাচীন

ধ্বংসাবশেষ দেখে আসা যায়। রাজি হয়ে গেল রানা, কারণ লবুয়াং লোবুর সঙ্গে কথা বলার একটা সুযোগ দরকার ওর।

গেস্ট হাউসের ম্যানেজার রানাকে জানিয়েছে, পেগানে মাত্র দুটো জিপ ভাড়া খাটে, তবে কখনোই দূরে কোথাও যায় না ওগুলো।

কাজেই রানা ভাবছে লোবু যেহেতু সেই থাজি থেকে ওদের সঙ্গে রয়েছে, ওকে সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য বুঝিয়ে-শুনিয়ে রাজি করানো যাবে।

লোবু ওদেরকে শয়েজিগন প্যাগোডা দেখতে নিয়ে এল, ওটার প্রতি ইঞ্চি সারফেস সোনার পাত দিয়ে মোড়া। উত্তেজনা আর উল্লাসে অস্থির হয়ে ভিতরে ঢুকল নন্দিনী, লোবুর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ দিয়ে বাইরে রেখে গেল রানাকে।

'আমি রাজাউনপাড়া হয়ে ফকিরা বাজারে যেতে চাই,' তাকে বলল রানা।

'ফকিরা বাজার? সে তো বহু দূর,' বলল ড্রাইভার। 'ওদিকের রাস্তা খুব খারাপ, সার। অত্যন্ত কষ্টকর জার্নি হবে।'

'সেজন্যেই তো ভালো টাকা দেব।'

খালি গোড়ালি বালিতে ঘষছে ড্রাইভার, তাকিয়ে আছে নীচের দিকে। 'ভালো টাকা কত টাকা, সার?'

'তুমিই বলো।'

'ডলার।'

'বেশ।'

'এক হাজার মার্কিন ডলার, সার। এরচেয়ে এক পয়সা কম হলেও আমি রাজি না।'

'পাবে,' বলল রানা। 'পেট্রল যোগাড় করতে সমস্যা হবে?'

জানতে চাইল ও।

মাথা নাড়ল লবুয়াং লোবু। 'জিপে অতিরিক্ত ট্যাংক আছে।'

'গুড। আমরা কাল সকালে রওনা হচ্ছি, লোবু। ঠিক আছে?'

'হোকে।' বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল লোবু।

মায়ানমারে রানার আজ পাঁচদিন।

ডাইনিং রুমে একা বসে ব্রেকফাস্ট সারছে রানা, সেই সঙ্গে মাথা ঘামিয়ে বের করার চেষ্টা করছে নন্দিনীর কাছ থেকে কীভাবে বিদায় চাওয়া যায়। ওর জন্য অনেক কিছু করেছে মেয়েটা, কাজেই তাকে জানাতে হবে–ও কৃতজ্ঞ আর ঋণী। অচেনা, সম্পূর্ণ অজ্ঞাত একজন আগন্তুককে বিশ্বাস করেছে সে, তার বিপদের সঙ্গে নিজেকেও জড়িয়েছে। না, এই ব্যাপারটাকে রানা কিছুতেই হালকাভাবে নিতে পারে না।

কিন্তু ব্রেকফাস্ট খেতে টেবিলে না এলে কিছুই নন্দিনীকে বলতে পারছে না রানা।

পেগান পুরোপুরি গ্রাম নয়, আবার পুরোপুরি শহরও নয়। এখানে ইউনিফর্ম পরা ছেলেমেয়েরা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়তে যায়, আবার রাস্তার কিনারায় ধান শুকাতেও দেওয়া হয়।

হাতঘড়ি দেখল রানা। এরইমধ্যে সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। আটটার মধ্যে রওনা হতে চায় ও। লোবু জানিয়েছে রাস্তার অবস্থা খারাপ বলে সীমান্তে পৌঁছাতে দু'দিন লেগে যাবে ওদের।

আরেক কাপ কফি ঢেলে নিল রানা। ব্যস্ত পদশব্দের আওয়াজ ভেসে এল কানে। হঠাৎ করেই দৃষ্টিপথে উদয় হলো লোবু। হাঁপিয়ে গেছে সে, কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ফুটে আছে। দুটো হাতই টেবিলে রেখে রানার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল সে, একটা

মাত্র চোখ প্রবল উত্তেজনায় বিস্ফারিত হয়ে আছে।

'উনি ওখানে নেই,' বলল সে, হাঁপানোর মাঝখানে কোন রকমে উচ্চারণ করতে পারল।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল রানা। 'কী বলতে চাও? মিস নন্দিনী তার কামরায় নেই?'

মাথা ঝাঁকিয়ে নিজের পিছন দিকটা দেখাল লোবু। ওদিকের একটা কামরায় নন্দিনীকে নিয়ে কাল রাত কাটিয়েছে রানা। 'প্রথমে দরজায় নক করি আমি, সাড়া না পেয়ে ভেতরে ঢুকে দেখি তিনি নেই...কামরা খালি।'

'হয়তো হাঁটতে বেরিয়েছে...কিংবা গেছে কোথাও,' বলল রানা, ড্রাইভারকে শান্ত করতে চাইছে, সেই সঙ্গে নিজেকেও। তারপরও লোবুর পিছু নিয়ে ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে এল ও।

দরমা আর বাঁশ দিয়ে ঘেরা একটা ছোট্ট লাউঞ্জকে পাশ কাটাল ওরা। চওড়া করিডরের দু'পাশে কামরাগুলো। নন্দিনীর ঘরের দরজা এখনও একটু খোলা। ঠেলে সেটা পুরোপুরি খুলে ভিতরে ঢুকল রানা, ওর ঠিক পিছনেই রয়েছে লোবু।

দৃশ্যটা ভালো লাগল না রানার।

কামরার সমস্ত কিছু এলোমেলো হয়ে আছে। বিছানার কাছের ল্যাম্পটা ফেলে দেওয়া হয়েছে মেঝেতে। ড্রেসার-এর ড্রয়ারগুলো খোলা, নন্দিনীর জিনিস-পত্র ছড়িয়ে রয়েছে সারা ঘরে। ধাতব ড্রেসারের কাছে নিঃসঙ্গ জানালাটা হাঁ করে খোলা। তারের জালটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে দেখে রানার তলপেটে কী যেন ডুবে যাবার অনুভূতি হলো–বুঝল, নন্দিনী কোথাও হাঁটতে বেরোয়নি বা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতেও যায়নি।

এর মানে কী? ভাবছে রানা। কেউ কি পিছু নিয়ে এসেছিল?

যাকে একবারও দেখেনি, অজ্ঞতাপরিচয় সেই রহস্যময় চতুর্থ ব্যক্তি আবারও ওকে বোকা বানিয়েছে? 'কয়েক মিনিট আগে কামরাটা কি এরকম ছিল?' লোবুকে জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা ঝাঁকাল লোবু। 'জী, সার।'

কামরাটার এদিক-ওদিক ঘুরে ভালো করে সব দেখছে রানা। এরকম বিশৃংখলার যুক্তিসঙ্গত একটা ব্যাখ্যা পেতে চাইছে ও। কিন্তু ড্রেসারের উপর পড়ে থাকা এক টুকরো কাগজকে বাতাসে নড়তে দেখে নন্দিনীর নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তাটা লাফ দিয়ে কয়েকগুণ বেড়ে গেল। দু'আঙুলে ধরে কাগজটা তুলল ও। লিপস্টিক দিয়ে মাত্র একটা লাইন লেখা হয়েছে:

মানাহা সমাধি। ওর কাছে পিস্তল আছে।

'তোমার গাড়ি রেডি?' জিজ্ঞেস করল রানা, ঝট করে ড্রাইভারের দিকে তাকাল।

উপর-নীচে মাথা দোলাল লোবু। 'সমস্যা, সার?'

মিথ্যে বলার কোন কারণ নেই। 'সেরকমই মনে হচ্ছে,' বলল রানা, নিজের ব্যাপারে নন্দিনীকে জড়ানোয় রাগ হচ্ছে নিজের উপর।

ঠিক যা ঘটবে বলে ভয় পেয়েছিল, দেখা যাচ্ছে ওর নাকের সামনে এরইমধ্যে তা ঘটে গেছে। পরিষ্কার বুঝতে পারছে রানা, অস্ত্রের মুখে কামরা থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে নন্দিনীকে। সন্দেহ নেই মাইক্রোফিল্মটা তাদের হাতে তুলে না দেওয়া পর্যন্ত জিম্মি করে রাখা হবে তাকে। এরাই নিশ্চয় চৌ মিন, থৌ মিন আর তাদের ম্যানেজারকে খুন করেছে, মাইক্রোফিল্মটা পাবার জন্য আরেকটা খুন করতে এতটুকু দ্বিধা করবে না।

'মানাহা সমাধিটা চেনো তুমি, যেতে পারবে?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল লোবু, তারপর মাথা ঝাঁকাল। ‘আমরা কি এখনই রওনা হব, সার?’

‘হ্যাঁ, এখনই।’ লোবুর পিছু নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে জিপে চড়ল রানা, রহস্যময় মিস্টার এক্স রক্তপাত ঘটাতে চাইলে শোল্ডার-হোলস্টারের পিস্তলটা কাজে লাগানো যাবে।

বাইরে এরই মধ্যে রোদ খুব তেতে উঠেছে। রানা ব্যাকসিটে উঠে বসতে গাড়ি ছেড়ে দিল লোবু।

যেটাকে ফুল-প্রুফ একটা প্ল্যান বলে মনে হচ্ছিল, এখন তাতে অসংখ্য ফুটো দেখতে পাচ্ছে রানা। এমন এক কনফ্রন্টেশানে যেতে হচ্ছে ওকে, যেটাকে প্রথম থেকে এড়াতে চেয়েছে ও। তবে এ ছাড়া কিছু করার নেই ওর। নন্দিনী শত্রুদের হাতে বন্দি, তাকে মুক্ত করে আনার জন্য সম্ভাব্য সব কিছু করতে হবে ওকে।

রানা আশা করছে দেরি হয়ে যায়নি।

ধুলোময় ফাঁকা রাস্তা। কুঁচকে সরু হয়ে থাকা চোখ দিয়ে একদিকে ধানখেত, আরেকদিকে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখছে রানা। ওদিকেই কোথাও বাগিয়ে ধরে রেডি রাখা হয়েছে একটা অটোমেটিক। ভাঙাচোরা এক ঝাঁক মনুমেন্টের মাঝখানে কোথাও একটা ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে আর্কিওলজির ছাত্রী, ভারতীয় নাগরিক নন্দিনীকে। গ্র্যান্ডমাস্টার তার চাল দিয়েছে। এবার রানার পালা, বাজিমাত নিশ্চিত করতে হবে ওকে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

স্পিড বাড়িয়ে গাড়ি ছোটাচ্ছে লোবু। ধুলোর পাহাড়ে গ্রামটা হারিয়ে গেল। ভাবতে গেলে রানার বিস্ময় বাধ মানছে না। কীভাবে ওদের পিছু নিল সে? থাজি স্টেশনে তখনও পৌঁছায়নি ওরা, ট্রেন থেকে লাফ দেয় ও। নিশ্চয় আক্ষরিক অর্থেই নিখুঁত

ছিল তার সময়ের হিসাব, কারণ ট্রেন থেকে ও গায়েব হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও পিছু নিতে কোন সমস্যা হয়নি তার, সমস্যা হয়নি নন্দিনীকে কিডন্যাপ করতেও। ঝুঁকি আছে বলে নন্দিনীকে সাবধান করেছিল ও, তবে তার জন্য এরকম একটা বিপদ অপেক্ষা করছিল, তা ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি।

মেটো রাস্তায় বাঁক নিল লোবু। নতুন পথ ধানখেতের মাঝখান দিয়ে এগিয়েছে–সরু, আগাছায় প্রায় ঢাকা। দূরে মানাহা দেখতে পাচ্ছে রানা, শোকেসে সাজিয়ে রাখা সাদা আর সোনালি কেকের মত দেখতে। ফাঁকা ধানখেতের মাঝখানে ওটা যেন একটা দুর্গ দাঁড়িয়ে আছে–ঝাঁক ঝাঁক ঝুল-বারান্দা, সরু সিঁড়ি, প্রাচীর আর গোলকধাঁধার মত প্যাসেজের সমষ্টি।

খালি খেতের উপর দিয়ে ছুটছে জিপ। তারপর ধীরে ধীরে স্পিড কমাল লোবু। পরিত্যক্ত সমাধির প্রবেশপথ থেকে বিশ গজ দূরে থামল ওরা।

ব্যাকসিট থেকে পিছলে নীচে নামার সময় মাথাটা নিচু করে রাখল রানা, জিপটাকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করছে। মনুমেন্টের গায়ে অনেকগুলো চৌকো জানালা দেখা যাচ্ছে, ফলে ভিতর থেকে চারপাশের মাঠে নজর রাখা যায়। সমাধি সৌধের সামনে ইট আর সিমেন্টের প্লাস্টার দিয়ে তৈরি একজোড়া পবিত্র সিংহ পাহারা দিচ্ছে–মৌন, চোখে সতর্ক দৃষ্টি, যেন সর্বজ্ঞ।

'নামো, তারপর নিচু হয়ে থাকো,' গলা খাদে নামিয়ে লোবুকে বলল রানা।

সঙ্গে সঙ্গে জিপ থেকে নেমে কুঁজো হয়ে গেল লোবু। আর যাই হোক, লোকটা কোন প্রশ্ন না তুলে, বিনা দ্বিধায় মেনে চলেছে ওর প্রতিটি নির্দেশ।

রানা সিদ্ধান্ত নিল, ঝুঁকিটা নেবে। কিছুই বলল না, আড়াল ছেড়ে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল, তারপর খোলা মাঠ ধরে সমাধির দিকে ছুটল।

কিছু ঘটল না। একটা সিংহ মূর্তি আড়াল দিল ওকে। ওখানে দাঁড়িয়ে সমাধির দেয়ালে কোথায় ফাঁক আছে খুঁজছে।

কোথাও কিছু নড়ছে না। 'নন্দিনী?' ডাকল রানা। 'নন্দিনী, তুমি কোথায়?'

রানার প্রতিপক্ষ এখনও দেখেনি সমাধির সামনে একটা জিপ এসে থেমেছে। এখনও হয়তো ওর পৌঁছানোর জন্য অপেক্ষা করছে সে, জানে না এরইমধ্যে পৌঁছে গেছে ও। এক ঘণ্টাও হয়নি তার অপতৎপরতা যে সংকট তৈরি করেছে, সেটা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অস্থির হয়ে আছে রানা। কিন্তু যতক্ষণ না জানছে লোকটা আসলে কে, কার সঙ্গে লাগতে হবে, তেমন কিছু করার নেই ওর।

তারপর হঠাৎ চাকার দাগ দেখতে পেল রানা।

দাগগুলো সরাসরি সমাধি সৌধের ভিতরে ঢুকেছে, তারপর আবার বেরিয়েও এসেছে, ফিরতি পথ ধরে চলে গেছে লোবুকে নিয়ে এই মাত্র যেদিক থেকে এল রানা–গেস্ট হাউস আর পেগানের দিকে।

সিংহের পিছন থেকে না বেরিয়ে টায়ারের দাগগুলো ভালোভাবে পরীক্ষা করার জন্য সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকল রানা। টায়ারের খাঁজগুলো কোনরকমে দেখতে পেল ও।

অবশ্য একবার শুধু চোখ বুলাবারই দরকার ছিল রানার। ঝট করে সিধে হয়ে লাফ দিল ও, কারও আগ্নেয়াস্ত্রের সহজ টার্গেট হতে রাজি নয়। আঁকাবাঁকা একটা পথ তৈরি করে ছুটল, অক্ষত

শরীরে পৌঁছে গেল জিপের নিরাপদ আশ্রয়ে। ঘুরে বাহনটার আরেক দিকে চলে এল রানা, চোখ বুলাচ্ছে লোবুর তোবড়ানো জিপের তৈরি টায়ারের দাগে। দেড় মিনিট আগে দেখা টায়ারের সঙ্গে হুবহু মিল রয়েছে এটার।

আর কিছু চিন্তা করার সময় নিল না, পিস্তল বের করার জন্য জ্যাকেটের ভিতর হাত ঢোকাল রানা।

'তোমার জায়গায় আমি হলে কাজটা করতাম না, রানা,' লবুয়াং লোবু কথা বলছে, তার মার্কিনি উচ্চারণের ইংরেজি নিখুঁতই বলতে হবে। আর হাতের ভারী পিস্তলটা .৩৫৭ ম্যাগনাম প্যারাবেলাম।

পনেরো

'কী ব্যাপার, রানা, দেখে মনে হচ্ছে বড় একটা ঝাঁকি খেয়েছ?' হাসল লোবু, তার সাদা চোখটা বিস্ফারিত আর অপলক। হাতের ম্যাগনাম রানার বুক বরাবর তাক করা, আঙুলটা ট্রিগার গার্ডে শক্তভাবে সেঁটে আছে।

'হ্যাঁ, একটু তো অবাক হয়েইছি।' রানাও সপ্রতিভ একটা ভঙ্গি করে হাসল, তারপর এক পা সরে দাঁড়াল–চোখে যাতে রোদ না লাগে।

লবুয়াং লোবু সঙ্গে সঙ্গে নড়ে উঠল। তার তর্জনী ট্রিগার গার্ড থেকে সরে ট্রিগারকে পেঁচিয়ে ধরল। ওটায় আর এক চুল চাপ পড়লেই মাসুদ রানার ইহজীবন বলে কিছু থাকবে না। 'এ কাজ আর কোরো না, রানা,' পরামর্শ দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল সে, দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসছে। 'আমি খুব নার্ভাস হয়ে পড়ি। আর আমি নার্ভাস হলে জঘন্য সব কাণ্ড ঘটে যায়।'

কথা বলছে না, রানার চোখ স্থির হয়ে আছে অস্ত্রটার উপর।

'রূপ আর যৌবনের একটা লোভনীয় প্যাকেজ মেয়েটা, তাই

না?’ হেসে উঠল লোবু। ‘সময়টা তুমি বেশ এনজয় করেছ, তাতে কোন সন্দেহ নেই।’

‘নন্দিনী কোথায়?’

‘মিস অপরূপা?’ নিঃসঙ্গ চোখটা সরু করল লোবু, মানাহা সমাধির দিকে একবার তাকাল। ‘সে খুব ভালো জায়গায় আছে, সম্পূর্ণ নিরাপদ। তবে তুমি যদি আবার তাকে দেখতে চাও, রানা, ফিল্মটা আমার হাতে তুলে দিতে হবে। ব্যাপারটা এরকমই জলবৎ তরলং।’

তা হলে এই বেজন্মাটাই, ভাবল রানা, সেই হংকং থেকে ওর স্নায়ুর উপর কামড় বসাচ্ছে। অবিশ্বাস্যই বলতে হবে যে চতুর্থ ব্যক্তি একজন বার্মিজ।

‘কী হলো,’ ধমকে উঠল লবুয়াং লোবু। ‘ফিল্মটা দাও, রানা।’

মাইক্রোফিল্মটা হাতে পাবার জন্য এত বেশি উতলা হয়ে উঠেছে লোকটা, রানার পিস্তলটার কথা মনেই নেই–হোলস্টার থেকে বেরিয়ে আছে অর্ধেকটা।

হাত দুটো শরীরের দু’পাশে ঝুলিয়ে রেখেছে রানা, অপেক্ষায় আছে কখন তার চোখ বা মন ঘুরে যায়।

‘ফিল্মটা আমার সঙ্গে নেই,’ বলল ও, ঠাণ্ডা আর নিরাসক্ত দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল।

‘তুমি মিথ্যেকথা বলছ।’

‘না, এটাই সত্যি। গেস্ট হাউসে রেখে এসেছি। বুঝতেই পারছ, নিরাপদ জায়গায় লুকানো আছে। ঠিক নন্দিনীর মত।’

‘তুমি অযথা দেরি করছ,’ বলল লোবু। ‘আমি যদি সার্চ করতে গেস্ট হাউসে যাই, এখানে তোমাকে মেরে রেখে যাব।’

‘আমি তোমাকে ফিল্মটা দিলাম, তারপর? নন্দিনীর কী হবে?’

জিজ্ঞেস করল রানা, চিন্তা করার জন্য সময় পেতে চাইছে ও।

'তোমাকে তো বললামই, মিস অপরূপা এখনও বেঁচে আছে। আবার তুমি তাকে দেখতে পাবে, আশ্বাস দিচ্ছি।'

'কিন্তু আমাকে প্রথমে জানতে হবে মিন ভাই আর তাদের ম্যানেজারের চেয়ে ভালো অবস্থায় আছে সে।'

লোবু কিছু বলল না, এমনকী তার কোন প্রতিক্রিয়াও হলো না।

'তুমি তা হলে ফিল্মটা চাও?' হাল ছেড়ে দেওয়ার সুরে জানতে চাইল রানা।

'তুমি অযথা সময় নষ্ট করছ, রানা,' জবাব দিল লোবু, 'কোথায় সেটা বলবে, নাকি প্রথমে পেটে একটা গুলি করে ইন্টারোগেট শুরু করব?'

মাথা নাড়ল রানা। 'না, আমি চাই না সেরকম কিছু ঘটুক। এমন একটা সুন্দর দিনে রক্তপাত ভালো দেখাবে না।'

লোবু হাসল না বা ভুরু কোঁচকাল না। তার হাতের অস্ত্র একচুল কাঁপছে না। ট্রিগার পেঁচানো আঙুলটা একটু নড়লেই রানার মধ্যভাগে একটা গর্ত তৈরি হবে। চিন্তাটা মোটেও স্বস্তিকর নয়।

'ফিল্মটা পেলে তুমি আমাকে জানাবে নন্দিনী কোথায় আছে? ওয়াদা?'

'ওয়াদা।'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'উপায় কী, তুমি যখন আমাকে পিস্তলের মুখে পেয়ে গেছ।' সামনে ঝুঁকে বাম জুতোর দিকে হাত বাড়াল ও। 'গোড়ালিটা ফাঁপা,' জানিয়ে রাখল, অকারণে যাতে নার্ভাস না হয়। ভান করছে জুতোটা খুলতে খুব ঝামেলা হচ্ছে। ওর দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে লোবু। তার মুখ থমথম করছে, কী ভাবছে বোঝা যাচ্ছে না।

জুতোটা শেষ পর্যন্ত খুলল না রানা। হঠাৎ এক মুঠো ধুলো তুলে নিয়ে লোকটার চোখে ছুঁড়ে মারল। মুহূর্তের জন্য অন্ধ, তবে ট্রিগার টানতে ইতস্তত করল না সে। গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। সামনে এগিয়ে ধাক্কা দেওয়ার জন্য হাত ছুঁড়ল রানা, লোবু যাতে ভারসাম্য হারায়। কিন্তু পাহাড়ী ছাগলের মত চঞ্চল সে, ঝট করে সরে গেছে–বাড়ানো হাতে শুধু বাতাস অনুভব করল রানা। আবার গুলি হবে, ধরে নিয়ে গুলির সম্ভাব্য পথ থেকে সরে এল ও, তারপর ডাইভ দিয়ে পড়ল জিপটার আরেক দিকে।

দ্বিতীয় গুলি হলো। রানার কাছ থেকে আধ হাত দূরে খানিকটা ধুলো উড়ল। ক্রল করে গাড়ির তলায় চলে এল ও।

ওখান থেকে লোবুর পা দেখতে পাচ্ছে রানা। কাল তাকে রানা খালি পায়ে দেখলেও এখন জুতো পরে আছে। পুরানো লেদার শ্যু আর ঢোলা ট্রাউজার দ্রুত পিছু হটল। হোলস্টার থেকে ওয়ালথারটা টেনে নিল রানা, খানিক আগে লোবু ওকে নিরস্ত্র না করায় ভাগ্যের প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু পিস্তলের সাইট যখন টার্গেটের লেভেলে নিয়ে এল, দেখল জুতো আর ঢোলা ট্রাউজার ওর দৃষ্টি পথে নেই।

জিপের নীচে শরীরটা ঘোরাল রানা। পরিত্যক্ত সমাধি সৌধের কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে, একটা সিংহের আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছে লোবু, ওখান থেকে হাত লম্বা করে সাবধানে গুলি করল আরেকটা। রানা বুঝল, নিজের গাড়ির টায়ার ফাটাতে চায় না লোকটা–তা হলে হেঁটে ফিরতে হবে।

পিছিয়ে এল রানা। গায়ে রোদ নিয়ে সিধে হলো। কাছাকাছি ফেন্ডারের পিছনে মাথা নিচু করে দাঁড়াল, জিপটা যথেষ্ট আড়াল দিচ্ছে।

বুড়ো সিংহের পাশ থেকে আবার গর্জে উঠল ম্যাগনাম। জিপের মরচে ধরা হুডে বিকট আওয়াজ করল বুলেটটা।

ম্যাগনামের ফ্ল্যাশ দেখামাত্র ট্রিগার টেনে দিয়েছে রানাও। প্রাজ্ঞ সিংহ একটা কান হারাল। চমকে উঠে মুহূর্তের জন্য পিছিয়ে গেল ওর প্রতিপক্ষ, পরক্ষণে আরেকটা গুলি।

কিন্তু ইতিমধ্যে মাথা নিচু করে ছুটতে শুরু করেছে রানা, লোবু টার্গেট প্র্যাকটিসে উন্নতি করার আগেই মূর্তিটার কাছে পৌঁছাতে চায়।

ম্যাগনাম পলকের জন্য একবার ঝিক্ করে উঠল, পরক্ষণে শোনা গেল বিস্ফোরণের শব্দ। দ্বিতীয় সিংহের কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে রানা, তবে তার বুলেট ক্ষতি যা করার করে ফেলেছে। ব্যথাটা আগুনে পোড়ার মত। ওর কাঁধের মাংসে খাঁজ কেটেছে বুলেট। নিশ্চয়ই শার্ট ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে। টার্গেট প্র্যাকটিসে লোকটা আরও ভালো করতে পারে, এই ভয়ে বসে পড়েছে রানা, ছেঁড়া আর ধুলো মাখা ব্লেজারটা খুলে ফেলছে।

শার্টের আস্তিন রক্তে ভিজে জবজব করছে। টেনে খানিকটা ছিঁড়ে ফেলতে ম্যাগনামের তৈরি গভীর ক্ষতটা দেখতে পেল। ভাগ্যটা নেহাতই ভালো যে শুধু বাইরের দিকের পেশিতে ক্ষতি হয়েছে। তবে এরই মধ্যে অবশ হয়ে এসেছে হাতটা। আর রক্তক্ষরণ বন্ধ করতে না পারলে লবুয়াং লোবুকে ধরা বা নন্দিনীকে সাহায্য করা সম্ভব হবে না।

ছেঁড়া আস্তিন দিয়ে ক্ষতটা আঁটো করে বেঁধে ফেলল রানা। রক্ত পড়া বন্ধ হলো।

সমাধির ভিতরে গা ঢাকা দিয়েছে লোবু। ছায়া ঢাকা প্রবেশপথে চোখ বুলাচ্ছে রানা। ম্যাগনাম বা নষ্ট চোখটা কোথাও

দেখা যাচ্ছে না। কাজেই রানার সামনে আর কোন বিকল্প পথ খোলা নেই–সে নন্দিনীর কাছে পৌঁছানোর আগেই তাকে ধরতে হবে ওর। আর যদি এরই মধ্যে নন্দিনীর কাছে পৌঁছে গিয়ে থাকে লোবু? সেক্ষেত্রে দ্রুত স্থান ত্যাগ করতে হবে ওকে, তা না হলে ঘাড়ে একটা হত্যা আর লাশের দায় চাপবে।

চিন্তাটা সুখকর নয়।

সমাধিতে ঢুকতে হলে আড়াল থেকে বেরুতে হবে রানাকে। প্রবেশ পথের আড়ালে কোথাও লোকটা যদি লুকিয়ে থাকে, দ্বিতীয় গুলিটা নির্ঘাত বুকে বা মাথায় খাবে ও।

পায়ের কাছ থেকে মুঠো আকৃতির একটা পাথর তুলে সমাধির দিকে ছুঁড়ল রানা। জমিনে পড়ে ভোঁতা আওয়াজ তুলল পাথরটা। চমকে উঠে সেদিকে কেউ গুলি করল না। রানা সিদ্ধান্ত নিল, সমাধির ভিতর ঢুকবে। যতই ঝুঁকি থাক, অন্তত চেষ্টা করে দেখতে হবে নন্দিনীকে বাঁচানো যায় কিনা।

ছুটল রানা। ফাঁকা জায়গাটা দ্রুত পেরিয়ে আসছে, কিন্তু কোন গুলি হচ্ছে না। প্রবেশ পথে পৌঁছাচ্ছে, এই সময় ওর অনেক উপর থেকে ভেসে এল বিস্ফোরণের শব্দটা, দালানটার ভিতর দিক থেকে। সৌধের সামনের দিকটায় অসংখ্য ঝুল-বারান্দা আর পোর্টিকো আছে, সেগুলোর যে-কোন একটায় থাকতে পারে লোবু।

মানাহা সমাধির ভিতরে ঢোকার পথ হলো সরু কয়েকটা প্যাসেজ। কিছুদূর পরপর দেয়ালের গায়ে তাক আছে, সে-সব তাকে বসে আছে বুদ্ধমূর্তি। এরকম একটা মাটির তৈরি বুদ্ধমূর্তিতে সম্প্রতি রঙ চড়ানো হয়েছে–ঠোঁট জোড়া টকটকে লাল, কয়লার মত কালো চোখ। মূর্তিটা লক্ষ করছে ওকে, যেন দেখতে চায় কোন্ প্যাসেজ ধরে এগোবে ও।

ডান দিকের একটা প্যাসেজ ধরে ভিতরে ঢুকল রানা, হাতে বাগিয়ে ধরা পিস্তল। দেয়াল ঘেঁষে সাবধানে এগোচ্ছে। নয়শো বছরের পুরানো মনুমেন্টে লুকাবার জায়গার কোন অভাব নেই। কিন্তু ঘোলা চোখ নিয়ে লোবুকে কোথাও থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে না।

একটা পাথুরে সিঁড়ির গোড়ায় এসে পৌঁছাল রানা। ধাপ বেয়ে সমাধির দ্বিতীয় স্তরে উঠছে। ওগুলো একেকটা একেক রকম। কিছু ধাপ ঢালু, কিছু খাড়া, কোনটা আবার পায়ের চাপে নড়ে উঠল। উপর দিকে তাকাতে মাকড়সার জাল দেখতে পেল রানা, একপাশে সরানো।

এই সিঁড়ি বেয়ে কেউ একজন উপরে উঠেছে। আরও সাবধান হয়ে গেল রানা। ওর কোন ধারণা নেই সিঁড়িটার মাথায় ওঠার পর কী দেখতে পাবে।

সূর্যটা হঠাৎ করে দৃষ্টিপথে চলে এল। মানাহার পাশে জানালার মত আংশিক বৃত্তাকার একটা ফাঁক। এখন রানা ধাপের উপর ধুলোর কার্পেটে পরিষ্কার পায়ের ছাপ দেখতে পাচ্ছে, উঠে গেছে উপর দিকে। সাবধানে, প্রতিবার একটা করে ধাপ বেয়ে উঠছে রানা।

তারপর নিজের উপস্থিতি প্রকাশ করে দিল লোবু। এবার রানা প্রতিবার দুটো করে ধাপ টপকাচ্ছে। ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ প্রতিধ্বনি তুলছে। সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে ঝট করে মাথাটা নিচু করে নিল ও। ট্রাউজারের ঢোলা একটা পায়া এক পলকের জন্য দেখতে পেয়েছে।

এখন রানা জানে নন্দিনীর কাছে পৌঁছায়নি লোবু, কাজেই ধুলোয় ভরা করিডর ধরে তার পিছু নিয়ে ছুটল এবার। সামনে একটা বাঁক। ঘোরার সময় সাবধান হলো রানা, তবে কিছুই ঘটল

না। তারপর সামনে পড়ল আরও এক প্রস্থ পড়ো পড়ো সিঁড়ি।

মানাহা সমাধির তৃতীয় স্তরে উঠে এল রানা। এখান থেকে অসংখ্য ঝুল-বারান্দায় যাওয়া যায়। ও যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার ছয় ইঞ্চি সামনে বিস্ফোরিত হলো ধুলো। ভেঙে গুঁড়ো হওয়া পাথরের টুকরো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

আঁতকে উঠে পিছিয়ে সিঁড়িতে ফিরে আসতে হলো রানাকে, চোখ দুটো হন্যে হয়ে খুঁজছে লোবুকে। হয়তো ঝুল-বারান্দার একটা থেকে আরেকটায় যাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে ওকে ঘিরে ঘুরছে সে, ভাবছে পিঠে একটা মাত্র গুলি করে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেবে ওকে।

সেটা যাতে না ঘটে, অকস্মাৎ আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ছুটল রানা, প্রায় উড়ে চলে এল সবচেয়ে কাছের একটা টেরেসে।

এখানে রোদ আছে, পাথুরে রেইলিং-এর পর বহুদূর পর্যন্ত প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আর ধানখেত। আরও দূরে চকচক করছে রূপালি ফিতের মত ইরাবতী।

ডানে বাঁয়ে তাকিয়ে লোবুকে খুঁজল রানা। ঝুল-বারান্দাটা খালি। বাতাস সমস্ত ধুলো উড়িয়ে নিয়ে গেছে, কাজেই ছাপ দেখে দিক নির্দেশনা পাবার কোন উপায় নেই।

'লোবু!' ডাকল রানা।। 'এসো একটা রফা করি। আমি শুধু মেয়েটাকে চাই। নন্দিনী কোথায় আছে বলো, ফিল্মটা আমি তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি।'

লোবুর আওয়াজ ভেসে এল ওর পিছন দিক থেকে, কিন্তু ঝট করে ফিরতে সেদিকে কাউকে দেখা গেল না। 'তুমি মিথ্যেকথা বলছ, মাসুদ রানা!'

'তুমি শুধু বলো নন্দিনী কোথায় আছে, ফিল্মটা সত্যি দিয়ে

দেব,’ আবার বলল রানা। এখনও তাকে দেখতে পাচ্ছে না ও, তাই বোকার মত গুলি খাওয়ার জন্য টেরেসের মাঝখানে যেতে রাজি নয়।

জবাবে লোবু কিছু বলছে না।

বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা ঘনঘন লাফাচ্ছে। শোনা যায় কি যায় না, বহুদূর থেকে ঘণ্টা আর ঢোলের আওয়াজ ভেসে আসছে। টকটকে লাল লেজ নিয়ে একটা পাখি এসে বসল টেরেসের রেইলিঙে; লেজটা এমন ভাবে নাড়ছে, যেন তাস শাফল করছে। তারপর আবার উড়ে গেল, বাতাস কেটে আরেকটা বুলেট রওনা হতেই। তৈরি ছিল রানা, মাজল ফ্ল্যাশ দেখামাত্র ওয়ালথারের ট্রিগার টেনে দিল।

ভারী ম্যাগনামটাকে টার্গেট করেছিল রানা। দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে ওর এই বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতা, বিদ্যুৎ-গতি রিফ্লেক্স আর নির্ভুল লক্ষ্যভেদের প্রশংসা করবে এমন কেউ ধারেকাছে নেই।

লোবুর হাত থেকে ছিটকে শূন্যে উঠল ম্যাগনাম, বাতাসে ঘূর্ণি নাচ নাচছে। একের পর এক পাথুরে দেয়ালের গায়ে বাড়ি খেল। এগিয়ে এসে লোবুর বুক লক্ষ্য করে পিস্তল ধরল রানা। তার ডান হাতের আঙুল বেয়ে টপ-টপ করে রক্ত ঝরছে প্যাসেজের মেঝেতে।

‘নন্দিনী কোথায়?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘যদি না বলি?’

কথা আর না বাড়িয়ে দু’পা এগোল রানা, হাত ধরে টেনে তাকে বের করে আনল প্যাসেজের ভিতর থেকে। রোদ লাগতে দেখা গেল মুখটা রক্তশূন্য ফ্যাকাসে হয়ে আছে। এক চোখে ঘন ঘন পলক ফেলে রানাকে খুঁটিয়ে দেখছে, যেন বুঝতে চায় এরপর কী করবে ও। হঠাৎ তার দৃষ্টি ছুটে গেল এক পাশে—ফেলে আসা

প্যাসেজটার দিকে।

মুহূর্তের জন্য রানাও সেদিকে একবার তাকাল। লবুয়াং লোবু ট্রেনিং পাওয়া এসপিওনাজ এজেন্ট, সুযোগ তৈরি করে হেলায় হারানোর জন্য নয়।

অকস্মাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল লোবুর শরীরে। প্রথমে ওয়ালথার ধরা হাতের কবজিটা মুঠোয় নিয়ে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি দিল নীচের দিকে, ফলে বুকের বদলে পায়ের দিকে ঘুরে গেল মাজল। প্রায় কোন বিরতি ছাড়াই ডান পায়ের ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারল রানার উরুসন্ধিতে।

গুঁতোটা এড়াবার জন্য লাফ দিল রানা, ফলে নিজে থেকে মুঠোটা শিথিল হয়ে যাওয়ায় ওয়ালথার খসে পড়ল পায়ের উপর। ওটা তোলার সময় বা সুযোগ কোনটাই এখন নেই রানার। ওকে ছেড়ে দিয়ে উঁচু করা দু'হাত কাজে লাগাচ্ছে লোবু–পাঞ্চ অ্যান্ড ব্লক, পাঞ্চ অ্যান্ড ব্লক–ঘুসিগুলো প্রথমে তলপেটে ঢোকাবার চেষ্টা করছে, তারপর গলায়।

'দু'জনেই এখন আমরা সমান–নিরস্ত্র,' বলল লোবু, শয়তানী হাসি লেগে রয়েছে ঠোঁটে। পায়ের গোড়ালির উপর ভর দিয়ে হালকা ভঙ্গিতে ঘুরল সে, পা ছুঁড়ল কিডনিতে লাথি মারার জন্য।

এক পা সামনে এগিয়ে বাঁ হাত দিয়ে লাথিটা ঠেকাল রানা। তবে একটা লাথি মেরেই থামল না লোবু। ঝাঁকি খেয়ে পিছু হটল সে, ডান পা দিয়ে সরাসরি সামনে আরেকটা লাথি চালাল।

সেটা রানা ঠেকাল দু'হাত এক করে, একটার উপর আরেকটা সাজিয়ে। তার জুতোর গোড়ালি ওর কবজিতে বাড়ি মারল, দাঁতে দাঁত ঘষে পিছিয়ে এল রানা। কাঁধের উপর কাপড়ের বাঁধনটা ঢিলে হয়ে গেছে, ক্ষতটা খুব ব্যথাও করছে এখন। বিপদের আসল

চেহারা একটু পর দেখতে পাবে, আন্দাজ করতে পারছে ও। ডিফেন্সিভ বাদ দিয়ে অফেন্সিভে যেতে হবে ওকে, তা না হলে ডান হাতের মত বাঁ হাতটাও ব্যবহারের উপযোগী থাকবে না।

এক পায়ের গোড়ালিতে ভর দিল রানা, তারপর লাফ দিল সামনে। ওর ফ্লাইং কিক লোবুর চিবুকে বিস্ফোরণ ঘটাল। তার মাথা প্রচণ্ড বেগে ঝাঁকি খেল পিছন দিকে, সেই সঙ্গে পিছু হটল সে–দশ কি বারো কদম।

একটা ব্যাপার লক্ষ করেনি লোবু–ধীরে ধীরে রেইলিঙের কাছে সরে যাচ্ছে সে। এই রেইলিং টেরেসটাকে ঘিরে রেখেছে। মাথা ঝাঁকিয়ে আচ্ছন্ন ভাবটা দূর করার চেষ্টা করছে প্রতিপক্ষ, ঘুসি বাগিয়ে ছুটে এল রানা, ডান পা উঁচু হয়ে একটা ধনুকের আকৃতি তৈরি করছে। বিপদ টের পেয়ে অলস ভঙ্গিতে সরে যাবার চেষ্টা করল লোবু, কিন্তু কারাতের এই মার এড়ানোর কোন উপায় নেই তার।

রানার পা তার কপালে লাগল। পিছন দিকে, অনেকটা দূরে ছিটকে গেল লোবু, পাকা রেইলিঙের গায়ে পড়ল, ঝুলে রয়েছে।

রানা এই মুহূর্তে নির্মম। সোলার প্লেক্সাসে লাথি খেয়ে পেট খামচে ধরল লোবু। একই জায়গায় আরেকটা লাথি পড়তে ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খেতে শুরু করল। পরের লাথিটা পাঁজরে। লোবু এবার টেরেসের মেঝেতে তার ব্রেকফাস্ট উগরে দিচ্ছে। ইতিমধ্যে তার গলাটা দু'হাত দিয়ে চেপে ধরেছে রানা।

'কে তুমি?' প্রচণ্ড রাগে হিসহিস করল রানা। 'কাদের পা চাটছ?' রেইলিঙের সঙ্গে চেপে ধরে ঝাঁকাচ্ছে ঘন ঘন।

রানার চোখে চোখ রাখল লোবু, তার মুখের নীচের দিকটা বেগুনি হয়ে ফুলে উঠেছে। এই সময় তার হাঁটু এত দ্রুত আর এমন

প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে উঁচু হলো, এড়াবার কোন উপায়ই ছিল না।

দ্বিতীয়বার লোবু টার্গেট মিস করেনি। রানার উরুসন্ধি যেন বিস্ফোরিত হলো। নিজেকে সাহায্য করতে অক্ষম, লোবুর গলা ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে এল রানা, ব্যথায় কুঁজো না হওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছে।

মনে হলো ফুসফুসে বাতাস বলে কিছু নেই। উরুসন্ধিতে আগুনটা নিভছে না। টেরেসটা চোখের সামনে বন বন করে ঘুরছে। তার সঙ্গে রানাও পাক খেতে শুরু করল। ওয়ালথারটা দেখতে পাচ্ছে ও, টেরেসের আরেক প্রান্তে পড়ে রয়েছে। সেদিকে পা বাড়িয়েছে, শিরদাঁড়ার উপর কষে একটা লাথি মারল লোবু। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ও। তবে সময় নষ্ট করছে না, পাথুরে মেঝেতে ক্রল করে এগোচ্ছে।

কিন্তু ওয়ালথারটা এখনও অনেক দূরে।

রানার পিঠে চড়াও হলো লোবু। কবজিতে ঝাঁকি খাইয়ে বগলের নীচে থেকে ছুরিটা অক্ষত হাতের তালুতে নিয়ে এল রানা। ক্ষুরের মত ধারাল ফলায় রোদ লাগল, লোবুর হতবিহ্বল ভাবটাও প্রতিফলিত হলো। শরীরটা মোচড় খাইয়ে চিৎ হচ্ছে রানা, এই সময় ওর কবজি ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করল সে। ইতিমধ্যে ছুরিটা চালিয়ে দিয়েছে রানা। ফলার ডগাটা নষ্ট চোখের গভীরে সেঁধিয়ে গেল।

লোবুর গলা থেকে জান্তব একটা চিৎকার বেরিয়ে এল। নিজেকে রানার কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে সে, ফলে ছুরির ফলা চোখের ভিতর এমনভাবে আগুপিছু করছে, ওটার যেন নিজের প্রাণ আছে। পিচ্ছিল আশ্রয় থেকে টান দিয়ে সেটাকে বের করে নিল রানা। তার মুখের একটা পাশ তাজা রক্তে ঢাকা পড়ে

গেছে। অসহ্য ব্যথায় চেঁচাচ্ছে সে।

সারা শরীর থরথর করছে, সিধে হয়ে দাঁড়াল রানা, ছুরিটা এখনও হাতে। দুর্বল লাগছে শরীরটা, মাথাটা একটু ঘুরছে, দাঁড়িয়ে আছে কোন রকমে। এখনও পিছিয়ে যাচ্ছে লোবু, এক হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে নষ্ট চোখটা।

'নন্দিনী কোথায়?' হাঁপাতে হাঁপতে জিজ্ঞেস করল রানা।

উত্তর না দিয়ে একটা হাত নিচু করল সে, রক্ত মাখা ট্রাউজারের পায়া তুলে কী যেন হাতড়াচ্ছে।

তারপর সিধে হয়ে রানার দিকে ছুটল সে, রোদ লাগায় এবার তার ছুরিটা ঝিক করে উঠল। কাস্তে দিয়ে বারবার ঘাস কাটার ভঙ্গি করছে বাতাসে।

একপাশে সরে তার পথ ছেড়ে দিল রানা, তারপর নিজের ছুরিটা ছুঁড়ে দিল। টেরেসের উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে লোবুর পিঠে, শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে, ঘ্যাচ করে গেঁথে গেল সেটা। হোঁচট খেল সে, এক হাতে নিজের পিঠ খামচাচ্ছে–এখনও অপর হাতটা খালি করতে রাজি নয়।

এতটুকু ইতস্তত না করে তার পিছনে এসে দাঁড়াল রানা, ছুরির হাতল ধরে চাপ দিল–ফলাটা হাতল পর্যন্ত সেঁধিয়ে গেল।

রেইলিঙে পেট দিয়ে দাঁড়িয়েছে লোবু, দু'হাতে ধরেও আছে সেটা। হার মানতে রাজি না, পিছন দিকে পা ছুঁড়ে রানার নাগাল পাবার চেষ্টা করল সে।

'তোমার সময় শেষ, হে,' বলল রানা, টান দিয়ে বের করে নিল ছুরিটা। তারপর লোবুর একটা পা ধরে প্রথমে উঁচু করল, তারপর সামনের দিকে ঠেলে দিল।

এই ছিল, এই নেই।

রেইলিঙের উপর দিয়ে ঝুঁকে নীচে তাকাল রানা। ধ্বংসাবশেষের মাঝখানে পড়ে রয়েছে লোবু। নড়ছে না।

রেইলিঙে পিঠ ঠেকিয়ে দম নিল রানা। তারপর ক্ষতটা আরেকবার দেখে নিয়ে কাপড়ের ফালিটা ভালো করে বাঁধল। নতুন করে ওটা থেকে রক্ত বেরুচ্ছে না।

এরপর এগিয়ে এসে ওয়ালথারটা তুলে হোলস্টারে ভরল রানা। ছুরির ফলা আগেই মুছেছে, এবার সেটাকেও তার জায়গায় গুঁজে রাখল।

লোবুর ম্যাগনাম, মনে পড়ল ওর।

প্যাসেজটার দিকে ঘুরে গেল রানা। এই প্যাসেজ ধরে সমাধি সৌধের আরও ভিতরে ঢোকা যায়। হাতে এখনও অনেক কাজ রয়েছে ওর। সবচেয়ে আগে নন্দিনীকে খুঁজে বের করতে হবে। তারপর পেগানে ফিরে যাবার আগে লোবুর লাশের একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

কিন্তু ম্যাগনামটা ওখানে নেই। লোবুর হাত থেকে ছিটকে কোথায় পড়েছিল, জানে রানা, নিজের চোখে দেখেছে, মনেও আছে–অথচ নেই সেটা।

কী আশ্চর্য, জিনিসটা তো আর বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারে না!

প্যাসেজের মেঝেটা ভালো করে দেখছে রানা।

তারপর লোবুর .৩৫৭ ম্যাগনামটা পাওয়া গেল। তবে ধুলো ভরা প্যাসেজের মেঝেতে নয়। রানা দেখল ওটা একটা হাতে ধরা রয়েছে। হাতটার মালিক রূপ আর যৌবনের আধার একটি নারীদেহ। মুখ তুলে হাসতে চেষ্টা করল রানা।

'সকালটা তোমার খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটল, মিস্টার মাসুদ

রানা।'

'তুমি সেটাকে আরও বেশি ব্যস্ত করে তুলবে মনে হচ্ছে, নন্দিনী অপরূপা।'

ষোলো

'হ্যাঁ। তারপর থামিয়ে দেব। সারপ্রাইজড?'

'খুবই,' স্বীকার করল রানা, মনে পড়ল ইয়াঙ্গুন শেরাটনের ডাইনিং রুমে এই শব্দটা কীভাবে উচ্চারণ করেছিল সে। 'তোমার জন্যে খুবই উদ্বিগ্ন ছিলাম আমি।'

'কেন? এখনও ভুল ভাঙেনি তোমার?'

'সে তো কবেই ভেঙে গেছে।'

'তা হলে?'

'তোমাকে জ্যান্ত ধরতে চেয়েছিলাম।'

'কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আমিই ধরলাম তোমাকে। যাই হোক, এ-কথা বলতে পারবে না যে কটা রাত তুমি উপভোগ করোনি।'

'শুধু উপভোগ বললে সম্পর্কটার প্রতি অবিচার করা হয়,' বলল রানা; তাকিয়ে আছে স্থির ম্যাগনাম, ঠোঁটের চারপাশে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ভাব আর হিমবাহের মত ঠাণ্ডা চোখ দুটোর দিকে। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'আমার সব সময় মনে হয়েছে, চোখগুলোয় কোনও গোলমাল আছে।'

'গোলমাল?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। ‘অগভীর। একটু বেশি ঠাণ্ডা। একটু বেশি কঠিন।’ সামান্য থেমে আবার বলল ও, ‘প্রতিবেশী বাঙালী মেয়েটির চেয়ে একটু যেন বেশি স্বাধীনচেতাও। আসলে তুমি আমেরিকান, তাই না?’

মাথা ঝাঁকাল নন্দিনী। ‘সেকেন্ড জেনারেশন আমেরিকান। বেইজিং দূতাবাসের কালচারাল সেকশনে যোগ দিচ্ছি আগামী মাসে। তবে আমার ভারতীয় বাঙালী পরিচয়টাও মিথ্যে নয়।’

‘তোমাদের দূতাবাস আমার সম্পর্কে কখন জানল?’

‘খবরটা আসে ঢাকা থেকে। আমাদেরকে জানানো হয় চিন থেকে একটা ফ্লাইট ধরে জিয়া ইন্টারন্যাশন্যালে ল্যান্ড করেছ তুমি। দূতাবাস থেকে নির্দেশ পাঠানো হয়, তোমার ওপর চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখতে হবে। বাকিটা পানির মত সহজ।’

‘শ্রীলঙ্কা থেকে হংকঙে এলাম আমি, আর আমার ওপর নজর রাখার জন্য তোমাকেও হংকঙে পাঠানো হলো?’

মাথা ঝাঁকাল নন্দিনী। ‘ভালো কথা, রানা, আমি কিন্তু সত্যি আর্কিওলজি নিয়েই পড়াশোনা করেছি।’

‘আমারও একটা ভালো কথা আছে,’ বলল রানা, পিছিয়ে টেরেসে ফিরে এসে রোদের মধ্যে দাঁড়াল, তারপর ইঙ্গিতে পিছন দিকটা দেখাল। ‘তোমার পার্টনার লবুয়াং লোবু উড়তে চেয়েছিল। কিন্তু সমস্যা হলো, তার ডানা ছিল না।’

‘আমি জানি, দেখেছি। ওর মত বহু ঘুঁটি দুনিয়ার সব জায়গায় ছড়িয়ে রেখেছে আমেরিকান এনএসআই–ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি। লোবু মরেছে, তার জায়গায় আরেকজন আসবে...’

‘মরেছে আরও একজন...’

‘হ্যাঁ, তা-ও জানি,’ বলল নন্দিনী। ‘জো টাইসন। সিআইএ।

মিউজিয়ামে গার্ডদের গুলি খায়, মারা যায় হোটেলে।' ধীর পায়ে এগিয়ে এসে টেরেসে ঢুকল সে। 'এ-সব কথা থাক, রানা। আমি শুধু ফিল্মটা চাই।'

'কেন তুমি ভাবছ ওটা আমার কাছে আছে?'

মাথাটা পিছনদিকে হেলিয়ে হেসে উঠল নন্দিনী। তার এই হাসিটা আগে কখনও শোনেনি রানা। আওয়াজটা যেন একেবারে নন্দিনীর গভীর থেকে উঠে এল, যার সঙ্গে ওর পরিচয় নেই, যেখানে যায়নি ও, যেটা দেখেনি আগে। হাসিটা চোখের মতই ঠাণ্ডা। পরিচয় হবার পর এই প্রথম নিজের মুখোশ খুলল মেয়েটা।

'হাতদুটো ওপরে তোলো, রানা,' বলল নন্দিনী, মেজাজ খারাপ করছে। হাত দুটো মাথার দু'পাশে তুলল রানা। 'গুড। এবার তোমার পিস্তলটা তুলে নেবে তুমি–দু'আঙুলে ধরে। দু'আঙুলে, রানা। তিন বা চার আঙুলে নয়, ঠিক আছে? দুটোর বেশি আঙুল যদি ব্যবহার করতে দেখি, ট্রিগার টেনে দেব আমি। এই কাজ, মানে মানুষ খুন, এর আগেও অনেকগুলোই করেছি আমি–কাজেই ঝুঁকি নিতে চাইলে ভুল করবে। সব পরিষ্কার?'

'পরিষ্কার।' নন্দিনীর কথামতই সব করল রানা। পিস্তলটা হোলস্টার থেকে বের করে এনে ছেড়ে দিল। মেঝেতে পড়ে আওয়াজ করল ওটা। তারপর আবার মাথার উপর হাত তুলল ও। মনে মনে প্রার্থনা করছে শার্টের ভিতর, বাহুর সঙ্গে স্ট্র্যাপের সঙ্গে আটকানো ছুরিটার অস্তিত্ব নন্দিনী যেন টের পেয়ে না যায়।

'এবার, রানা, মাইক্রোফিল্মটা দাও,' বলল নন্দিনী। 'ওটা তোমার সুটকেসে নেই–নেই এমনকী ওটার ফলস বটমেও।'

'ছি-ছি, তুমি ওখানেও সার্চ করেছ?'

'করব না?' অসহিষ্ণু দেখাচ্ছে নন্দিনীকে। 'আমাকে তুমি কী

মনে করো, গাধী?'

'না-না, ওটা তুমি নও, তার চেয়ে ভালো।' জবাব দিল রানা। 'জানি, ফিল্মটা তোমাকে না দিয়ে আমার কোন উপায় নেই। তবে অন্তত দু'চারটে প্রশ্নের জবাব পেলে কৌতূহল খানিকটা মিটত।'

'কী জানতে চাও?' হাসছে নন্দিনী। 'ফেরিতে মিন ভাইদের ম্যানেজারকে কে খুন করল?'

'হ্যাঁ।'

'ও আমাকে চিনে ফেলে, আমার পরিচয় জেনে ফেলে,' বলল নন্দিনী। 'তাকে খুন না করে আমার কোনও উপায় ছিল না–তোমাকে ও আমার কথা বলে দিচ্ছিল আর একটু হলে।'

'তুমি সেদিন ইয়াঙ্গুনের মিউজিয়ামেও ছিলে, তাই না?'

'আমি পৌঁছে শুনি অ্যালার্ম বাজছে। দুঃখিত, রানা। আমি তোমার আর কোন প্রশ্নের জবাব দেব না। ফিল্মটা!'

'ও, হ্যাঁ। দিতেই যখন হবে–,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ওটা আমি জুতোর ভেতর লুকিয়ে রেখেছি। গোড়ালিটা আসলে ফাঁপা।' ঝুঁকে একটা জুতোর দিকে হাত বাড়াল। ছুঁড়ে মারার জন্য এখানে বালি নেই, কাজেই পা থেকে খোলা জুতোটা হাতে নিয়ে সিধে হতে হলো ওকে।

'ছেড়ে দাও,' নির্দেশ দিল নন্দিনী।

ছাড়ল রানা।

'এবার পা দিয়ে ঠেলে দাও আমার দিকে।'

'মাই প্লেজার,' বলল রানা। একটা পা সামনে ঠেলে দিল। তবে নন্দিনী যেভাবে চেয়েছিল সেভাবে নয়।

পা উঁচু করল রানা, হাঁটু উঠে এল বুকের অনেকটা কাছে। সময় নিল একবার নিঃশ্বাস ফেলতে যতটুকু লাগে। এক সঙ্গে

দশটা আঙুল মটকালে যে শব্দ হবে, সেরকম একটা আওয়াজ শোনা গেল; সামনের দিকে সোজা একটা লাথি ছুঁড়েছে রানা। তবে লাগাতে পারল না।

আঘাতটা আসছে দেখে কেউটের মত ক্ষিপ্র বেগে সরে গেল নন্দিনী, একই সঙ্গে ট্রিগার টেনে দিল। রানার মাথাকে পাশ কাটাল বুলেট। আরেকটা লাথি চালাল ও, সেটা নন্দিনী ঠেকিয়ে দিল ভাঁজ করা বাঁ হাত সামনে ঠেলে দিয়ে।

তার মানে কারাতে জানে মেয়েটা, ভাবল রানা। তবে তার মার্শাল আর্ট ট্রেনিং নিয়ে চিন্তিত নয় ও। সুযোগ পেয়ে আবার ম্যাগনামের ট্রিগার টেনে না দেয় মেয়েটা, সেটাই ভয়। দিল।

বিদ্যুদ্বেগে সরে গেল রানা। কিন্তু গুলি হলো না। জ্যাম হয়ে গেছে মেকানিজম, বুলেট বেরুল না পিস্তল থেকে।

সন্দেহ নেই, এর জন্য দায়ী রানার ওয়ালথারটা। মিনিট দশেক আগে ম্যাগনামের ব্যারেলে একটা কামড় দিয়েছিল।

চমকে উঠে হাতের অস্ত্রটা একবার দেখল নন্দিনী, তারপর পিছু হটতে শুরু করল, ট্রিগারটা বারবার টানছে আর ছাড়ছে। জ্যাম ছুটে গিয়ে যে-কোন মুহূর্তে বুলেট বেরিয়ে আসতে পারে।

ঝুঁকে ওয়ালথারটা তুলল রানা। লক্ষ্যস্থির করে মাত্র একবার ট্রিগার টানল।

ছিটকে রেইলিঙে গিয়ে পড়ল নন্দিনী। ধীরেসুস্থে ডিগবাজি খেল, তারপর লবুয়াং লোবুর পথ অনুসরণ করল।

***

মাসুদ রানা

কালো নকশা

কাজী আনোয়ার হোসেন

আমেরিকার গালে চড় মেরেছে, কে এই মেয়েটা?
মাসুদ রানা কি বেইজিং গডফাদার
হুন চেননি-র কালো থাবা থেকে রক্ষা করতে
পারবে তাকে? এক হাজার কোটি টাকা দামের
মাইক্রোফিল্মটা চোখের সামনে দিয়ে
নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে, ওটার পিছু নিয়ে
এবার মায়ানমারে ঢুকতে হবে রানাকে;
সঙ্গে জুটল নন্দিনী অপরূপা–রানার নতুন প্রেম?

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০